হন্যমান

জয়া মিত্র

: প্রাপ্তিস্থান :
কামিনী প্রকাশালয়
১১৫, অখিল মিস্ত্রি লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

কবি জয়া মিত্র সত্তরের দশকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে বন্দী হয়ে সাড়ে চারবছর কাটিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে তাঁর ব্যক্তিগত বন্দীজীবনের স্মৃতিমাত্র নয়, ব্যক্তিমানুষের যন্ত্রণার সীমাকে ছাড়িয়ে সমগ্র মানব-পটভূমির আর্তির অপরিসীমে ব্যাপ্ত হয়েছে এর সংকেত। জেলের যে প্রাচীরটি দেখতে সাধারণত আমরা অভ্যস্ত, তার হিংস্র ছায়া ভিতরে ও বাইরে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে, আমরা জানি। তবু ভিতরের দিকের ছায়ার হিংস্রতার যে প্রকট রূপ তারই অভিজ্ঞান নিয়ে কয়েকটি চরিত্র এসেছে এ-গ্রন্থে, হয়ত তারা আবার মিলে গিয়েছে আমাদের প্রতি মুহূর্তের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত শৃংখলের দৃঢ়তায়। জয়া মিত্রের কবিচেতনায় প্রতিফলিত হয়েছে সেই শৃংখলের সম্পূর্ণ অবয়ব, তারপর তাঁর সংশ্লেষণে ও নন্দনে—তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত মুক্তির সৌকর্যে—সেই শৃংখলমোচনের একটি প্রতিজ্ঞার সঙ্গেও পাঠকের হৃদয়ের ও মননের সংযোগ ঘটেছে।

অমিতাভ গুপ্ত

লেখকের অন্য বই

উদ্দালক নামে ডাকো (কবিতা)

প্রত্নপ্রস্তরের গান (কবিতা)

আত্মকথা—কৃষণচন্দর (অনুবাদ)

অমৃতা — অমৃতা প্রীতম

ভীষ্ম সাহনীর গল্প

জিপসী নদীর ধারা

ফুলবাগান ও অন্যান্য গল্প (অনুবাদ)

স্বর্ণকমলের চিহ্ন—উপন্যাস

একটি উপকথার জন্ম—উপন্যাস

যাদের কথা এখানে রয়েছে
এসবই তো তাদেরই
আমি উৎসর্গ করার কে—

এরকমই তো হয় যে, ঢেউ ওঠে কিংবা পড়ে, বিপুল বন্যা আসে ও সরে যায়, বিশেষ পরিবর্তন হয় না মূলস্রোতের ধারায়। এরকম হওয়াকেই আমরা স্বাভাবিক বলে ধরে নিই এবং বন্যায় রিলিফ পাঠানো হল জেনেই নিশ্চিন্ত হই। জেল সম্পর্কে অজ্ঞতা, ভয় ও অপরিচয়কে সত্তর দশক ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো ব্যাপক সাধারণ মানুষের মন থেকে। সমস্ত আড়াল সরিয়ে দিয়েছিল সেই বিপুল ভাঙচুর আর জন-জোয়ারের দশক।

তারপর দিন বদলালে, শ্মশান ও পুনরায় ঘাসজমি-হয়ে-ওঠা শান্তি ফিরে এলে, যারা কারাপ্রাচীরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন, তাঁদের অনেকে লিখলেন জীবনের সেই অন্ধকার-অংশের কথা—অত্যাচার, পাশবিকতা, হত্যা ও নির্মম বিভৎসার সেই-সব স্মৃতি।

কিন্তু কী হল তাদের যারা তার আগেও ছিল জেল-প্রাচীরের ভিতরে আর পরেও রয়েছে?

যারা সচেতনে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, ডাক দিয়েছিল ক্ষমতা দখল করার, তারা তো অত্যাচার, বন্দীত্ব, মৃত্যু বরণ করেছিল জেনে-বুঝে। তাদের আশ্রয় ছিল দেশের উদ্বেল হৃদয়ে। কিন্তু যারা এসব কিছুই নয়, যারা এই সমাজের মধ্যেই কোনা রকম টিকে থাকতে চেয়ে কিংবা থাকতে না পেরে কোনো অপরাধ করেছে, সামাজিক স্বাস্থ্যের পোকা বাছাই করে 'সংশোধনের জন্য' যাদের রাখা হয় জেলে—কী ভাবে থাকে সেই মানুষেরা?

অনেক সময় অনেকে বলেছেন 'কী হল জীবনের এতগুলো বছর নষ্ট করে?' আমি জানি না 'নষ্ট' শব্দের মানে। আমি বুঝি যদি এইবছর কটা জীবন থেকে বাদ যেত 'মানুষ' কথাটির অর্থ না জানা রয়ে যেত আমার। নরকের মধ্যে দাঁড়িয়েও মানুষের সাহস তার ভালবাসা—যেখান থেকে, এমনকি মৃত্যুর মধ্য দিয়েও, অপ্রতিরোধ উঠে আসছে জীবন। আর সেই জীবন হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে সমস্ত মানুষের চেতনার দিকে, আশপাশে বাস করা মানুষজনের উদাসীন নিশ্চিন্ততার দিকে। রেখে আসা সেইসব মুখগুলির কাছে, এখন যাঁরা তাদের জায়গা নিয়েছেন —তাঁদেরও কাছে আমার এক দায়বদ্ধতা ছিল।

এ-বই আমার একার রচনা নয় বলেই মনে করি। যা আছে আমি শুধু তাই দেখাতে চেয়েছি, যদি এইসব, আরও অনেক সাথীরা এগিয়ে আসেন আর বইটির শেষ অধ্যায় সকলে মিলে রচনা করা যায়।

পাঠক নিশ্চয়ই বুঝবেন শেষ পৃষ্ঠায় লেখাটি শেষ হয়নি, এক বহমানতাকে ছেদ করা হয়েছে মাত্র।

জয়া মিত্র

গেট দিয়ে স্ট্রেচারটা বেরোলো। এটা থানা, না হাসপাতাল, না আমার শহরের ছোট জেল, মনে করতে পারি না। সকালবেলা কোর্টে নিয়ে যাবার সময় থানার একজন অফিসার বলেছিলেন, মনে রাখবেন— থানায় কিন্তু আমরা আপনার সাথে কোনোরকম খারাপ ব্যবহার করিনি। গাড়ির পাশটায় থুথু ফেলেছিলাম— তাতে তখনও রক্তের ছোপ ছিল। অনেক পরে শুনেছি, ওটা বলে দেওয়াটা নাকি একটা দস্তুর। জল্লাদ যেমন ফাঁসির দড়ি গলায় পরাবার আগে ক্ষমা চেয়ে নেয়। কিন্তু সে তো সকালবেলাকার ব্যাপার, তারপর তো কালো গাড়িটার মধ্যে পরিবৃত অবস্থায় বসে বসে সারাদিন গেল। এর নাম কোর্টে হাজির করা! তারই মধ্যে কখন যেন অন্ধকার লাগল চোখে— কোথায় কাদের বলতে শুনলাম, অক্সিজেন দিতে হবে মনে হচ্ছে। এই এক বেশ ব্যাপার— যখন-তখন অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি। আর কিছু না হোক তো অন্তত বসে থাকার একঘেয়েমিটা কাটছে। কিন্তু এখন যে আমাকে স্ট্রেচারে চ্যাংদোলা করে একটা উঁচু বড়ো মত গাড়ির মেঝেয় শুইয়ে দিল, এটা কোথায়, কে জানে! বুটের ঠক্ ঠক্ গত দশদিনে এতো শুনেছি, যে ওটা বাইরে বাজছে না আমার মাথার মধ্যে তাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অন্ধকারে একটা অসন্তুষ্ট স্বর— দিল তো চাপিয়ে। এখন রাস্তায় মরে গেলে সামলাও ঠ্যালা। চোখ খুলে আছি, অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি মুখের থেকে বিঘত খানেক দূরে বুটপট্টি পরা কয়েক জোড়া পা, তার পেছনে গাড়ির মেঝেটার শেষে যেখান থেকে দেওয়াল ওঠার কথা সেখানে ইঞ্চিখানেক চওড়া একটা ফাঁকের রেখা, সেখানে ছুটন্ত আলোর আবছা আভা। ধীরে ধীরে বুঝতে পারি এটা একটা ত্রিপল-ঢাকা মিলিটারি লরি। দুপাশের বেঞ্চিতে যারা বসে আছে তাদের মাঝখানে পায়ের কাছে আমি পড়ে আছি। জল পিপাসা পেয়েছে খুব। বোধহয় মুখে কোন শব্দ হয়— মেয়েকণ্ঠে কেউ শুধোয় কিছু বলছ? আন্দাজ করি এ ফিমেল ওয়ার্ডার। এরা যে কেন সঙ্গে থাকে কে জানে!

—কোথায় যাচ্ছি?

—মেদিনীপুর।

—কখন পৌছবো?

—এই দুটো-আড়াইটে।

কে একটা ধমকায়। ওয়ার্ডারকে কথা বলতে বারণ করে বোধ হয়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল, অনেকে চোখ বড়োবড়ো করে শুধিয়েছেন, ছেলেরাই

মারে ! মেয়েদেরও। আর প্রতিবারই থানার সেইসব গর্জমান হিস্টিরিক্যাল মহাপ্রভুদের জায়গায় আমি কোনো মোটাসোটা রাগী মহিলাকে কল্পনা করতে চেষ্টা করি। রুল ? বেটন ? নাঃ—মধ্যবয়সী মারমুখী পুলিশ-স্বভাবা মহিলার হাতে ঝাঁটার মত আর কিছুই মানায় না। কিন্তু থানায় কি ঝাঁটাপেটা করার নিয়ম আছে ? গাড়িটা চলছে প্রধানত অন্ধকার দিয়ে। কিছুটা বাইরে, কিছুটা চৈতন্যে। কখনো কখনো ধাবমান কিছু আলো বোঝায় জনপদ। আমার শরীর আর মন যেন সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট অবস্থায় কাজ করছে। শরীরটা তার নিজের ইচ্ছেমত ব্যথা পাচ্ছে, গাড়ির ঝাঁকুনির সাথে ওলটপালট নাড়া খাচ্ছে, অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে খানিক, আবার জ্ঞান ফিরে আসছে। ত্রিপলের তলার সরু ফাঁক দিয়ে রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস লাগছে মুখে-মাথায়। মনের সাথে এ সবের কোনো সম্পর্ক নেই। দেহটা যেন তার সাথে যুক্ত নয়। সে সাধ্যমত ভেবে চলেছে মেদিনীপুর যদি মাঝরাত্রে পৌঁছই, কিছু দেখতে পাব না, কেউ জানতে পারবে না। একটু পরে পরে ওয়ার্ডারকে বলছি 'আস্তে চালাতে বল আমার বমি বমি লাগছে'। পায়ে বমি লাগার ভয়ে প্রহরীরা খানিকক্ষণ আস্তে চালাচ্ছে। কে একজন বুট দিয়ে ঠেলে দিল। আচ্ছা ওরা কি গুলি করতে নিয়ে যাচ্ছে ? থানায় অবশ্য বলেছিল, গুলি করে মেরে কাঁসাইয়ে ভাসিয়ে দাও, ওদের তীর্থ মেদিনীপুরে গিয়ে ঠেক্‌বে— কিন্তু সে তো আরও অনেক কিছুই বলেছিল। তাছাড়া কাঁসাইয়ে তো এক আঁজলাও জল নেই, ভেসে যাব কী করে একথা মনে করে আমি হঠাৎ হেসে ফেলায়, ওরা সবাই কেমন খানিকটা থতমত খেয়ে যায়। কিন্তু তার জন্য তেল পুড়িয়ে এতোদূরে নিয়ে যাবে কেন ?

ত্রিপলের তলার চলন্ত ফাঁক দিয়ে দেখি, বাইরের অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে গেছে। পাতলা আলো, জালের ভিতর দিয়ে ছুটন্ত গাছপালা, জঙ্গলের শিল্যুয়েট। ঘরবাড়ির আভাস। গাড়ি ঝাঁকুনি খায়। দাঁড়ায়। আবার লোকজনের গলার শব্দ। বুটের শব্দ। ঝনঝন করে কোনো লোহার দরজা খোলার শব্দ। আমাকে প্রায় বস্তা স্টাইলে নামানো হয়। মাটিতে উঠে বসে চারদিকে তাকাই। অপরিস্কার, কম আলোজ্বলা দুটো ঘর। অফিসঘরের মত দেখতে। তার মাঝখানে গাড়িবারান্দায় এই গাড়িটা। ওপাশে কী সব কথা বলাবলি। একটা রুক্ষ চেহারার লোক বলে— স্ট্রেচার তো আনতে দেরি হবে— আরে এদের কাছিমের প্রাণ— কি পারবেন না হেঁটে যেতে ? আমি যদিও লোকটার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকাই এবং ভিতরের গেট পার হয়ে একটা বড় চাতালে ঢুকেই ঘুরে পড়ে যাই— তবু মন স্বস্তি পায়— হেঁটে

গেলে জায়গাটা দেখতে পাব। এতক্ষণে দেখি যেখান দিয়ে এলাম, সেখানে দূরে উঁচুতে একটা কালো বোর্ডের গায়ে সাদা রঙে লেখা MIDNAPORE CENTRAL JAIL আবার একটা বিরাট দরজা, তার গায়ে একটা কাটা দরজা, তালা খোলার শব্দ হয়, এতক্ষণে সত্যিকার জেলের ভেতর ঢুকি। আর কেঁপে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে যাই। প্রচণ্ড শ্লোগানের শব্দে প্রত্যূষের আকাশ থর্ থর্ করতে থাকে। কাছে-দূরে লালরঙের ব্লকগুলোর জানলার গরাদ ধরে কারা দাঁড়ানো। এতোজন ! এতো ! সঙ্গে কারা যে ছিল হাত ধরে প্রায় টেনে নিয়ে আর একটা দরজার ভিতর ঠেলে দেয়—। আমি আবার অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেতে শুনি পুরুষ কণ্ঠে— লেখো একুশ নয়, পয়লা আমদানি —আর এক ঝলক মনে পড়ে আজ আমার জন্মদিন, আমি একুশ বছরে পড়লাম।

এটা ঠিক স্মৃতিচারণ নয়, বরং বলা যায় অ্যালবাম ওল্টানোর জন্য বসা। চার বছরের অন্ধকার দীর্ঘ দিনগুলির ভাঁজে ভাঁজে দেখা অজস্র মুখ অমাবস্যার কালির মধ্যে অজস্র ঝকঝকে তারার মতন তাদেরই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখা, ধুলো ঝেড়ে রাখা আমার বুকের মধ্যে— যেখানে তারা আছে— সেখান থেকে বাইরে এনে রাখার চেষ্টা— বলতে চাওয়া যে, এই শহর বাজারের মাঝ মধ্যিখানে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে আছে কি অদ্ভুত এক জনবসত। মাত্র এগারো ফুট উঁচু ইটের পাঁচিলের অলৌকিক এপার-ওপার। তারা কতোজন বার বার বলেছিল, দিদি ভুলে যাবে না তো? নিজের মনে মনেই তার উত্তর দিই এই দেখো— তোমাদের ভুলিনি— গঙ্গা-জয়লক্ষ্মী-মায়া-ইতোয়ারী-হানিফা-আয়তামাঈ কাউকে না। আরো কতজন যারা এখনও বন্ধ আছ কিংবা মরে গেছ হয়তো পাগল হয়ে গেছ কিংবা বাপীদি-মালা-ময়না-নূরজাহানের মত দাঁড়িয়ে থাকো রাস্তায়— যদিও জানি তোমরা শুনতে পাচ্ছ না— কিন্তু এও জানি তোমরাও কেউ ভোলনি।

তো এই হচ্ছে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল। জ্ঞান ফিরতে দেখি একটা লোহার খাটে পাতা বিছানায় শুয়ে আছি। পায়ের কাছে জানলা দিয়ে আকাশের আলো। চমকে উঠে বসতে গেলে রোগামত চেহারার চশমাপরা বৃদ্ধ এগিয়ে আসেন প্রবল বাধা নিয়ে, শুয়ে থাকুন শুয়ে থাকুন— এবার দেখতে পাই আরও লোকজন দাঁড়ানো খাটের এপাশ-ওপাশ। খাকি পোশাকেরও। সাদা টুপি নার্সের পোশাক পরা এক গোছালো চেহারার মহিলাও। এটা আবার

কী? হাসপাতাল? আমি কার বিছানায় শুয়ে আছি? সেই বৃদ্ধ, এতক্ষণে তাঁর স্টেথিসকোপটাও দেখতে পেয়েছি, বলেন, কারোর নয়, এটা আপনারই বিছানা। এটা হাসপাতাল। আপনি খুব অসুস্থ, কথা বলবেন না। এটা খেয়ে ঘুমোন।

সাদা নিষ্ঠুর দেওয়ালে বড় বড় গরাদ দেওয়া জানলাকাটা। ভিতরে চার পাঁচখানা লোহার খাট। দু-একটায় বিছানা পাতা, বাকিগুলো খালি। দেওয়ালের নিচের দিক, জানলা, দরজা সব আলকাতরা দিয়ে রঙ করা। নিষ্প্রাণ আর কুশ্রী। হাসপাতালটার সামনে উঠোনে আরো অনেক মেয়েরা, গ্রাম্য চেহারার মেয়েরা ঘোরাফেরা করছে। মাঝে মাঝে চোখ মেলে চাইলে ওদের দেখতে পাই যেন একটা হলদেটে আলোর ভিতর দিয়ে। আর দেখতে পাই হাসপাতাল ওয়ার্ডের দরজার সামনে একটা নিচু রেলিংয়ের ওপর মাধবীলতা— তাতে সবুজভরে লালগোলাপী পুঞ্জ পুঞ্জ ফুল ফুটেছে। রোজ সকালে শুয়ে শুয়ে দেখি সেদিনের নতুন বন্দিনীরা হাসপাতালে আসে। তাদের উচ্চতা, ওজন, শারীরিক চিহ্ন ইত্যাদি লেখা একটা বড় কার্ড ডাক্তারবাবু, দেখে সই করে দেন। ওটাকে এখানে বলে 'টিকিট'। এসব লিখে দেবার আগে বন্দীকে জেলারের সামনে নিয়ে গেলে তার কারাবাসের মেয়াদ, কারণ ইত্যাদি শুনিয়ে কাগজে নথিভুক্ত করা হয়। তার নাম কেস টেবিল করা। আমি একটু একটু কথা বলতে পারবার পরই ডাক্তারের কাছে বই চেয়েছিলাম। সেই নার্সের পোশাক পরা মহিলা, তিনি মেয়েদের ওয়ার্ডের ইনচার্জ মেট্রন, বলেন, দাঁড়ান আপনার কেস টেবিল হোক। তখন আমি ভেবেছিলাম ওটা কোন রকমের টেবিল।

এইসব পরিভাষাগুলো নিয়ে মাঝে মাঝে গোলমাল হয়। নালা পরিষ্কার করার ব্যাপারে একদিন জমাদারকে ডাকতে বলায়, সকলের মুখ কেমন হয়ে যায়। পরে শুনি হেড ওয়ার্ডারদের এখানে জমাদার বলে। জেলে সে ছোট ভগবান এবং যে কোন ছোট ভগবানের মতই তার প্রভাব মাঝে মাঝে বড়ো ভগবানের চেয়ে বেশি। এরকম আরেকটি পরিভাষা 'লাভ কেস'। IPC 316 অর্থাৎ নাবালিকা হরণ ও ধর্ষণের অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কিশোরী বা তরুণীরা জেলে আসে, তাদেরই বলে লাভ কেসের মেয়ে। তখনও জানি.. না যারা সত্যি 'শিকার' হয়ে আসে এ অপরাধের, তাদের কী হয়—সাধারণত অপরিণতবয়স্ক প্রণয়ী যুগলের, প্রধানত মেয়েটির অভিভাবকরাই হন এ সব কেসের অভিযোগকর্তা। তাঁরা যথেষ্ট চেষ্টা করেন মেয়েটি যাতে কোর্টে বলে যে সে ছেলেটির সঙ্গে স্বইচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে যায়নি। প্রায় কোনো মেয়েই

তা বলে না। কেন না সে ক্ষেত্রে তরুণটির সাত বছরের জেল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি কোনও মেয়ে এটা করে, তবে অন্য মেয়েদের কাছে সে যৎপরোনাস্তি ধিক্কৃত হয়। গঙ্গা বেরা বলে একটি মেয়ে এলো। ছোটখাট কালো পুতুলের মত গ্রামের বউ। সবাই তাকে ঘিরে ধরেছে, কী কেস তোর ? সে তো কেঁদেই আকুল, মুই কিছু না জানিছু, মোর ঘরে একটা ছাওয়াল ধরাই গেল—ব্যস্ ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে সাব্যস্ত হয়ে যায় লাভ কেস তোর, কাঁদিস না কিছু হবে না।

খানিক জল মুছে, লাল চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে সে। যখন দেখে আরও অনেক মেয়ে আছে, গানও গাইছে কেউ কেউ। পরদিন ডাক্তারবাবু অভ্যাসমত সব নতুন মেয়েদের সঙ্গে গঙ্গাকেও জিজ্ঞাসা করেন, কী কেস গো ?

গঙ্গা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উত্তর দেয়, লাভ কেস।

টিকিট হাতে করে ডাক্তারবাবু আঁতকে ওঠেন।

লাভকেস কি গো, মার্ডার কেস যে তোমার। পরে জানা যায় গ্রামের ছেলে, কোনো রাজনৈতিক পার্টির কর্মীকে নিজের ঘরে থাকার জায়গা দিয়েছিল গঙ্গা। পাশের থানার এক সুদখোরকে খুন করার দায়ে অভিযুক্ত হয়ে এসেছে।

ডাক্তারবাবু একটু একটু করে জলীয় খাবারের বদলে শক্ত খাবার দিচ্ছেন। হাঁট চলা করতে পারছি। ডাক্তারবাবুর সাথে মতের অমিল হচ্ছে। তিনি ভাবতেই পারছেন না, কেন আমি হাসপাতালের অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্যের সংস্থান ছেড়ে সাধারণ ওয়ার্ডে অন্য মেয়েদের সঙ্গে থাকবার জন্য জেদ করছি। হাসপাতালে সবচেয়ে বড় স্বাচ্ছন্দ্য বাথরুম আর জলের। পুরো ফিমেল ওয়ার্ডে একটিমাত্র কল, সেটি হাসপাতালে, পেছন দিকে আর একটা নল আছে, তাতে খোলা বন্ধ করার জন্য কোনো মুখ লাগানো নেই। প্রয়োজনও নেই বোধহয়। দিনে মাত্র আধঘণ্টা মতন সময়ের জন্য জল আসে সেখানে। চারজনের মাথা পিছু একটি করে মাটির কলসি, কোনক্রমে সেটি ভরে। সবদিন হয়ত ভরেও না।

স্নানের ব্যবস্থাটা অভিনব। যেমন বিশ্রি, সেরকম অস্বাস্থ্যকর। মোটামুটি মাপের কুন্ডের মত একটা বাঁধানো চৌবাচ্চা খোঁড়া আছে মাটিতে। বাইরে থেকে মোটা নল দিয়ে জল ঢেলে তার অর্ধেকমত ভর্তি করে ছেলেকয়েদীরা। মেয়েরা দল বেঁধে বেঁধে তাতে নেমে গুঁতোগুতি করে গা-মাথা ভেজায়। যার জোর বা ক্ষমতা যত কম সে তত পরে নামতে পায়, এ ব্যাপারে অলিখিত হলেও স্পষ্ট নির্দেশ আছে। আর সপ্তাহে একদিন করে কাপড়কাচার

জন্য বড়বড় উনুনে আগুন দিয়ে লোহার ড্রামে করে সোডা আর চুন ফুটতে দেওয়া হয় পেছনের দিকে নলের কাছে। সেদিন স্নান হয় না। নিজের নিজের শাড়ি আর চটের মত মোটা সেমিজ কেচে চুন-সোডা মাখা হাত মুখ গলা সেই ভিজে কাপড় দিয়েই মুছে ফেলতে হয়। সবাই তাই করে। কোন কোন দিন হয়ত জল একটু আগে বন্ধ হয়ে গেলে এক-আধজনের কাপড় শেষ করে ধোয়াও হয় না। পরদিন দুপুরে জল আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয়। ততক্ষণ জামাকাপড় পাল্টানোও যায় না।

একজন ওয়ার্ডার অদ্ভুত নির্বিকার মুখে এনে দেয় একটা মোটা বেডকভার, কয়েকটা পেঁয়াজ। অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, ছেলেদের ওয়ার্ড থেকে পাঠিয়েছে। বেডকভারটা হাতে নিয়ে উষ্ণতায় অভিভূত হয়ে থাকি।

ছেলেদের ওয়ার্ড থেকে দুটো আলাদা পথে খবর এসেছে, আলাদা আলাদা দুজনের সঙ্গে দেখা করবার অনুরোধ জানিয়ে। প্রথমটার অনুমতি খুব সহজেই পাওয়া গেল। অফিসে দেখি জেলারে টেবিলের পাশে উদ্দিষ্ট একজনের বদলে জনাতিনেক বসা। শুনলাম, পুলিশের হাতে অমানুষিক নির্যাতনের বিশদ বিবরণ। এমন কি পায়জামা গুটিয়ে পায়ের কালশিটেও প্রদর্শন করা হল। সুতরাং জেলের মধ্যে, বাঘের গুহার মধ্যে বসে ওদের খোঁচাখুঁচি না করাই ভাল। কী ভেবেছিলেন ? আমরা রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াব, ধরতে পারলে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে ?

উঠে এলাম।

হ্যাঁ, ভেবে দেখব।

আবার দেখা করতে চাইলে জেলারকে বললেই হবে। সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

কিন্তু জেলারকে বলেও হল না। দ্বিতীয় নামটি শুনেই জিভ কেটে পিছোলেন। এই নামটির পদবির সঙ্গে নিজের পদবির মিল আছে, সুতরাং জোর করছি দাদার সঙ্গে দেখা করব বলে, শোনা গেল ছেষট্টি সালে দুর্গাপুরে পুলিসের গুলিতে মারা যাওয়া আশীষ দাশগুপ্তের ভাই। সেই আশীষ যার নামে দুর্গাপুরের 'হর্স-শু মার্কেটে'র নাম লোকের মুখেমুখে হয়ে গেল আশীষ মার্কেট।

অনুরোধের সোজা আঙুলে ঘি উঠল না বলে আঙুল বাঁকাতে হল। পাঁচদিন পর দেখা করাতে নিয়ে যাবার আগে জেলার বললেন হাঙ্গার স্ট্রাইক করার কথাটা যেন ওদের বলে না দিই। এমনিতে এটা বলার বিষয় নয় কিন্তু বারণ করল যখন নিশ্চয়ই জেল কর্তৃপক্ষের অসুবিধার কোনো কারণ [illegible]

চিন্তা একটাই হচ্ছিল। দাদা তো বললাম, সিপাই, ডেপুটি জেলার, সাদা পোশাকের পুলিসের ভিড়ে চিনে নেব কী করে। ফিমেল ওয়ার্ডের চাবিঘরে ছোট্ট খুপরিটা গিজ্‌গিজ করছে। আরে আমি ভাবছিলাম চিনে নেব কী করে! এরকম দীর্ঘ শীর্ণ শরীরে অমন স্নিগ্ধ আগুনের টুকরোর মত চোখ। একজন বিপ্লবী যখন খোলাখুলিভাবে দাঁড়িয়ে থাকে শত্রুর ঘেরার মধ্যে তখন তাকে চিনে নিতে কি নিমেষমাত্র দেরি হয়? পরের সপ্তাহেই দেখি আবার ইন্টারভিউ স্লিপ, এবার কেবল জেলার আর ফিমেল ওয়ার্ডার। জেলারের অফিসে।

কি রে গতবার দেখা করবার জন্য তোকে হাঙ্গার স্ট্রাইক করতে হয়েছিল? দূর না খেয়ে থাকবি না, স্রেফ ভাঙচুর করতে শুরু করবি, জেলার সকাতরে, ও মেঘনাদবাবু, এইগুলি কী শিখান বইনেরে? ও মেঘনাদবাবু অসুবিধা হইলে আমারে কইলেই তো আমি ঠিক করি—

আচ্ছা ঠিক আছে, তোকে কিছু করতে হবে না। এদিকে আমরাই বুঝে নেব।

তারপর থেকে মোটামুটি নিয়মিতভাবেই দেখা হতে লাগল মণিদার সঙ্গে। পনেরো মিনিট তো সময়, তার মধ্যে কত কথা জেনে নেবার আর জানাবার। জামার গুটোন হাতার তলা থেকে হঠাৎ কখনও দেখা যায় লম্বা লম্বা পোড়ানোর দাগ। তীব্র মনোযোগে কোন কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ একগাল হেসে ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে পড়া জেলারকে বলে, দ্যাখতে আছেন আমি আমার বইনের সাথে কী কথা কই আপনারে শুনতে দিমু না কইর‍্যা কত ফিস্‌ফিসাইয়া কই। আপনে এইহানে দাঁড়াইয়া করবেন কিডা? চৌকা ঘরে যান, ওইখানে আপনারে ভাগ না দিয়া সকলডি চুরি সাইরা ফালাইল।

জেলারের অফিসে জেলার সাহেবের রেক্সিন লাগানো বড় টেবিলের পাশে আছে স্টেনোর ছোট টেবিল। সেটায় রেক্সিন নেই, কে জানে কবেকার একটা টেবিলক্লথ ঝোলানো আছে। আর অবশিষ্ট জায়গার প্রায় সমস্তটাই জুড়ে রয়েছে কুমড়ো। স্তূপাকৃতি পাকা হলুদ কুমড়ো, এখানে যাকে বলে বঁইতাল।

সন্ধ্যার মুখে আকাশটা দেখতে ঠিক বাইরের আকাশেরই মত। সেদিকে না তাকালে, মেদিনীপুর জেলটা চমৎকার। কেন না প্রথমত এখানে আমাকে একা বন্ধ করে রাখা সম্ভব নয়। একটা মস্ত বড় উঠোনের দুপাশে দুটো বড় ওয়ার্ড, আলাদা রাখবার কোনো ব্যবস্থাই নেই। সুতরাং আমরা আটজন থাকি একটা বড় ঘরে। এ ছাড়া, বড় বড় গাছপালা, প্রশাসনের খানিকটা ঢিলেঢালা ভাব এবং প্রচুর সংখ্যায় সাঁওতাল মেয়েদের উপস্থিতি, যারা প্রধানত [illegible] আসে, সব

মিলিয়ে মেদিনীপুর জেলের মেয়েদের ওয়ার্ডে গ্রামীণ আবহাওয়া প্রবল। কে না জানে, সাঁওতাল মেয়েরা থাকা মানেই হাসি আর গান থাকা। অনেক পরে প্রেসিডেন্সি জেলে মাদাম রাসোর বলেছিলেন, পন্দিচেরি জেল নো গুৎ। নো ত্রিস নো চিলদ্রেন। উইমেন উইদাউত চিলদ্রেন। মেদিনীপুরে দুটোই প্রচুর 'ত্রিস অ্যান্দ চিলদ্রেন'। মাদাম রাসোর ফরাসি দেশের জাতীয় ভূগোল পরিষদের সঙ্গে যুক্ত উনষাট বছরের এক দীর্ঘদেহা স্বর্ণকেশী মহিলা। তুমি জেলে এলে কী করে—এ প্রশ্নের উত্তরে ওঁর অপরূপ ইংরেজির ব্যাখ্যা 'আই বিসা এন্দ, পোলিস সে গো নো হোয়্যার। কম্ পোলিস স্তেশান। আই গো হাওলা স্তেশান। পোলিস ক্লিং মি হিয়াল। কি যেন অনেক কিছুর শেষে 'রাসোর' হচ্ছে ওঁর নাম। কিন্তু সে কথা তিন বছর পরের। মেদিনীপুরে খুব কাছাকাছি চলে এলো মাদ্রাজি মেয়ে টি জয়লক্ষ্মী। বছর বাইশ বয়স। সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী। বাংলা শেখার প্রবল উৎসাহে আমায় জিজ্ঞাসা করে, উইককে কী বলো তোমরা? অন্যমনস্কভাবে বলি 'হপ্তা'। তার ফল প্রকাশ পায় পরদিন সকালে, যখন সদ্য অর্জিত বাংলার জ্ঞানে পুলকিত জয়লক্ষ্ম ডাক্তারবাবুকে বলে আমি হপ্তা লাগে, এবং বৃদ্ধের ফ্যালফেলে দৃষ্টিকে অ-গ্রাহ্য করে বিজয়গর্বে আমার দিকে চেয়ে থাকে। বুঝলাম, দুর্বল লাগে ওর। এরপর ধীরে ধীরে খুব ভাঙা ইংরেজি আর হিন্দি মিলিয়ে ওর সাথে আলাপ হয়। ওখানকার মেয়েরা ওর কথা বুঝতো না বলে, কারুর সঙ্গেই প্রায় কথা বলতে পারেনি এতদিন। দীনহীন পুরোহিতের মেয়ে বিয়ে করে এনেছিল যে ছেলেটি সে কলাইকুণ্ডা এয়ার বেসের কোনো নিম্নতম শ্রেণীর কর্মী। সেখানে বিনা যৌতুকে আসা বৌয়ের নিত্যদিন লাঞ্ছনার পুরনো ইতিহাস। পুরনো ইতিহাস একটি সন্তান জননের, ক্লান্তির, তিক্ততার। জয়লক্ষ্ম ীর ইতিহাসে নতুন যেটুকু, তা হলো ওকে বাড়িতে রেখে, তীর্থভ্রমণের নামে শাশুড়ির এবং আট মাসের মেয়ে কোলে নিয়ে ব্যাগের কিছু জামাকাপড় ধোপাবাড়ি দিয়ে আসার নামে স্বামীর, অন্তর্ধান। শূন্যবাড়ির উদ্বেগ-আশংকা-প্রতীক্ষা আগলে তিনদিন বসে থাকা, চতুর্থ দিনে রাস্তায় নেমে কলাইকুণ্ডা যাবার পথের খোঁজ করতে করতে ধর্ষিত হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা। অবশেষে পুলিশের হেপাজত, মেদিনীপুর জেল। ওর বয়স ওকে তিক্ততা ও দুঃখ ভোলায়, খেলায়, হাসায়। তারপর কখনো রাত্রে ঘুমের মধ্যে ফোঁপায়। সন্ধেবেলা হঠাৎ বসে বসে দুগাল বেয়ে চোখের জল পড়ে, ওরা আমার মেয়েটাকে কেন নিয়ে গেল? ওর জানো পেটের অসুখ করেছিল।

গুঞ্জার সঙ্গে জয়লক্ষ্মীর বন্ধুত্বটা দেখবার মত। দুজনে পরস্পরের ভাষায়

একবর্ণও বোঝে না। অথচ ঘণ্টার পর ঘণ্টা উঠোনের মাঝখানে পা মেলে বসে কিংবা রাত্রে ওয়ার্ডের একপাশে কম্বলের ওপর শুয়ে শুয়ে গঙ্গা গ্রাম্য মেদিনীপুরের ভাষায় আর জয়লক্ষ্মী ওর সেই ইংরেজি-হিন্দি-মাদ্রাজির অপরূপ মিশ্রণে গল্প করে যায়। খুব অসুবিধে হচ্ছে এমনও মনে হয় না। অক্টোবর গত প্রায়। গাছপালার ছায়ায় ঘেরা ঘরটার মেঝেও স্যাঁত-সেঁতে ঠাণ্ডা। বেডকভারটা আরামই দেয় প্রায়। পেঁয়াজ আর শুকনো লঙ্কার ভালোবাসাটা বুঝেছিলাম, কিন্তু মানেটা তখন ভালো বুঝিনি। এখন বুঝতে পারি। গঙ্গার মা দেখা করতে এসে দিয়ে যেত অনেক উপদেশ, নিজের চোখের জল আর ভায়ের গাছের লেবু। আঃ কি টাটকা গন্ধ ! জেলে না গেলে কখনো কি জানা যেত মুসুর ডালের জল, শাড়ির আঁচল দিয়ে পোকা ছেঁকে ফেলে, লেবুর রস দিয়ে খেতে কি যে ভালো লাগে ! তার সাথে যেদিন খাঁদি বউদি সিকি ইঞ্চি পুরু দুখানা রুটি গুঁড়ো করে নুন আর কাঁচা পেয়াজ দিয়ে মাখে—

খাঁদি বাউরীর যদি বছরে বছরে ছেলে হয়, তার দায় কারো নয়। তারা যদি খেতে না পেয়ে কাঁদে এবং পাঁচবছর ও চার বছর বয়সে একটি মাত্র বাঁশও যদি হাটতলায় বয়ে নিয়ে যেতে না পেরে পড়ে দাঁত ভাঙে, সেটা নিশ্চয়ই খাঁদি ও তার দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বামীরই দোষ। সুতরাং জ্বোরো ছেলেকে ভাত খাওয়াবার অজুহাতে সংরক্ষিত জঙ্গলের কাঠ কাটা—এই অপরাধকে লঘু করে দেখা যুক্তিযুক্ত নয় এবং জেল হবার জন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। দুজনের জেল হলে বাচ্চাদের কী হবে—এমন অদ্ভুত আবদারের কারণ আসলে অশিক্ষা, আইনের অলঙ্ঘনীয়তার মহিমা বুঝতে না পারা। খাঁদি বউদি কাজেই সকাল-সন্ধে কাঁদে, রুটি গুঁড়ো করে মেখে দিয়ে সংসারে খেতে দেবার সাধ মেটায়, ভোররাত্রে উঠে আমার পা টিপে দেবার চেষ্টা করে বকুনি খায়।

রসনা রাউত বলে একটি মেয়ে এসেছে, গোপীবল্লভপুর থেকে। আমাদের ওয়ার্ডে। শক্ত চেহারা। কথা বলে কম কিন্তু মেজাজি। রোজ লক আপের আগে বাগান থেকে জবা আর টগরফুল তুলে এনে ওয়ার্ডের স্যাঁতসেতে মেঝের একপাশে লাল-সাদা আলপনা সাজিয়ে রাখে। কোনদিন লালপতাকা, কোন দিন অন্য কিছু। ওয়ার্ডার বারণ করায় কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে তাকে আপাদমস্তক দেখল কেবল। না....মানে রোজ রোজ বাগানের ফুল...মানে তাই... বলতে বলতে ওয়ার্ডারের প্রস্থান।

মেট্রন বেশ শৌখিন লোক। গোটা তিনেক করে গজরাজ কি গোলাপ তুলে প্রায়ই খোঁপায় লাগান।

পুজো কখন পার হয়ে গেছে জানতে পারিনি। হাসপাতালের ভেতরে, এলোমেলো ঘুমজাগার ভেতরে পৌঁছয়নি খবর। কিন্তু কালিপুজোর তোড়জোড় নিয়ে বহু জল্পনা শোনা যাচ্ছে। বন্দীমেয়েদের সঙ্গে যেন ওয়ার্ডাররাও উত্তেজিত। হঠাৎ কিরকম একটা নিরাশার গুনগুন টের পাই ওয়ার্ডে অথচ পরিষ্কার করে কেউ কিছু কিছু বলছে না আমাকে। খোঁচাখুঁচি করে জানা গেল শেষে। কালিপুজোর দু-চারদিন পর ছেলেদের ওয়ার্ডে যাত্রা হয়, মেয়েদেরও নিয়ে যাওয়া হয় সেই যাত্রা দেখতে। অবশ্যই দুপুরবেলায়। অবশ্যই ঘোমটা ও ওয়ার্ডার জমাদারদের কড়া নজরদারিতে। তা হোক্, তবু তো বছরে একবার রুটিনবাঁধা একঘেয়েমির বাইরে কিছু ঘটে। তাছাড়া যাত্রা কি আর যেমন-তেমন কিছু! আর যারা কলাকুশলী? গায়ক ও অভিনেতা? তাদের কি কোন প্রত্যাশা থাকে না ঘোমটাজড়িত জড়োসড়ো বসে থাকা এই দর্শককুলের জন্য? সেই বাৎসরিক প্রত্যাশার ওপর বরফজল ছিটোচ্ছে মেট্রন। আমাকে উপলক্ষ রেখে। বলছে, হবে না এবছর যাত্রা দেখতে যাওয়া। আমাকে সঙ্গে নিয়ে ছেলেদের ওয়ার্ডে সে যেতে পারবে না, যে কোন মুহূর্তে আমি নাকি পালিয়ে যতে পারি আর কোনো ওয়ার্ডারের দায়িত্বে এই ভয়ানক আসামীকে একা ওয়ার্ডে রেখে যেতেও পারবে না।

শুরু হল গোলমাল করা, অবাধ্যতা। মেট্রন নালিশ করল বড় জমাদারের (হেড ওয়ার্ডারের) কাছে। বড় জমাদার আসায় শাপে বর। সে বৃদ্ধ দেখি আমাকে মোটেই পাত্তা দিল না। মেট্রনকে বলল আরে এতটুকু লড়কিকে এত ভয় আছে? আমি উজ্জ্বলা মজুমদারকে দেখিয়েছি। উ সব অনেক খতরনাক ছিল। আলবত যাবে যাত্‌রা শুনতে। সব যাবে, এ লড়কিও যাবে। উধারে আমাদের বহোত সিপাই আছে।

সুতরাং যাওয়া হল যাত্রা দেখতে। জীবনে প্রথমবার। কথাও হল ছেলেদের সঙ্গে। 'আসরে' বসতে গিয়ে দূর থেকে ডাকাডাকি করছে আমার নিজের শহরের বিভিন্ন সময়ে ধরাপড়া সাথীদের পাঁচজন। শুনলাম মোট সাতজন এসেছে ওরা। মেদিনীপুরের কেস আছে ওদের নামে। এক সপ্তাহ পর ফিরে যাবে।

আর সেই ফিরে যাবার দিনটাও। তিনটের সময়ে ওয়ার্ডার এল আমাকে অফিসে নিয়ে যেতে। তার কাছে শুনলাম সুবোধ মানস কাজলরা জেদ করেছে আমার সঙ্গে দেখা না করে ওরা গাড়িতে উঠবে না, গেটে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অফিসে, যেখানে আমাকে প্রথম দিন গাড়ি থেকে ফেলেছিল, পৌঁছে দেখি সেখানে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড বেধেছে। গাড়ি ঢুকে দাঁড়াবার জায়গা

থেকে দুটো করে সিঁড়ির ধাপ উঁচুতে ডানদিকে জেলারের অফিস, বাঁদিকে ডেপুটি জেলাররা বসেন। জেলারের অফিসে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে কাজল বাদল সত্যেন। টেবিল থাবড়াচ্ছে—

জেলার কোথায়? আমরা জেলারকে দেখতে চাই, দুজন ডেপুটি জেলার বলবার চেষ্টা করছেন আপনারা ইন্টারভিউ চেয়েছিলেন, এই দেখুন এসে গেছে। আর রাগারাগি করবেন না, কথা সেরে নিন। দেখুন গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ হয়ে গেল। প্রায় ছ'ফুট লম্বা কাজল অফিস মাথায় করছে।

কোথায় জেলার? কোনো কথা শুনতে চাই না।

আমি দেখতে পাচ্ছি জেলারকে। আমি গাড়ি বারান্দায়, অফিসের দুধাপ নিচে দাঁড়িয়ে আছি বলে দেখতে পাচ্ছি স্টেনোর টেবিলের ঢাকনার আড়ালে গুটিসুটি বসে আছেন জেলার। ফ্যাকাশে মুখ। স্টেনোর মুখও।

অফিসের ভেতরে ঢুকে ওদের কাছে শুনলাম আমার সঙ্গে দেখা না করে যাবে না শুনে কোন সিপাই নিজেদের অভ্যাসমত কোন নোংরা মন্তব্য করেছিল। জেলারকে পাওয়া গেল না। সিপাহিটি ক্ষমা চাইল।

ওদের নিয়ে রওনা হয়ে গেল কালো গাড়ি। জানি না ওরা পৌঁছবে নাকি পিঠে ঘাড়ে ফুটো নিয়ে পড়ে থাকবে রাস্তায় কোথাও।

প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী—এই আপ্তবাক্য অনুযায়ী, আমরা এখন নানা আবিষ্কারে সমর্থ হই। যেমন, খাবার জল ছাড়া সারাদিনের বরাদ্দ জল তিন থালা। স্নানের সময় তার প্রায় সমস্তটাই নষ্ট হয় চুলে। বহু কষ্টে আধখানা ব্লেড জোগাড় করে চুল কেটে ফেলে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আসামীদের বরাদ্দ দৈনিক সাত গ্রাম সর্ষের তেল দিয়ে শীতের ফাটা চামড়া বাঁচাবার উদ্দেশ্যে, একদিন ডানপায়ে, পরদিন বাঁপায়ে তেল মাখার প্রচলন হয়। এই সবকিছুতেই আমাদের উচ্চ হাসি জেল কর্তৃপক্ষকে অস্বস্তিতে ফেলে। আরে কষ্ট হচ্ছে কি না এ প্রশ্নের উত্তরে যখন তাঁরা শোনেন যে, আমার কাছে এমন জিনিস আছে যার কারণে আমি এগুলো গ্রাহ্য করি না, তখন প্রবল ধুলো উড়িয়ে তাঁরা পুরো ওয়ার্ড সার্চ করেন। হাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং মেট্রন ও জেলার সাতদিন ধরে সর্দিতে ভোগেন।

ভালোই কাটে দিন। কেবল কক্ষনো মনে করতে চাই না বাড়িতে রেখে আসা, আমার পেটমোটা নীলচোখ দেড়বছরের মেয়েটাকে আর ভাঙা শিরদাঁড়ার লক্ষ্মীছাড়া ব্যথাকে।

গঙ্গা গিয়েছিল অফিসে। ওর স্বামীর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন জেলার। টিপ পরে, খোঁপায় কাঁটা গুঁজে গিয়েছিল। ফিরে এল

সমস্ত মুখ ফেটে পড়ছে। ওয়ার্ডের ভেতর ঢুকে আছড়ে পড়ে কান্না। কী হয়েছে? ওর স্বামী অত্যন্ত নীচ স্বভাবের লোক। বিয়ের পরপরই গঙ্গা আবিষ্কার করে নিজের ভাগ্নীর সঙ্গে সংসর্গিত লোকটি। একই ঘরে তাদের দুজনের সঙ্গে রাত কাটাতে হয় গঙ্গাকে কতদিন। সে অপমানের প্রতিবাদ করা যে ওর অধিকার জানত না। স্বামীকে মেনে নিতে হয় এই তো জেনেছে পিঠময় কঞ্চির দাগ নিয়ে। ভাগ্নীই একমাত্র নয়। নারীমাংস সম্পর্কিত মামলায় অভিযুক্ত হয়ে সাতবছর জেল হয়েছে লোকটির। সেই স্বামীকে জেলার দায়িত্ব দিয়েছেন, গঙ্গাকে সঠিক পথ বাতলাবার। স্বামীত্বের স্বীকৃত অধিকারে, এক অফিস অপরিচিত পুরুষের মধ্যে গঙ্গাকে সে নোংরা ভাষায় লাঞ্ছনা করেছে, লাজলজ্জার মাথা খেয়ে উড়নচণ্ডী ভগবানে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে মেশার জন্য। সমাজে মুখ পুড়িয়ে জেলে আসার অপরাধে গঙ্গাকে সে যে ফিরে গিয়েও ঘরে নেবে না, সে কথা জানিয়ে দিয়েছে উপযুক্ত জোরের সঙ্গে। জেলারকে ডেকে পাঠালে তিনি আসেন না। বিকেলবেলা দরজার বাইরে থেকে আমাকে অসুস্থ শরীরে উত্তেজিত না হবার উপদেশ ও বইপত্র পাঠিয়ে দিয়ে, পড়াশুনা নিয়ে থাকবার পরামর্শ দিয়ে দ্রুত চলে যান। ডেবরা থানা থেকে আসা চালের চোরাচালানকারিণী বয়স্কা আদিবাসি মাসি সন্ধেবেলা বসে, গঙ্গার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ওর স্বামীকে, জেলারকে মাতৃস্তন্যে প্রতিপালিত সমস্ত পুরুষ জাতকে প্রাণখুলে গালি দেয়।

রোগা শুকনো চেহারা শশীবিবির বয়স হবে গোটা পঁয়তাল্লিশ। জমি নিয়ে কাজিয়ায় ছেলে-স্বামীর সঙ্গে সেও অভিযুক্ত হয়ে এসেছে। ওর সম্পর্কে শুকনো বিশেষণটাই বোধহয় সবচেয়ে আগে মনে আসে। তীব্র ফর্সা মেচেতার দাগভরা মুখ, খর কণ্ঠ, বিশ্বপৃথিবীর সবকিছুর ওপর কুঁচকে থাকা একজোড়া চোখ, অশালীন কর্কশ জিভ। সেই শশীবিবিকে দেখি স্ট্যাম্পের কালির মত রঙের শাড়ির আঁচল মাথার ওপর দিয়ে গলা পর্যন্ত টেনে, ওয়ার্ডারের পেছন পেছন অফিসের দিকে যাচ্ছে। ওর মামলার ডেট পড়েছে। শুধোই,

—শশীবিবি অতোবড়ো ঘোমটা দিয়েছ কেন?

—আওরাতকে হায়া লজ্জা রাখতে হয় দিদি। ওর মুখের ভাষায় লজ্জাও লজ্জা পায়, ইস্তক ওয়ার্ডাররাও।

—অতোবড়ো ঘোমটার ভেতর থেকে কিছু দেখতে পাবে না যে গো।

—আল্লাতাল্লার নিয়ম দিদি, আবরু না রাখলে দোজখ্ হবে।

আর আল্লাতাল্লার তৈরি এই এতো বড়ো দুনিয়াটাকে ভালো করে জী-জান ভরে দেখে নেবার কোন নিয়ম নেই শশীবিবি? কে ঢুকিয়ে দিয়েছে

ওর রক্তের মধ্যে এই সব নিয়ম, যা ওকে তৃষিত হতে পর্যন্ত বারণ করে দেয়। মনোরঞ্জন ছাড়া অন্য কোন সৌন্দর্য কি শালীনতার অর্থ নেই ওর পৃথিবীতে।

শুকনো চেহারার আরেকজন! নলিনী ঘড়ুই। নামটা জেনেছি পরে। পোশাকটা চেনা তার অনেক আগে। হেড ওয়ার্ডার। গাছের পাতা ঘসে ঘষে পোস্টার লিখেছিলাম ওয়ার্ডের দেওয়ালে। চুনের বালতি আর লোকজন নিয়ে মুছতে এসেছেন। আমি একা, কাজেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কী করব। উঁচু চড়া গলায়, এইগুলো কী করেন আমাদের চাকরি নিয়ে বিপদে পড়ব। আর এখানে কে বা আছে যে পড়ে বুঝতে পারবে। এ সব লেখেন কেন। তারপর চোখের পাতাটি পর্যন্ত না কাঁপিয়ে, শুধু গলার স্বরটা একটু নেমে যায়—

ছেলেরাও তো শুনেছে এই সব লেখার কথা—আর এই গুলি কি চুন! একটু কাপড়ে ঘসলেই পরিষ্কার—

অভিভূত হয়ে থাকি! নীরস শুকনো মূর্তি। কথার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠার কাছে বলটা ওঠানামা করে।

মনি-অর্ডারের কুপনে মায়ের হাতের দুলাইন লেখা। বোনের ছেলে হয়েছে। ওর প্রথম সন্তান। তার বাবাও গরাদের পিছনে। অনেকবার চেয়ে একটা পোস্টকার্ড পেয়ে, যেদিন নতুন ম্যাডোনাকে অভিনন্দন জানানো চিঠিটা কর্তৃপক্ষের দপ্তরে জমা দিই সেদিন বিকেলে ইনল্যান্ডটা আসে। এখানে ওখানে চোখের জলের দাগ। আমার ছেলেটা মরে গেল রে! কি ছোট নাক, ছোট ছোট আঙুল, ওকে ওরা নিয়ে চলে গেল মাটি চাপা দিয়ে দেবে বলে। —তিন দিন আগে পৌঁছেছে জেল অফিসে।

সকালের ভুট্টার খিচুড়ির অনুপাত, পৃথিবীর জলস্থলের জলের অনুপাতে চেয়ে বেশি। ওখানকার সাঁওতাল মেয়েরা কাঁঠালপাতা দিয়ে একটা চমৎকার চামচ তৈরি করতে শেখায়। শীতের রোদে পা মেলে বসে খিচুড়ির জল খেতে খেতে, দু-একদিন তার মধ্যে বিড়ির টুকরো পেয়ে গেলে, আমরা যত্ন করে তুলে রাখি। জেলারকে অনুরোধ করলাম অন্তত রান্নাবাড়ির সেপাই ও মেটদের সিগারেট সাপ্লাই করতে।

শান্তবালা কুইলা বলে একটি মেয়ে এসেছে খুনের কেসে। কাঁথির কাছে কোথাও বাড়ি। বিবর্ণ রক্তহীন হলেও গোল মুখ। গোরুর চোখের মত কালো, মার খাওয়া চোখ। তেরো বছর ধরে নিরন্তর মার খেতে খেতেই এগারোটা ছেলেমেয়ের মা। চারটে সকালসকাল মরে এখনও আরও সাতটা মুখ

খাওয়াতে, বড় করতে। হালের বলদকে প্রতিদিন অন্ধকার থাকতে উঠে ভরপেট খাবার না দিলে জোয়াল টানবে না, শান্তবালাকে একটা সদয় কথা বলবারও কেউ নেই বছরের পর বছর। অথচ সেই অনেক বছর সয়ে যাওয়ার পরও কেউ জানে না কোনটা উটের বোঝায় শেষ খড় হয়, ঠিক কখন বাঁধটা ভাঙে। গলার রুপোর হার বিক্রি করে শেয়ালমারা বিষ কিনল শান্ত, ফেনভাতের সঙ্গে লঙ্কা আর বিষ মেখে খাওয়াল মাতাল লোকটাকে। সে মরে যেতে থানায় গেল সটান।

—থানায় কেন গেলে শান্ত? লোকটা তো তোমাকে কষ্টই দিয়েছে।

তাই জন্যই তো বিষ দিলাম। ড্যাবডেবে চোখ মেলে বলে শান্ত, তাবলে থানায় যাবনি? পাপ হয় না মানুষ মারলে!

খারাপ কাটে না দিন। খবরের কাগজ পাওয়া যায়। লাইব্রেরি থেকে মাঝে মাঝে উনিশশো বেয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ সালের তারিখ লাঞ্ছন-সহ বইও। তাছাড়া মেদিনীপুর জেল তো বিনয়, উজ্জ্বলার বাস করে যাওয়া জেল। এদিকে নেপথ্যে জল যে কিছু গড়ায় সেটা তখন টের না পেলেও, বোঝা যায় যখন অন্তরীক্ষ দেখা দেয় একটি চিরকুটের রূপে—ট্রানসফার। আধঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে হবে। তৈরি হবার আর আছেই বা কী! কিন্তু কোথায় ট্রানসফার? আমার শহরের জেলে? হ্যাঁ। চারমাস পর আবার সে ফটক দিয়ে বেরোই। পিছনে রেখে যাই ওদের সকলকে, বাতের ব্যথায় অনড় সৌদামিনী, দুর্বোধ্য ভাষায় গান গাওয়া পাঞ্জাবি পাগলী, পুরুলিয়ার গ্রাম থেকে আসা কালো পাথুরে চেহারার সরস্বতী মেঝেন আর তার কোলের দু বছরের প্রাণমণিকে,—যে আমাকে তাদের বাড়ি যেতে নিমন্ত্রণ করেছে। আর রেখে যাই জ্বলজ্বলে তারার মত এক ছেলে, আমার মণিদাকে। আর কখনও খবর পাইনি তার।

তারপর আবার দেখি মাঠ, ছোট ছোট জনপদ। এই রাস্তাটা আমার চেনা। বাঁকুড়া থেকে দুর্গাপুরের পথে ঘুরে যায় গাড়ি, দারুকেশ্বর নদী। বাড়ি থেকে কলেজ-হোস্টেলে ফিরতাম এই পথে। একটা চেনা বাস দেখতে পাই, গান গাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। কিন্তু জি.টি. রোড ছেড়ে, আমার চেনা ভূগোল ছেড়ে, কোন একটা অজানা অঞ্চলে ঢোকে গাড়িটা। মাইল পোস্টে লেখা দেখি ইলামবাজার। সন্ধে হয়ে আসছে। যাচ্ছে যে কোথায়। ড্রাইভারের পাশে বসা সার্জেন্ট ঘাড় ফিরিয়ে বলেন, আমাদের ওপর আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন। আমাদের অর্ডার নেই ডেসটিনেশান বলবার। চলুক তাহলে ইচ্ছেমত। যেখানেই যাক সেখানেও তো মানুষ আছে। কষ্ট পাওয়া মানুষ।

শেষ আলোয় দেখি ছোট্ট ব্রিজের নীচে ছোট্ট নদী। তাতে জাল টেনে তুলছে একজন, পাশে তার বৌ, হাতে ঝুড়ি। কালো ছেলে, ন্যাড়ামাথা, কোমরে ঘুনসি বাঁধা, কাদা ঘাঁটছে মনের সুখে।

ছবিটা স্পষ্ট এখনও, আলোছায়ার ফ্রেম শুদ্ধু।

গাড়ি চলে সারারাত। শীত করে। আমার চাদরটা দিয়ে এসেছি গঙ্গা-জয়লক্ষ্মীকে। শেষরাত্রে দাঁড়াই একটা গেটের সামনে। ঝুপসি ঝুপসি অন্ধকারের গাছ চারদিকে। গেট ডিউটির হেড ওয়ার্ডার ঘুমচোখে কুৎসিত গালি দিয়ে তালা খোলে। অফিসে বসে থাকি অনন্ত সময়। 'বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল' লেখা অপরিষ্কার ফাইলপত্রের ওপর নৃত্যরত ইঁদুর দেখি তাকিয়ে তাকিয়ে। ভোরবেলা মেট্রন আসেন। সার্চ। মেয়ের ছবিটা রেখে দেন, 'সেন্সার করাতে হবে'। ভেতর থেকে একজন মহিলা আসে ওয়ার্ডারের পোশাক পরা। বাইরের গেটের দিকে যাবার সময় তার পোশাকের ভিতর থেকে দুটো ডিম হঠাৎ মাটিতে পড়ে ফেটে যায়। গেট ওয়ার্ডারের সময়োপযোগী রসিকতায় হাসতে হাসতে নিয়মানুবর্তিনী মেট্রন আমাকে নিয়ে ফিমেল ওয়ার্ডের দিকে এগোন।

বহরমপুর জেলের ফিমেল ওয়ার্ডের ভেতরে ঢুকবার জন্য সচরাচর যে পথটা ব্যবহার করা হয়, সেটা আসলে একটা বড়ো মাপের জানলা, মাথা নিচু না করে ঢোকা যায় না। কর্তাদের যাতায়াতের জন্য আলাদা সত্যিকারের দরজাও অবশ্য আছে। সেই জানলা পার হয়ে ভেতরের বাগানে আধভেজা ঘাসে বসে থাকি শীতে আর পিঠের ব্যথায় প্রায় অবশ হয়ে। মেট্রন অফিসে জানতে গিয়েছে আমি কোথায় থাকব। আমার সামনে মস্ত বাগান, বড় বড় কাঁঠাল গাছ, তারপর ফুট দেড়েক উঁচু আলকাতরা লাগানো পরিষ্কার টানা বারান্দার ওপর ব্যারাক ধরনের লম্বা একতলা লালরঙের বাড়ি। বাগানের মধ্যে কুয়াশায় ঝাপসা মেয়েরা কাজ করছে। তাদের সকলের একই রকমের সাদা শাড়ি অস্বাভাবিক পরিষ্কার। অবাক হয়ে ভাবছি ওই মেয়েরা কেউ আমার কাছে আসছে না, কিছু জিগ্যেস করছে না, কেন ! এরকম তো হবার কথা নয় ! হঠাৎ একজন মধ্যবয়সী দাঁত উঁচু রোগামত মেয়ে রাগী গলায় কী বলতে বলতে একেবারে আমার সামনে এসে পড়ে।

কেনে কথা বলব নাই—তুমরা যে বলছ—আমার দেশের মেয়া বটে—আমি কথা বুইলব—বাঘ-ভালুক লয় যে খায়ে লিবে। ও আমাকে ঝকঝকে মাজা টিনের গ্লাসে পাতলা গরম চা দেয়, ফিস্‌ফিস করে বলে—

তুর কাছে আসতে মানা আছে, মার্কা কাটবে।

বুঝলাম। এই 'মার্কা' হল জেল কর্তৃপক্ষের হাতের জাদুকাঠি, এই ইশারায় সাজা পাওয়া বন্দীরা ওঠবোস করে। কোর্টে একজনের যত বছরের সাজা হয়, জেলের হাতে ক্ষমতা থাকে বন্দীর 'গুড কনডাক্ট'-এর ভিত্তিতে তা নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিয়ে দেবার। এই 'গুড কনডাক্ট রেমিশান'ই চলতি নামে 'মার্কা'—যার উল্লেখমাত্রই উদ্ধততম বন্দীও ফণা নামিয়ে নেয়। ত্রেতার শব্দভেদী বাণের চেয়ে এই শব্দের শক্তি একটুও কম নয়।

প্রায় সাড়ে নটা-দশটায় একজন ডেপুটি জেলার আসেন। পাগলদের থাকার একটা সেল খালি করা হয়েছে, আমার আবাসস্থল হিসেবে। ভদ্রলোক সম্ভবত 'কনফিডেনশিয়াল' কাগজপত্রের বর্ণনার সঙ্গে আমাকে ঠিকমত মেলাতে পারেন না। ফলে একটু অপ্রস্তুত যেন। আমার গরাদের দরজায় চট লাগিয়ে দিলে ঠাণ্ডা কম ঢুকবে এরকম একটা প্রস্তাব করেন। এবার আমার সত্যি রাগ হয়। ওয়ার্ডের দেওয়ালে ঠিক দু'হাত অন্তর একটা করে জানালা, মেঝে থেকে অন্তত আট ফুট পর্যন্ত উঁচু, পাল্লাবিহীন গরাদের ফাঁক দিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে আসা শীতের বাতাস হু হু করে এপার-ওপার করছে। বাসিন্দা মেয়েদের পরনে একটি করে হাঁটু পর্যন্ত সেমিজের ওপর কাঁচা সুতোর শাড়ি, অনেকের কোলে ছোট বাচ্চারা কাশছে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রচুর চটই আসে, সব জানলাতেই পর্দা লাগানো হয়।

ছয় বাই আট ফুটের সেলের সামনে টানা ঢাকা বারান্দার অংশটা ফাঁকা। তার সামনেই বিশাল উঁচু লাল ইটের পাঁচিল। সেলের দরজা ঘেঁষে বসে অনেকখানি মাথা কাত করলে, এক চিলতে নীল দেখা যায়। রাত্রে ওখানে বিরাট মার্কারি ভেপার ল্যাম্প জ্বলে। হঠাৎ ওরকম খুপরিবন্দী হয়ে যাওয়া, ভাঙা পিঠের বিশ্রী ব্যথা সব মিলে শরীর খুব অবাধ্যের মত বিদ্রোহ করে। ফলে বৃদ্ধ ডাক্তার দে একদিন একস্-রে করতে পাঠান ও রিপোর্ট দেখে কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত জ্যাকেট প্লাস্টার করে হাসপাতালে ভর্তি করে নেন। হাসপাতাল মানে মেদিনীপুরের মতই ওয়ার্ডের মধ্যে একটা বড় ঘর। অন্য জেলেও দেখেছি মেট, মানে কনভিক্ট ওভারসিয়াররা, বরাবরই হাসপাতালে থাকে। তাদের কাছে এটার মানে ক্ষমতা ও স্বাচ্ছন্দ্য আর বিনিময়ে মেট্রনের কাছে এর অর্থ হচ্ছে ওষুধ, রুগীদের পথ্য চিনি, পাঁউরুটি, বিস্কুট, ডিম, বিছানার চাদর ইত্যাদির অবাধ সাপ্লাই। এখানে প্লাস্টার হবার দুদিন পরই হঠাৎ মা আসেন মেয়েকে নিয়ে। সে তো দুবছরের বিস্ময়ে এতা কী জামা? জিগ্যেস করে অস্থির। কেবল আমার মনে হচ্ছিল মা যদি আর

দিন দুই আগে আসত।

প্রথম দিন সকালে যে চা খেতে দিয়েছিল তার নাম যামিনী।

দুর্গাপুর থেকে এসেছে খুনের দায়ে বিশবছরের সাজা নিয়ে। সাময়িক উন্মাদ অবস্থায় নিজের স্বামীকে মা কালীর কাছে বলি দিয়ে, মাথাটা নিয়ে বেনাচিতি বাজারে ঘুরছিল। জেলে সঙ্গে এসেছে তার চার বছরের মোটাসোটা কোলের মেয়ে পুষ্প। যেদিন হাইকোর্ট থেকে খবর আসে যামিনীর আপিল নাকচ হয়ে যাবার, তারপর তিনদিন যামিনী কারো সাথে কথা বলে না, স্নান করে না খায় না। তৃতীয়দিন রাত্রে উন্মাদ পাগল হয়ে যায়। রাত্রি দশটার সময় ওয়ার্ডের মেয়েদের এমন আতঙ্কিত চিৎকার ওঠে, যেন মুরগির খাঁচায় বিড়াল ঢুকে গেছে। গেট থেকে ওয়ার্ডের চাবি এনে, দরজা খোলা হতে যে চল্লিশ মিনিট সময় যায়, তার মধ্যে যামিনী পুষ্পর পা ধরে তুলে তাকে মেঝেতে আছাড় মারে। আগুন লাগলে, বন্ধ ওয়ার্ড দগ্ধ হয়ে যেতেও মোটামুটি এতটাই এময় লাগত। শেষে এক সময়ে দরজা খোলা হলে, মেট বিমলাভাবী ও আরও দু-তিনজনের সঙ্গে আমিও ছুটে যাই। যামিনী বিকারে চিৎকার করছে—'আয় মা কালীর কাছে বলি দেব'। তার খোলা চুল, প্রায় নিরাবরণ চেহারা ও চিৎকারে সত্যিই আতঙ্ক হয় বলেই সমস্ত মেয়েরা ওয়ার্ডের এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে ছিল। এবার তারাও এগোয়। ওরা কেমন করে পেছন থেকে ফাঁস দিয়ে টেনে যামিনীকে ধরে নেয় সে সব আমি আর তাকিয়ে দেখি না। পুষ্প মেঝেতে পড়ে আছে, শক্ত কাঠ—কিন্তু শুনতে পাচ্ছি তখনও ওর গলার ভিতরে একটা অনিয়মিত সামান্য ঘড়ঘড়ে আওয়াজ হচ্ছে মাঝে মাঝে। এতক্ষণে জেলারের খাওয়া শেষ হয়েছে বলে উদ্বেগে তিনি নিখুঁত ইভনিং সুটটি না ছেড়েই চলে এসেছেন। কারো কোনো আঘাত লেগেছে কি না তিনি জানতে চান এবং আমার উত্তেজনায় মৃদু পরিশীলিত বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি আরও জানান যে পুষ্পর মৃতদেহ নিয়ে যাবার জন্য ইতিমধ্যেই অ্যাম্বুলেন্সকে খবর দেওয়া হয়েছে। জেলের মধ্যে কোনো অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলে যে পুলিশ কেস হয়ে থাকে, তাতে আমি পুলিশের কাছে সাক্ষ্য দেব কি না সেকথাও জানতে চান।

সে রাত্রি সকাল হয়। খুব গুমোট সকাল। কাঁঠালগাছের পাতাগুলো পর্যন্ত চুপ করে থাকে। ডাক্তার এসে লারগাকটিল ইঞ্জেকশান লেখেন যামিনীদির নামে। ওর ভয়ঙ্কর চিৎকার তখনও দূর থেকে শোনা যাচ্ছে। মেট্রন সিরিঞ্জ নিয়ে সেলের বারান্দা পর্যন্ত গিয়ে, দ্রুত পালিয়ে এলেন। যামিনী তাঁকেও মা কালীর কাছে বলি দেবে বলেছে। পুষ্প নেইয়া কোমরের কাপড়ে গিঁট

দিয়ে একটা মোটা লাঠি হাতে নিয়ে এগোচ্ছে মেট্রনকে অভয় দিতে দিতে। যামিনীর হাত পা কাঠির মত শুকনো, সরু। ডাক্তারকে জিগেস করলাম আমাকে ইঞ্জেকশানটা দেবার অনুমতি দেবেন কি না। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, দেখুন। অন্যদের সঙ্গে যেতে বারণ করে, গিয়েছি ওর সেলে। পুষ্প নেইয়া চাবি খুলে দিয়ে সরে গেছে। যামিনী, শুধু খাটো শেমিজটা পরা গেটের ওপরে উঠে দুহাতে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দেখাচ্ছে ছোট মেয়ের মত। চুপ করে গিয়েছে। গা আগুনের মত গরম। হাতের ওপর হাত রেখে আস্তে আস্তে বললাম যামিনীদি, তোকে ওষুধ দেব।

—তোকে খুলে দিয়েছে?

—এখানে আসব বলে খুলেছে। তুই শুবি? ইনজেকশান দেব।

এই সময়টার ছবি মনে হয় কোনো দিন ভুলব না। যে সব উজবুকের মত কাজের জন্য নিজের কাছেও নিজের কান লাল হয়ে যায়, তার একটা সেদিন করেছিলাম। ইঞ্জেকশান দেবার পরই যামিনী আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, আগের মতই গেটের ওপরে চড়ে। বেরিয়ে এসে দরজাটা টেনেছি। আমি আজও স্থির মনে করতে পারি না, আমার হাতে কি কোনও দ্রুততা ছিল? ভারী দরজাটা বন্ধ হবার ঝাঁকুনিতে ওর কপালটা গরাদে ঠুকে গেল। আর যামিনী, আধঘন্টা আগের ভয়ঙ্করী, কেমন অদ্ভুত হেসে আমাকে বলল, তুই আমার মাথা ঠুকে দিলি? যামিনীদি; আমি কী করে তোকে বোঝাব— ! আজও ওর সেই বিষণ্ণ হাসি আমাকে দোষী করে রেখেছে।

পুষ্প কিন্তু বেঁচে থাকে। ছ' মাস পরে চলৎশক্তিহীন অবস্থায় হাসপাতাল থেকে ফিরে আসে। আর যেহেতু কোনো পাগলই একটানা ওরকম উন্মাদ অবস্থায় থাকে না, দিন দশেক পর থেকেই যামিনীর মনে পড়ে যায় পুষ্পকে সে কী করেছে। তিনমাস পর প্রথম যেদিন ও শোনে পুষ্প বেঁচে আছে, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের তীব্র আলোছায়া ওর মুখে পরপর খেলে যায়। আর বিপদের ঝুঁকি নেওয়া যায় না বলে, যামিনী আজকাল সারাদিন বাগানে একটা পেয়ারাগাছের নিচে শিকল দিয়ে বাঁধা থাকে। পুষ্প ফিরে আসবার দিন দুই পর ওকে কোলে করে, যামিনী দেখতে পায় এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াই। বাড়িতে রেখে আসা আমার মেয়েটা যে পুষ্পর চেয়েও ছোট। কিন্তু মাকে দেখামাত্র পুষ্প ভয়ে নীল হয়ে আমাকে এমন আঁকড়ে ধরে যে, যামিনীর মুখে আবার সেই অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে।

আমি তো তোর মা নই, আমি তোকে মাইরে দিয়েছিলি—উয়ারাই তোর মা।

মাথার পিছন দিকে চোট খাওয়া পুষ্প ধীরে ধীরে মৃগীরোগের শিকার হয়। বসে বসে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যেত। সুপ্রিম কোর্টে করা আপিলে যামিনীর সাজা মকুব হয় পাগল বলে। আর পাগল বলেই ও বরাবরের জন্য জেলে রয়ে যায়। কে বন্ড দিয়ে ওকে বাড়ি নিয়ে যাবে?

মেদিনীপুরে যেমন একটা মস্ত বড় উঠোনের তিনদিকে ছড়ানো হাসপাতাল আর দুটো বড় ওয়ার্ড, বহরমপুর জেলে তা নয়। ওয়ার্ড বাড়িটা একটা টানা লম্বা ব্যারাকের মত। কিন্তু দুটো হলঘরের (এখানে বলে নম্বর) মাঝখানের পাঁচিলটা সামনের বারান্দাকেও ভাগ করেছে। এমনকি সেই পাঁচিল নিচে নেমে এসে বাগানের মাঝখান দিয়ে চলে গেছে বাগানকে দুভাগ করে। বাগানের মাঝামাঝি তার গায়ে একটা দরজা, সরকারি সবুজ রঙের। তার চাবি ওয়ার্ডারের কোমরে। ওটা ছাড়া ওয়ার্ডের এক দিক থেকে আর এক দিকে যাবার কোন পথ নেই। মানে অনুমোদিত পথ নেই। দুটো ওয়ার্ডের নাম যদিও হাজতী নম্বর আর মেয়াদী নম্বর কিন্তু কার্যত দুটোতেই সাজাপাওয়া মেয়েরাই থাকে। হাজতী তো মোটে জনাকয়েক, মুর্শিদাবাদ জেলার এধার ওধার থেকে আসা মেয়ে — তাদের সংখ্যা কখনই আট ছাড়ায় না।

যে ওয়ার্ডের সঙ্গে লাগানো হাসপাতাল ঘর তারই নাম মেয়াদী নম্বর। মেয়াদী নম্বরের দিকে বাগানের মাঝখানের দেওয়াল ঘেঁষে খুঁটি বসানো টিনের চালা। তার নিচে তিনটে উনুনের গর্ত। সব কুচকুচে কালো। বেশ আগে নাকি এখানে ভাজা খাটনি হত। সকালে বস্তা করে ছোলা আসত মেয়েদের ওয়ার্ডে। বড় বড় কড়ায় করে সেই ছোলা ভেজে জাঁতায় ভেঙে ছাতু করা হত। বিকেলের খাবার আসবার আগে সেই ছাতু ওজন করে ফেরত নিয়ে যেত গেটের সিপাই। এই ভাজা খাটনি মেয়েদের খুব পছন্দ ছিল শুনে প্রথমে অবাক। হবে না কেন? ওতে মার্কা বেশি। সারাদিন আগুনের তাতে সেঁকা হলে যদি ক'দিন আগে বাড়ি যাওয়া যায় তাহলে পুড়তে আপত্তি করবে কোন্ মা কোন্ বৌ?

তার চেয়েও বড় যে সুবিধা পাওয়া যেত তা হল বাচ্চাদের হাতে দেবার মত এক দু মুঠো ছোলাভাজা। কাঁচা ছোলার ওজনের সঙ্গে ভাজা ছাতুর ওজনের সমীকরণ তেমন কড়াকড়িভাবে করত না প্রায় কেউই।

কিন্তু প্রধানত এই কারণেই ভাজা খাটনি বন্ধ করে দিলেন সেই যে সেই বন্দিনী দরদী লেখক সুপার-সাহেব। তাঁর কথা বহরমপুরের পুরনো সাজা পাওয়া মেয়েরা সবাই নির্ভুল মনে রেখেছে। থাকি ভুটানী নামের বিশবছরী, খাবারে পেট ভরে না খাবার চুরি হয় বলে, নালিশ করেছিল সাহেবের

ইনস্‌পেকশান ফাইলে। নালিশের বিষয়বস্তু, পুরনো মেয়েরা বলে, তুচ্ছ হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু ফাইলে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে কথাবলার মত ঔদ্ধত্যের অপরাধে থাকিকে হাত-পা বেঁধে বাগানের রোদে সারাদিন চিত করে ফেলে রাখা হয়।

বহরমপুর জেলের মেয়েদের ওয়ার্ডের লিখিত পাগল জনাবারো। তাদের দেখাশুনো করে সুন্দরবনের বাদা অঞ্চল থেকে আসা পুষ্প নেইয়া। মেয়ে চালান দেবার ব্যবসা ধরা পড়ে সাজা হয়েছে তার। কালোরঙের আঁটো স্থূলকায়া, হাঁটুর একটু নিচ পর্যন্ত তোলা শাড়ি শেমিজে, মাথার মাঝখানে তুলে বাঁধা ঝুঁটিতে, শক্ত চোয়ালে, প্রায় ষাট বছরের পুষ্প নেইয়ার আকার ও প্রকার খানিকটা পুতনার আদল আনে। সে জানে পাগলরা তার মার্কা পাবার উপায় মাত্র। সুতরাং তাদের ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখার ব্যাপারে সে অনলস। একাজে তার সহায়ক জনতিনেক অল্পবয়সী মেয়ে, যারা পুষ্প নেইয়াকে ও পাগলদের সমপরিমাণে ভয় পায়, এবং একটি মোটা লাঠি। একাজে সে এমন কুশলতা অর্জন করেছে যে, পাগল নয় এমন মেয়েদেরও অক্লেশে মেরামত করতে পারে। প্রায়ই তাকে নিজের মনে বক বক করে সদম্ভ ঘোষণা করে যেতে দেখি—আমার নাম পুষ্প নেইয়া, এমন গাঁটে গাঁটে মারব যে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব। চেহারা ও স্বভাবের গুণে পুষ্প নেইয়ার দোর্দণ্ডপ্রতাপ। আর একটা কারণেও ওয়ার্ডাররা তাকে হাতে রাখে। পাগলরা যেহেতু অপরাধী নয়, জেলের আইনানুসারে তাদের যত্নআত্তির নামে কিছু অতিরিক্ত জিনিস ওয়ার্ডে আসে। যেমন নারকেল তেল, দুধ, মাছ, চিনি ইত্যাদি। পাগলদের কথার ঠিক কী! খেয়েও বলে খাইনি! অবশ্য প্রেসিডেন্সি জেলের দু'শ পাগলের জন্য বরাদ্দ প্রতিদিন দুড্রাম দুধ, পঁচিশ পাউন্ড পাঁউরুটি, দু পাউন্ড মাখন, এক ডেকচি চিনির তুলনায় পুষ্প নেইয়ার ক্ষমতার বরাদ্দ আর কতটুকু! তাছাড়া প্রেসিডেন্সির মত এক শীতে আটজন পাগল ঠাণ্ডায় কি অনাহারে মরে গেলে তো পুষ্পর চলবে না! তার পাগলদের গোটাগুটি রাখতে হবে। তার মার্কা আছে।

বাইরের রাজনৈতিক পারদ ওপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, আমার সেলের দরজা চব্বিশ ঘণ্টার জন্য বন্ধ। স্নান ইত্যাদি কারণে পনেরো মিনিট বাইরে থাকার অনুগ্রহ হয়েছিল। নিজের দোষে সেটা খোয়া গেছে। স্নান করার সময় যাতে ডানা মেলে আঠারো ফুট উঁচু পাঁচিল পেরিয়ে উড়ে না যাই, সেটা দেখার জন্য খোলা চৌবাচ্চার ধারে স্নানের জায়গা পাহারা দিতে এল দুজন সেপাই। মুর্শিদাবাদের বেগমদের সাথে এরকমই নোকর খানসামা থাকত বলায় তাদের

ভারি অপমান হয়েছে। সুতরাং এখন পুষ্প নেইয়ার মেয়েরা কেউ প্রহরাধীনে এক বালতি জল আমার গরাদের সামনে রেখে যায়। একটু তাকানো ছাড়া আর কোনো সম্ভাষণ করার কথা ওঠে না। গরাদের এপারে বসে টিনের গ্লাস দিয়ে বালতির জল তুলে তুলে স্নান করা যায়। জল বেরোবার নর্দমা সেলের অপর প্রান্তে। কাজেই মেঝেতে রাখা কম্বল, জামাকাপড়, বই পুরো ভিজে যায়। সেগুলো তুলে ধরে শুকোবার কাজে রোজ বেশ সময় কাটে। বাইরে রাখা থালার ভাত-তরকারি, ভিতরে রাখা আমার থালায়, গরাদের আড়াই ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে ঢেলে দিতে আঙুলের যে সূক্ষ্মতা প্রয়োজন, তা না থাকায়, ইতোয়ারী লোহারের হাত থেকে জলের গ্লাসটা মাটিতে পড়ে যায়, এবং সে বুদ্ধিহীন মেয়ে ওয়ার্ডারের সামনেই হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে 'কেনে তুমাকে এমন করে খাতে দেয়—গরুছাগলকেও তো লোকে খুইলে দেয় খাবার কালে।' আমি যে গরুছাগল নই, তারও অধম নিতান্ত এক বাঁচতে চাওয়া মানুষ, সে কথা ওকে কে বোঝায়! ফলত বিকেল থেকে ইতোয়ারী আসে না। ওয়ার্ডার ভুঁড়ি ভাঁজ করে ভাত দেবার চেষ্টা করলে আমি তার হাত থেকে খাবার নিতে অস্বীকার করি। কিঞ্চিৎ জবরদস্তির ফলে, পুষ্প নেইয়াকে আবার বারান্দায় ছিটিয়ে পড়া ভাত ডাল পরিষ্কার করাতে হয়। দিন দুয়েক খাবার ফেরত পাঠানোর পর, গরাদের গেট আট ইঞ্চি ফাঁক করে ভাতের থালা ভেতরে ভরে দেবার ব্যবস্থা হয়। দিন দশেক পর থেকে আবার ইতোয়ারী আসে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে একটুখানি হাসে। পিছনে মায়ের কাপড় ধরে দাঁড়িয়ে থাকে ওর দুবছরের ছেলে ভজা। আমি তাকে বলি ভজাকাকা, সে সাড়া দিতে পারে। ওর ছোট্ট গায়ের গেঞ্জিটা ওর মা কী করে জোগাড় করেছে জানি না, কিন্তু কোমরের ফুটো পয়সাওলা কালো ঘুনসিটা কিনেছে এক মাসের পাওনা চার টুকরো মাছই কোন ওয়ার্ডারকে দিয়ে। ভজাকাকা জন্মেছে জেলেই। ওর রাজমিস্ত্রী বাবার সঙ্গে ভাব করেছিল জোগাড়ে মেয়ে ইতোয়ারী, কিন্তু জাতে মেলেনি। সমাজের চোখ রাঙানিতে ওকে পেটে রেখেই ইতোয়ারীর বাপ-কাকা বিয়ে দেয় অন্য একজনের সঙ্গে। চারটে ছাগী আর নগদ চল্লিশ টাকায় কেনা স্বামীত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এসে, সে মসলা ছেঁচার লোহায় মাথা ফাটিয়ে পড়ে থাকে। ইতোয়ারীর জেল হয়েছে পাঁচ বছর। ফিরে আর ওরা তাকে ঘরে নেবে না—এই ওর স্বস্তি। ওর মনের মানুষ? সে তো দিনমজুর! কে বা জানে কোথায় চলে গেছে খাটতে! মাথায় ডগডগে সিঁদুর পরা কালো কুচকুচে ছোট্ট রোগা ইতোয়ারী সহজভাবেই বলে 'ভজা তো আছে দিদি, ইয়াকে নিয়ে

থাকব।' হাসলে ওর মুখখানা এমন উজ্জ্বল।

শান্তা তামাঙ্গীকে সবাই বলে সিস্টার। ওকে দেখে আমি প্রথমে ভেবেছিলাম ওর বয়েসে বারো-তেরো বছর। সে কথা শুনে হেসেই অস্থির। দেখাল ওর নিজেরই আছে চার বছর আর তিন বছরের দুটো কাঁচকড়ার পুতুলের মত ফুটফুটে মেয়ে। সেগুলোকে নিয়েই এসেছে দার্জিলিং-এর বস্তি থেকে, তাদের বাবাকে কুক্‌রির কোপ মেরে। স্কুলে পড়ার জন্য সব লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করেছে তিন বছর। হাড়ভাঙা খাটুনিতেও দমেনি। পড়া বন্ধ করে দেবার ক্ষোভটা ছিলই। তারপর নিজে উপার্জন না করে, বাচ্চাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেশা করে এসে, কান্তু বিন্দুকে মারায় রাগটা সামলাতে পারেনি। সাত বছরের মেয়াদ। ওই বন্ধ নরকেও নেপালিদের সহজাত সৌন্দর্যবোধে বাচ্চাগুলোকে ফুলের মত রাখত সিস্টার। আমি ওর মাতৃভাষায় কথা বলতে পারি, সুতরাং ও হয়তো আমার সমর্থক হয়ে উঠবে। শান্তার কাছে ছিল একটা নেল কাটার। এক ওয়ার্ডারের ইচ্ছে সেটা নিয়ে নেবার, শান্তা দেয়নি। চকচকে ছোট যন্ত্রটা দিয়ে মাঝে মাঝেই নখ কেটে দেয় যে খুদেগুলোর। সুতরাং আঙুল বাঁকাতে হল। যে জিনিস দিয়ে নখ কাটা যায়, তা দিয়ে নিশ্চয়ই গলাও কাটা যায়, এই হল ওয়ার্ডারের যুক্তি। মেট্রন চুপ। ওয়ার্ডার চটালে তার চলে না। শান্তার শাড়ি কম্বল সার্চ করে গলাকাটার মত কোনো যন্ত্র পাওয়া গেল না, সুতরাং নিশ্চয়ই লুকিয়ে রেখেছে সেটা সেদিন। শান্তাকে মারবার চেষ্টা করলে ওয়ার্ডের মধ্যে একটা চাপা প্রতিরোধের আঁচ টের পেয়ে, স্থূলাঙ্গিনী নিরামিষাশী বৈষ্ণব ওয়ার্ডার চুপ করে গেল। পরদিন ভোরে অন্য সব ওয়ার্ড খুলবার আগে, ছুরি বের করে না দেবার অপরাধে চার আর তিন বছরের কাঁদতে ভুলে যাওয়া বাচ্চাদের বিস্ফারিত চোখের সামনে তাদের মাকে বিবস্ত্র করে, হাতে শিকল বেঁধে টাঙিয়ে দেওয়া হল একটা সেলের মধ্যে। কিছু করার ছিল না, শুধু দাঁতে দাঁত চেপে দরজায় একটা লাথি মারা আর গরাদের মধ্যে দিয়ে বাচ্চা দুটোকে বুকে চেপে ধরা ছাড়া। সেই থেকে নেলকাটার যন্ত্রটায় বিতৃষ্ণা।

হঠাৎ কী কারণে স্ক্রুগুলো ঈষৎ আলগা।

বন্ধই আছে দরজা, কিন্তু চাপা আঁচটা কম। বারোটা লুডো বোর্ড, ছ প্যাকেট তাস এসেছে ওয়ার্ডে। জায়দাদি দৌড়ে এক ফাঁকে খবরটা দিয়ে গেল। ও আমার সঙ্গে কাকা-ভাইপো পাতিয়েছে। না হলে আমাকে আপনি না বলে তুমি বলতে নাকি ওর লজ্জা করে! মুর্শিদাবাদের শহর অঞ্চল থেকে এসেছে।' উর্দু পড়তে পারে। ভারি শান্ত আর পরিশীলিত কথাবার্তা।

বিশবছরী। পাঁচ বছর কেটেছে, আরও অন্তত ন'বছর বাকি। দুবার তালাক পাবার পর তৃতীয়বার যে লোক ওকে বিয়ে করে, তাকে দা দিয়ে কেটে এসেছে। ওর প্রথমপক্ষের মেয়েকে নষ্ট করার জন্য, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে জায়দাদিকে ঘরে এনেছিল লোকটা। আর জায়দাদি তাকে ভালোবেসেছিল। মেয়েকে বাঁচাতে পারেনি, কিন্তু সেই বিছানা থেকে উঠতে দেয়নি লোকটাকে।

দুপুরবেলা হঠাৎ পুষ্প নেইয়া। মানোয়ারী জাহাজের চলনে এসে একটা লুডো বোর্ড দিয়ে গেল মন্তব্য সহকারে। ওর ধারণা এগুলো আমার কারণে এসেছে।

—আট বছর আমি এয়েচি বাছা, কখনো একটা খোলামকুচি দিতে দেখিনি।

হাসি পেলেও নিলাম। উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী বইয়ের বারো থেকে ত্রিশ পৃষ্ঠা ছিঁড়ে ফেলে দেবার পর থেকে লাইব্রেরির বই, নিজের খবরের কাগজ পাওয়া যাচ্ছে না। দু হাতে লুডো খেলি সারাদিন। ডান হাতে লাল-হলুদ, বাঁ হাতে নীল-সবুজ। প্রায় দুমাস একটানা খেলেছিলাম। জীবনে আর লুডো বোর্ড ছোঁব না কক্ষনো।

অষ্টমী পুজোর দিন হঠাৎ স্পেশাল ট্রিটমেন্ট। ছেলেদের ওয়ার্ড থেকে এসেছে বড় কেটলিভর্তি চা। আমার আধঘন্টা বাইরে থাকার পালা চলছে। ভারি খুশিমনে অনেকে হাজির বারান্দায়। ভাবী খুব হৈ চৈ করে ডাক দিচ্ছে—

এরে বাচ্চার মায়েরা আয় আয়, চা নিয়ে যা।

মুখে দিয়ে সবাই থু থু করে ফেলে দিয়েছে। মুণ্ডুপাত চৌকাবাড়ির। পুড়িয়েছে চা গুলোকে। পোড়া চা খেতে পারে মানুষ! কেউ খেল না। ওরা প্রচুর হাসাহাসি করল, যখন আমি একাই পা মেলে বসে বড় বড় দু'বাটি কফি শেষ করলাম। পুজোর দিনে ভালো খাবারের কি বাহার।

সন্ধ্যার পর আসন করার চেষ্টা করি। গান গাই। আজকাল প্রায়ই সন্ধ্যার পর আলো থাকে না। লোডশেডিং নামটা তখনও শুনিনি। অন্ধকারে মশা মারতে মারতে বুঝতে পারি অর্জুন দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে অদৃশ্য লক্ষ্য নির্ভুল ভেদ করেছিলেন কী করে। বনে-জঙ্গলে থাকতে হয়েছিল যে! আন্দাজে উকুনও মারতে পারি এখন। ভীষণ উকুন হয়েছে মাথায়। চিরুনি নেই। দেওয়ালের এপারে টাকা-পয়সার চল নেই। দু'রকম কারেন্সি চালু। একটু বেশি ক্ষমতা যাদের হাতে, মানে যারা ওয়ার্ডারদের একটু বেশি জিনিসপত্র দিতে পারে তাদের হাতে থাকে বিড়ি। তার ভাগের উঠোন ঝাঁট দেওয়া কাজটা একসপ্তাহ করে দিলে, তার বদলে দশটা বিড়ি, গায়ে মাখবার সাতগ্রাম সর্ষের তেলের বদলে দুটো বিড়ি, এই রকম। গ্রামের দিকে বয়স্কা মহিলাদের

কখনো কখনো বিড়ি খেতে দেখেছি। কিন্তু এখানে মেয়েদের এমনকি কমবয়সী মেয়েদেরও বিড়ি নিয়ে ঝগড়া এমনকি মারামারিও করতে দেখে অবাক হতাম। আরও বিভ্রান্ত, যখন দেখি যে আগুন প্রায় অমিল এবং দু-একজন বৃদ্ধা ছাড়া আর প্রায় কেউ বিড়ি খায় না। খায় না তবে কী করে? ভেঙে তার মসলাটা খায় দোক্তার মত। এদের প্রায় সবাই নেশাটা করেছে ভেতরে আসবার পর। বদ্ধতা এদেরকে শিখিয়েছে চিন্তা-ভাবনাকে অস্বাভাবিক করে তুলতে। নেশার দাসত্বর সাথে সাথে জেলে রাজত্ব করে অদ্ভুত সব কুসংস্কার। ঘর মুছবার সময় কেউ বসে আছে বলে, তার চারদিক দিয়ে ঘুরিয়ে মুছে নিলে মাথা ফাটাফাটি পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। ওরকম ঘেরা দিলে নাকি সে আর ঘেরার ভেতর থেকে বের হতে পারবে না কোনদিন। বাইরে, ঘরে বাইরের হাজার ব্যস্ততায় যারা খাওয়ার সময় পেত না, এখন রুটিন বাঁধা খাটনি খাটবার পর, বিকেল সাড়ে পাঁচটায় রাত্রের খাবার খেয়ে গরাদ বন্ধ হয়ে যাবার পর ভবিষ্যৎহীন অবসন্ন ঘুমটুকুর আগে ঐ বিড়ি ভেঙে তামাকপাতার গুঁড়োটুকু চুন দিয়ে খাওয়া। চুন আসে বাইরে থেকে। বিনিময়? এই নির্বিশেষ বিনিময়ই নিচুতলার কারেন্সি। সপ্তাহে একদিন সকালের জলখাবার যে একমুঠো চিঁড়ে দেওয়া হয়, তাই জমিয়ে এক কৌটো হলে ঠিক দশপয়সা আন্দাজের চুন পাওয়া যায়। সপ্তাহের বরাদ্দ একচিলতে করে মাছের দুটি টুকরোর বিনিময়েও তাই। সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে তাই সব জিনিসই বার্টার হয়— বাড়ি থেকে নিয়ে আসা পূর্বজীবনের একমাত্র চিহ্ন একটি রঙিন ব্লাউজ, বাচ্চার সাপ্তাহিক বরাদ্দ এককাপ চিনি, সারা মাসের কাপড় কাচার সাবানের টুকরোটি। কেন না বন্ধ দেওয়ালের যে চাহিদাও অনেক—তিন বছর পর একদিন একডেলা ছাতুমাখা, কি ছ'টা কাঁচালঙ্কা, পনেরো বছরের মেয়ের জন্য একটি লাল টিপ, মেল ওয়ার্ডে বন্দী স্বামীর জন্য একপাতা খৈনি—আবার তারপর তা পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

মুশকিল যে এই বাজারটা ছায়ার মত। আমার কাছে কোনো ওয়ার্ডার স্বীকার করবে না, কেন না দাম চাইতে পারবে না। সুতারাং থাক চিরুনি।

মহক্কা বেগম কোন কৌশলে দুপুর জোগাড় করে। গরাদের ফাঁক দিয়ে উকুন বাছে। প্রত্যেকটাকে নখে টিপে মুখে 'ইসস্' শব্দ করে—নাহলে নাকি উকুনরা স্বর্গে যাবে না। কে কে স্বর্গে যাবে মহক্কাদি? তুই যাবি? যে তুই নিজের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তার বাপকে কোদালে কুপিয়ে কেটেছিলি? সেই বাপ কি তোর বেহস্তে গিয়েছে, যে সোনাভানকে ধর্ষণ করেছিল পশুর কাম নিয়ে? খেতে ভাতজল নিয়ে যাওয়া বারো বছরের আর্ত আতঙ্কিত

সোনাভান, সে তো শুধু তোর নয়, তারও মেয়ে।

ডাক্তার তাঁর দৈনন্দিন রাউন্ড সমাধা করে লাল ওষুধ আর সাদা ওষুধের শিশি ভরে দিয়ে চলে গেছেন। সেলের দরজাটায় হেলান দিয়ে বসে আছি পাঁচিলের মাথা পেরোন অশত্থ গাছটার দিকে চেয়ে। চৈত্রের তীক্ষ্ণ রোদ ঝলসে উঠেছে তার পাতায় পাতায়। ওয়ার্ডের দিকে একটা গোলমাল, সম্মিলিত কণ্ঠের চেঁচামিচি, পায়ের শব্দ। আমি উঠে দাঁড়াবার আগেই সেলের দরজায় ভিড়, সবাই একসঙ্গে তাড়াহুড়ো করে কী যে বলছে! 'বরদা-মা' 'রক্ত-ও দিদি', উত্তেজিত পুষ্প নেইয়ার সাথে বিমলাভাবী ওয়ার্ডারকে বকতে বকতে আসছে।

চাবির শব্দে দরজা খুলে গেল। পুষ্প নেইয়া ওয়ার্ডারকে ধমকাচ্ছে, ডাক্তারবাবুকে ডাকতে পাটিয়েচো! জাননি তিনি এসতে দুঘন্টা? নোক মরবে নাকি ত্যাতক্ষণ! হ্যাঁ, হ্যাঁ এই মেয়ের জামিন আমি হচ্ছি—অসুখ নোক দেখতে বেইরে, যদি ডানা মেলে পালায়, আমাকে ভরে দিও সেলে—তোমার সায়েব জেলারকে বলে দিও।

মস্ত লম্বা বারান্দা পেরিয়ে সবাই মিলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে হাত ধরে। অনেক দিন হাঁটাচলা না করে জোরে হাঁটতে পারি না, সেকথা ভুলে গেছি। বারান্দার অপর প্রান্তে মেঝেতে পড়ে আছে এক বৃদ্ধার দীর্ঘ শরীর। নাক থেকে রক্ত গড়িয়ে মোটা ধারায় বয়ে যাচ্ছে ধোয়া পরিষ্কার নালা বেয়ে। হাত দেখি, চিত করে দিই, জল দিই মুখে মাথায়। কিন্তু রক্ত গড়িয়েই চলে। কিছু বুঝতে পারি না, অসহায় লাগে ভেতরে ভেতরে। না কোথাও পড়ে যায়নি বরদা-মা। সকাল থেকে বসেই তো ছিল। সকালের খিচুড়িও খায়নি মাথাব্যথা করছিল বলে। ওর ভাগের উঠোন বাগান ঝাঁট আজ কমলামাসি দিয়েছে। কখন থেকে মাথাব্যথা? তা তো কেউ জানে না। ও তো এমনিই চুপচাপ থাকে। বরদার কিন্তু জ্ঞান আছে, হাতের ইশারায় আমায় বলে পাশ ফিরিয়ে দিতে। থুতু ফেলে, দলা পাকানো রক্ত। আমার কোল কাপড় ভিজে যেতে থাকে। পাঁচবছর জেলে থাকার পরও এত রক্ত ছিল এই বুড়ো শরীরটায়! এতোজন যে মুখের দিকে চেয়ে আছে, আমি কী করি! যদিও বরদা আমার হাতটা ধরে রেখেছে, তবু একমাত্র ওরই মুখে কোন উদ্বেগ নেই। ডাক্তার এসে পড়ার পরও হাত ধরেই থাকে বরদা। আমি জানতাম না হাইব্লাডপ্রেসারের রক্ত কখনও কখনও ওরকমভাবে নাক মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে রোগীকে বাঁচিয়ে দেয়। ডাক্তার সেই কথাই বলেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কী একটু ভেবে বলেন—

আপনার অসুবিধা না হলে আজ দুপুরটা হস্‌পিটাল ওয়ার্ডে থাকুন। বরদাকে লিকুইড ফিড দেবেন আর দেখবেন যেন না ওঠে।

অত্যন্ত ম্যাটার অব ফ্যাক্ট গলা। কিন্তু বুঝি। কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে যায়। স্মরণীয় ভালো কাটে সেদিন দুপুরটা। হাসপাতালে বরদা, মেট বিমলা ভাবী ছাড়াও প্রায় দশজন মেয়ে থাকে। বাকি সবাই দুপুরে বিশ্রামের সময়টুকু বন্ধ দরজার সামনে বসে অবাধে গল্প করে। বারোজনের ভাত একটা থালায় এক সঙ্গে মাখি। শান্তা ওর বহুদিনের জমিয়ে রাখা একটু সর্ষের তেল নিয়ে আসে। শ্রেষ্ঠ মায়োনীজের চেয়েও অনেক সুস্বাদ সেই তেল দিয়ে ভাত মেখে, জেলের ঘরের মধ্যে দারুণ আনন্দের পিকনিক হয়। ওরা সবাই জেলে এসেছে আমারও আনেক আগে, সুতরাং মাত্র দুবছরের পুরনো বাইরের গল্প তো তখনও টাটকাই! শুনতে শুনতে, একে একে সবাই ঘুরে আসে নিজেদের কতোরকম স্মৃতির মধ্যে দিয়ে। আড়াই ঘন্টার দুপুরের প্রতিটি মুহূর্তকে আমরা নিংড়ে নিই, আস্বাদ করি। তিনটের সময় চলে আসবার আগে, দেখি বরদা চোখ খুলে তাকিয়েছে। একটু হাসে আর এবার ও-ই আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। সব হাসি গল্পে কান ভরে এনেও সন্ধ্যাবেলা সেলে বসে কেবলি মনে হয় বরদাবুড়ির যে মাথার সব চুলই সাদা! পাঁচ-সাতটি দাঁত আর বাকি! ও কেন এখানে? বন্দীদের কি কোন রিটায়ারমেন্ট এজ নেই? ও কি এখান থেকে বেরোবে?

একই কথা ফুলমালা বলে কয়েকদিন পরে।

উমরার হাড়গিলান এইঠেই থাকিবার দিদি, এইঠেই থাকিবার। উমরার ঘরত ত ছোয়া আছে। ছোয়ার বউ আছে। কিন্তু ক্যানং নিগাবে? এই বুড়িখান কি আরো আট কি নয় বছর বাঁচি থাকিবার পারে? এই মরণ ফাঁদের ঘরটাত্‌? বাঁচি থাকিবার পারে?

কোচবিহার, যেখান থেকে এসেছে ফুলমালাও, সেই ছোট জেলে দেখা করতে এসে নাকি হাপুসে কাঁদত বরদা মায়ের ছেলে আর বৌ। ফুলমালাই বলে, উপজাতীয় বৃদ্ধাটির ছেলের বৌয়ের ঘরে জোর করে ঢোকা মহাজনকে ছেলে হঠাৎ কেটে দুখানা করে ফেললে, কি দ্রুততায় সে ছেলেকে সেই রাত্রেই শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে, নিজের হাতে লোকটার দেহ টেনে নিয়ে খেতে ফেলে দিয়ে আসে। পুলিসের হাতে পড়ে চালান যাবার আগে কি স্থির যুক্তিমত্তায় ছেলের বৌকে বোঝায়, যে সে জেলে গেলে তো সংসারে আর সবাই থাকবে। কিন্তু সমর্থ খাটিয়ে ছেলে গেলে, ঘরসুদ্ধ না খেয়ে মরবে আক্ষরিক অর্থেই। একগুঁয়ে জেদে সব এজাহারে খুনের সমস্ত দায় নিজের

ওপর টেনে নেয় সগর্বে। কিছু সন্দেহ থাকলেও বরদাবুড়ির বলিচিহ্নিত গ্রাম্যমুখের সঙ্গে ম্যাডোনার কোন মিল দেখতে পান না বিচারক এবং ইচ্ছাকৃত খুনের অভিযোগে প্রায় ষাট বছর বয়স্ক ইলিটারেট হিন্দু ফিমেল বরদাদাসীর বিশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

শিবরাত্রির উপোসের ডায়েট আসবে। কজন উপোস করবে তার লিস্ট নিচ্ছে মেট্রন। কয়লামুখি এসে আমাকে ধরেছে, দিদি, তুমি যদি শিবরাত্রির উপোস করবে বলে বল তবে আমরাও ছজন হই।

ছজন পিছু একটা করে গোটা নারকেল পাওয়া যায়। এ ছাড়া মাথাপিছু একচামচ চিনি, দুমুঠো সাবু, কড়ে আঙুলের মাপের একটা কলা।

মেট্রনের বিশ্বাস হয়নি। পোশাক খস্‌খস করে সেলের সামনে এলেন, যারা উপোস করবে তাদের খাবার আসবে না কিন্তু।

ওঃ তবে তো নিশ্চয়ই ছটফটিয়ে মরে থাকর্ব আমরা! যারা এত কাণ্ড করে একটা আস্ত নারকেল আদায় করবে তারা যেন সেটা কাউকে না দিয়ে একা খাবে আর তাদের নামে খাবার না এলে অন্যরা যেন তাদের একমুঠো ভাত বা একটা রুটির ভাগ দেবে না।

তবে হ্যাঁ, এটা মানতেই হবে—মানুষের পেটে দেবার মত খাবার, শরীর ঢাকবার পোশাক পাওয়া যাক বা না যাক, ধর্মানুষ্ঠানে ভারি সাহায্য করেন সদাশয় সরকার। সাধুসন্ন্যাসীর প্রতি অচলা ভক্তিও আছে সর্বদাই। সন্ন্যাস গ্রহণকরা আত্মীয়ের চিঠি রুপোর থালায় করে দুহাতে বয়ে আনেন সুপারিন্টেডেন্ট স্বয়ং। ফর্সা কপালে সবসময়ে ছাইয়ের টিপ পরে থাকেন ইনি। সাধুটিকে কিন্তু বিদেয় করেছেন অফিসঘর থেকেই, অসুস্থ কন্যাসমাকে যিনি দেখতে এসেছিলেন।

বহরমপুর জেলে আন্ডারট্রায়াল মেয়েরা সাধারণত থাকে না, বা থাকলেও তাদের সংখ্যা খুব কম। সারা পশ্চিমবাংলার সমস্ত জেল থেকে 'লাইফার' কিংবা লম্বা সাজা পাওয়া মেয়েবন্দীদের এনে রাখবার জন্যই বহরমপুর জেলের ফিমেল ওয়ার্ড তৈরি হয়েছে। অনেকখানি ছড়ানো জায়গা, বড় বড় গাছ, কড়া শৃংখলা, পরিচ্ছন্ন নিষ্প্রাণতায় উল্লেখযোগ্য। এই পাঁচিলের এপারে সময়ের বহমানতার কোন অস্তিত্ব নেই, সময় এখানে স্থির। যখন কোন বন্দিনী অন্য জেল থেকে সাজা নিয়ে আসে, প্রথম কিছুদিন জীবিত প্রাণীর ছটফটানি, দম বন্ধ হয়ে আসা, তাকে পাগল করে তোলে। চোদ্দ বছর! মাস দিয়ে, সপ্তাহ দিয়ে, দিন দিয়ে গুনে সে কিছুতেই কোনো কূল দেখতে পায় না—। তারপর ধীরে ধীরে মৃত মানুষের মত, পোষমানা জন্তুর মত

ঝিমিয়ে আসে অস্থিরতা। মানুষের পৃথিবীতে, মানুষের সমাজে যা সবচেয়ে স্বাভাবিক সেই আশা আর উদ্যম এই দুটো জিনিসই সবচেয়ে অনিয়ম আর অপ্রয়োজনীয় এখানে। প্রতিটা দিনই ঘন্টা মিলিয়ে আগের দিনের মত। কোনো ভবিষ্যৎ নেই, বর্তমানও না , কোন ঋতুচক্র নেই, না আছে কোনো সুখদুঃখ ভালোমন্দের ব্যতিক্রমী তরঙ্গ। যে মানবগোষ্ঠী এখানে সম্পূর্ণ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে খায় শোয় কাজ করে তারা প্রত্যেকে বাস করে একটিমাত্র কালের মধ্যে— অতীত কালে, এবং সে অতীতযাপনে প্রত্যেকেই অতি ব্যক্তিগত। বিশবছরীরা একবার ফাঁদে পড়া জন্তুর মত অস্থির হয় হাইকোর্ট সুপ্রিমকোর্ট থেকে আপিলের রায় আসবার আগে পর্যন্ত। আর তারা দুঃসহতম টেনশানের মধ্যে দিন কাটায় যখন ছাড়া পাবার সময় এগিয়ে আসে। ছাড়া পাবার একবছর আগে থেকে প্রত্যেক লাইফারের ঘুম কমে যায়, চেহারায় উদ্‌ভ্রান্তির ছাপ পড়ে। অন্তত মেয়েদের, যারা আবার নতুন করে জীবিত ভাবে মনে করতে থাকে নিজেদের ফেলে আসা জীবন সংসার সন্তান পরিজনের কথা, যে সব কথা ভুলে তাদের মন হিমঘরে জমে ছিল রক্তচলাচলহীন অসাড়তায়।

সকাল বিকেলে দুঘন্টা করে খোলা থাকার হুকুম হয়েছে। ক্রমাগত মাথায় একটা ভোঁতা যন্ত্রণা আর বমি। ডাক্তারবাবুর ভ্রূ নিরুপায় বিরক্তিতে কুঁচকে যাচ্ছিল। এরকম একটানা বন্ধ থাকলে নাকি এ অবশ্যম্ভাবী। প্রায় শুয়ে পড়েছি। কোনো খাবার গলার নিচে নামানো যায় না, মাথা তোলা যাচ্ছে না কম্বল থেকে। নির্মলা ভাবী একদিন বিকেল উদ্বিগ্ন মুখে খানিকটা বকে গেল।

—আপনি কী করেন। ডাগদরবাবু আপনাকে খাট বিছানা দিতেছিলেন, আপনি ফিরালেন কেন?

—ভাবী সবাই তো মাটিতেই শোয়, আমারও তাই ভালো লাগে।

—আপনার পিঠে দরদ আছে, ডাগদরবাবু বোলেছিলেন। আচ্ছা খাট নিবেন না—হর হপ্তা সাহেব জেলর যে আপনাকে সুধান অসুবিধা আছে কি না, তখন বোলেন না কেন দরজা খুলে দিতে?

—কেন বলব ভাবী? ওরা শুধোয় কেন? ওরা কি জানে না বন্ধ করে রাখলে মানুষের কষ্ট হয়? আমি চাইব কেন?

—আর লাইব্রেরির বইগুলি না পেলে যে বকেন তখন জেলরকে।

ভাবীকে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। হাসলে আবার রেগে যায়। ডাক্তার কিছু বলছেন বোধহয় সুপারিনটেন্ডেন্টকে। অসময়ে সারা ওয়ার্ডে ছুটোছুটি।

জেলার এলেন।

—আপনার কোনো অসুবিধা হচ্ছে?

—আপনার কি ধারণা কোনো মানুষকে তার সুবিধার জন্য চব্বিশ ঘন্টা একটা গর্তে বন্ধ করে রাখা হয়?

—আপনাকে যদি খানিকক্ষণ করে খুলে দেওয়া হয় আপনি পালাবার চেষ্টা করবেন না?

—নিশ্চয়ই করব। আমার সাধ্যমতই করব। আপনারা তো সে কাজে বাধা দেবার জন্যই অনেক সেপাই পোষেন।

সুতরাং ওই—দুবেলা একঘন্টা করে...

প্রথম প্রথম হাঁটতে পারি না, কিন্তু বাগানে নেমে মাটিতে ঘাসে বসে থাকতে তো পারি। জায়দাদি পাশে এসে বসে।

—ভাইপো, আমার ডিউটি পড়েছে তোমাকে পাহারা দিতে।

—কেন কাকা, ওয়ার্ডারের ঘাটতি হয়েছে নাকি?

—নাগো। ওদের নাকি তুমি মারবে, কিন্তুক আমাদের বিপদ হয় এমন তো কিছু করবে না, তাই আমার আর আনন্দদির ডিউটি তোমাকে পাহারা দেওয়া। নিজের পর ঘিন্না হয়ে গেল ভাইপো।

—কেন ভালোই তো হয়েছে, তোমাদের সাথে গল্প করব বসে। আনন্দ কই?

—কানতেছে।

আনন্দকে ডেকে পাঠাই।

খানিকটা পর আনন্দ আসে। ওর মুখখানা বড় সুন্দর। কোমল। গোল চিবুক, ভারী অধর, চোখের পাতাও ভারী। গ্রামের সম্পন্ন কৃষক পরিবারের জ্যেষ্ঠতম এবং দরিদ্র বাবার মেয়ে আনন্দ। স্বামী রেখে গিয়েছিল বাপের বাড়িতে। তারপর সে বিয়ে করেছে, স্ত্রীপুত্র নিয়ে ভালো আছে। আনন্দ কাকাদের বাড়িতে গতরে খেটে খাবার দাম শোধ করছিল কিন্তু থাকার দাম শোধ করতে হল তাদেরই একজনের বিছানায়। কলেজ পাস করে আসা সেই কাকা চুপিচুপি আশ্বাস দিয়েছিল ওকে নিয়ে শহরে চলে যাবে। বিয়ে করবে ওকে। শহরে নাকি এরকম অনেক হয়। শহরে একটা বাড়িভাড়া পেলেই নিয়ে যাবে। শহরে সে গেল অবশ্য, বিয়ে করতে। আনন্দর সামনেই নতুন বউ বেলা করে ঢুলুঢুলু চোখে বেরোত ঘর থেকে, তাকে দেখলে থুতু ফেলত। অন্য কাকিমাদের কুৎসিত পোড়ানো কথার লাঞ্ছনা সয়ে আনন্দ উঠোন নিকোয়, গোবর পরিষ্কার করে, নতুন কাকিমার বিছানার চাদর কাচে।

আর তারপর রক্তে কোনো বিষ কুটিল হয়ে উঠলে একদিন ছাদের কিনার থেকে নিচে ঠেলে দেয় তাকে।

ও অপরাধ অস্বীকার করেনি, তবু থানায় পুলিশরা পাকানো দড়ি দিয়ে খুব মেরেছিল আনন্দকে। ঠাণ্ডামাথায় খুন করার দায়ে সাজা খাটছে বিশবছরী আনন্দ দাসী। ছবছর জেলে কাটাবার পর এখন ওর বয়স সাতাশ।

আস্তে আস্তে একটু একটু হাঁটতে পারছি। বিমলাভাবী কোন সেপাইকে দিয়ে কি করে জেলের বড় চৌকা থেকে একমুঠি ধনে আনিয়ে বাগানে ছিটিয়েছিল। ছোট ছোট গাছগুলির স্মৃতিময় গন্ধে হঠাৎ কেমন ছায়ার মত বাইরের সমস্ত জগৎ জীবন এক ঝাঁকিতে দেখা দিয়ে যায়। বিমলাভাবী সত্যি অসাধ্যসাধন করতে পারে। জেলার সুপারও ওর কথার গুরুত্ব দেন। এমন ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা, কণ্ঠস্বর, বাকভঙ্গি—যেন আদেশ করা, পরিচালনা করার জন্যই তৈরি হয়েছে।

অথচ চব্বিশ বছরের যে মেয়েটিকে একটি বাচ্চাসুদ্ধ তার স্বামী উত্তর প্রদেশের গ্রাম থেকে হাওড়ায় নিজের কাজের জায়গায় নিয়ে এসে, শহরের ধরনে সংসার বাঁধতে চেয়েছিল, সে আর পাঁচটা গ্রাম্য মেয়ের মত লাজুক আর ভীরুই ছিল। ঘোমটা কপাল পর্যন্ত তোলার বেহায়াপনায় রাজি না হলে, শেষে চটকলের শ্রমিক সেই যুবক তার স্ত্রীকে ভয় দেখায়, যে হাওড়া স্টেশনে প্রায়ই ভিড়ে লোকেদের বৌ বদল হয়ে যায়। ঘোমটা ছোট করে দিনের বেলা স্বামীর মুখের দিকে না দেখে নিলে অন্য কেউ নিয়ে গেলে জানতে পারবে কী করে ! হাওড়ায় ভাড়াটে বাড়ির ঘরে ঘরে এজমালি জলের কল নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি শেষে মারামারিতে পৌঁছয়। এক ঘা লাঠি ভিড়ের মধ্যে বিমলার কপালে লেগে রক্ত পড়লে, উত্তরপ্রদেশী প্রেম ও ক্রোধ মুহূর্তে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন হয়ে ওঠে। দরজার খিলের ঘায়ে আঘাতকারীর মাথা দুফাঁক হয়ে যায়, তার ভাইয়েরও। এইবার সেই শ্রমিক রক্ত দেখে এবং চড়াও হয়ে আসা লোকজনের 'খুন-খুন' ধ্বনিতে আতংকিত হয়ে দিশাহারা ভয়ে ছুরি হাতে করে বৌ-বাচ্চাকে আগলে, রাস্তা দিয়ে ছোটে। 'সামনে এলে মেরে দেব' বলে দুজনকে মেরেও দেয়। গোলমাল শুনে পাশের বস্তি থেকে তার খুড়তুতো ভাই ছুটে এসে ভাবীর পাশে দাঁড়ালে, সে বৌয়ের হাতে ছুরিটা দিয়ে গলির পাঁচিল টপকে পাশের মাঠে লাফিয়ে পড়ে পালায়। বিচারে তিনজনেরই ফাঁসির হুকুম হয়। তারপর রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো মার্সি পিটিশানের ভয়ংকর করুণায় বিমলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মঞ্জুর হয়, তার স্বামী ও দেওরের ফাঁসি। দমদম জেলের ফাঁসি সেলের দণ্ডিতদের সঙ্গে

দেখা করে ফেরার একসপ্তাহ পরে, বিমলা চালান হয়ে আসে বহরমপুর জেলে। প্রায় দুবছর কারো সাথে কথা বলেনি।

কী কথা বলব ! আগে দিন হামকে দেখা করিয়ে দিল দু'টা জোয়ান লোক সাথে, আর পিছে দিন কাঁচকলা আর আরওয়াচাল দিয়ে বলছে কি, হবিসি করো তুমি বেওয়া হয়েছ। তো তখন আমি ওদের কথা মানি না। এ হাতে চারটে সোনা চুড়ি ছিল—কে ওয়ার্ডর খুলে নিল, নিক্—আমি তো তারই সাথে কথা বলি হাসি কতকিছু। তো হামকে বলে কি যে পাগল হয়েছে। পাগল কেন হবো ?

তবু জীবন বয়ে যায়, জেলের পাঁচিলেও সত্যি বাঁধা থাকে না। তেরো বছর চলে গেছে, এখন ভাবী বাংলা পড়তে পারে, অদ্ভুত হিন্দির টানে বাংলা বলে, হাসে। নতুন ওয়ার্ডারদেরও আইন শেখায়। আর চোস্ত বাংলায় অশ্রাব্য গালি দিতে পারে। লকআপ বন্ধ হয়ে যাবার পর যদি আম বা লিচু গাছের একটি ফলে, কোনো ওয়ার্ডার বা সেপাইয়ের হাতে পড়ে, তাহলে ভাবীর এই ক্ষমতাটার পুরো পরীক্ষা হয়। এখন হেসে হেসেই আমায় বলে,

আপনাকে দিদি বলি তো কী হয়েছে, আমার পুতুল যদি বাঁচত আপনার চেয়ে বড়ো হত।

দুই নম্বরের মধ্যে আসা-যাওয়ার সুবিধার জন্য বারান্দার দেওয়ালের মধ্যেও দরজা ফোটানো হচ্ছে।

সপ্তাহখানেক ধরে আবার হাসপাতালে ভর্তি রয়েছি বলে দেখতে পেলাম সেই অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্যটা। শাবল কোদাল কড়াই নিয়ে ওয়ার্ডের বাগান দিয়ে আসছে তিনজন খাটিয়ে মজুর। এরা বন্দী নয়, বাইরের মিস্ত্রি। বাইরের অনিয়মিত সাধারণ লুঙ্গি-কুর্তা পরা। পেছন পেছন একজন জমাদার অবশ্যই। ওরা কাজ করছে দেখছি আর খুব মনে পড়ছে সেইসব মানুষদের কথা যাদের কথা ভাবতে চাই না, যারা সারাদিন খাটনির শেষে কোনদিন বাজার সওদার ডাল-আটা নিয়ে আর কোনদিন বা খালিহাতে ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ফিরত, উঠোনে বসে গল্প হত পাঁচজনে। রাত্রে ঘুমের মধ্যেও যারা সতর্ক থাকত যদি দূরে বড় রাস্তার মোড়ে শেষরাত্রে কোনো চাকার শব্দ কি বুটের শব্দ ওঠে।

এই যারা আজ কাজ করতে এসেছে তারা সেইসব ভালোমানুষদেরই তিনজন আর যারা বন্ধ হয়ে আছে, ঘোমটা দিয়ে সরে গেছে অস্বাভাবিক ভাবে তারাও সেই দলেরই। গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষজন। স্বাভাবিক পরিবেশে দেখা হলে এরা পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করত। দু মুঠো মুড়ি

আর তারপর রক্তে কোনো বিষ কুটিল হয়ে উঠলে একদিন ছাদের কিনার থেকে নিচে ঠেলে দেয় তাকে।

ও অপরাধ অস্বীকার করেনি, তবু থানায় পুলিশরা পাকানো দড়ি দিয়ে খুব মেরেছিল আনন্দকে। ঠাণ্ডামাথায় খুন করার দায়ে সাজা খাটছে বিশবছরী আনন্দ দাসী। ছবছর জেলে কাটাবার পর এখন ওর বয়স সাতাশ।

আস্তে আস্তে একটু একটু হাঁটতে পারছি। বিমলাভাবী কোন সেপাইকে দিয়ে কি করে জেলের বড় চৌকা থেকে একমুঠি ধনে আনিয়ে বাগানে ছিটিয়েছিল। ছোট ছোট গাছগুলির স্মৃতিময় গন্ধে হঠাৎ কেমন ছায়ার মত বাইরের সমস্ত জগৎ জীবন এক ঝাঁকিতে দেখা দিয়ে যায়। বিমলাভাবী সত্যি অসাধ্যসাধন করতে পারে। জেলার সুপারও ওর কথার গুরুত্ব দেন। এমন ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা, কণ্ঠস্বর, বাকভঙ্গি—যেন আদেশ করা, পরিচালনা করার জন্যই তৈরি হয়েছে।

অথচ চব্বিশ বছরের যে মেয়েটিকে একটি বাচ্চাসুদ্ধ তার স্বামী উত্তর প্রদেশের গ্রাম থেকে হাওড়ায় নিজের কাজের জায়গায় নিয়ে এসে, শহরের ধরনে সংসার বাঁধতে চেয়েছিল, সে আর পাঁচটা গ্রাম্য মেয়ের মত লাজুক আর ভীরুই ছিল। ঘোমটা কপাল পর্যন্ত তোলার বেহায়াপনায় রাজি না হলে, শেষে চটকলের শ্রমিক সেই যুবক তার স্ত্রীকে ভয় দেখায়, যে হাওড়া স্টেশনে প্রায়ই ভিড়ে লোকেদের বৌ বদল হয়ে যায়। ঘোমটা ছোট করে দিনের বেলা স্বামীর মুখের দিকে না দেখে নিলে অন্য কেউ নিয়ে গেলে জানতে পারবে কী করে। হাওড়ায় ভাড়াটে বাড়ির ঘরে ঘরে এজমালি জলের কল নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি শেষে মারামারিতে পৌঁছয়। এক ঘা লাঠি ভিড়ের মধ্যে বিমলার কপালে লেগে রক্ত পড়লে, উত্তরপ্রদেশী প্রেম ও ক্রোধ মুহূর্তে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন হয়ে ওঠে। দরজার খিলের ঘায়ে আঘাতকারীর মাথা দুফাঁক হয়ে যায়, তার ভাইয়েরও। এইবার সেই শ্রমিক রক্ত দেখে এবং চড়াও হয়ে আসা লোকজনের 'খুন-খুন' ধ্বনিতে আতংকিত হয়ে দিশাহারা ভয়ে ছুরি হাতে করে বৌ-বাচ্চাকে আগলে, রাস্তা দিয়ে ছোটে। 'সামনে এলে মেরে দেব' বলে দুজনকে মেরেও দেয়। গোলমাল শুনে পাশের বস্তি থেকে তার খুড়তুতো ভাই ছুটে এসে ভাবীর পাশে দাঁড়ালে, সে বৌয়ের হাতে ছুরিটা দিয়ে গলির পাঁচিল টপকে পাশের মাঠে লাফিয়ে পড়ে পালায়। বিচারে তিনজনেরই ফাঁসির হুকুম হয়। তারপর রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো মার্সি পিটিশানের ভয়ংকর করুণায় বিমলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মঞ্জুর হয়, তার স্বামী ও দেওরের ফাঁসি। দমদম জেলের ফাঁসি সেলের দণ্ডিতদের সঙ্গে

দেখা করে ফেরার একসপ্তাহ পরে, বিমলা চালান হয়ে আসে বহরমপুর জেলে। প্রায় দুবছর কারো সাথে কথা বলেনি।

কী কথা বলব ! আগে দিন হামকে দেখা করিয়ে দিল দু'টা জোয়ান লোক সাথে, আর পিছে দিন কাঁচকলা আর আরওয়াচাল দিয়ে বলছে কি, হবিসি করো তুমি বেওয়া হয়েছ। তো তখন আমি ওদের কথা মানি না। এ হাতে চারটে সোনা চুড়ি ছিল—কে ওয়ার্ডর খুলে নিল, নিক্—আমি তো তারই সাথে কথা বলি হাসি কতকিছু। তো হামকে বলে কি যে পাগল হয়েছে। পাগল কেন হবো ?

তবু জীবন বয়ে যায়, জেলের পাঁচিলেও সত্যি বাঁধা থাকে না। তেরো বছর চলে গেছে, এখন ভাবী বাংলা পড়তে পারে, অদ্ভুত হিন্দির টানে বাংলা বলে, হাসে। নতুন ওয়ার্ডারদেরও আইন শেখায়। আর চোস্ত বাংলায় অশ্রাব্য গালি দিতে পারে। লকআপ বন্ধ হয়ে যাবার পর যদি আম বা লিচু গাছের একটি ফলে, কোনো ওয়ার্ডার বা সেপাইয়ের হাতে পড়ে, তাহলে ভাবীর এই ক্ষমতাটার পুরো পরীক্ষা হয়। এখন হেসে হেসেই আমায় বলে,

আপনাকে দিদি বলি তো কী হয়েছে, আমার পুতুল যদি বাঁচত আপনার চেয়ে বড়ো হত।

দুই নম্বরের মধ্যে আসা-যাওয়ার সুবিধার জন্য বারান্দার দেওয়ালের মধ্যেও দরজা ফোটানো হচ্ছে।

সপ্তাহখানেক ধরে আবার হাসপাতালে ভর্তি রয়েছি বলে দেখতে পেলাম সেই অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্যটা। শাবল কোদাল কড়াই নিয়ে ওয়ার্ডের বাগান দিয়ে আসছে তিনজন খাটিয়ে মজুর। এরা বন্দী নয়, বাইরের মিস্ত্রি। বাইরের অনিয়মিত সাধারণ লুঙ্গি-কুর্তা পরা। পেছন পেছন একজন জমাদার অবশ্যই। ওরা কাজ করছে দেখছি আর খুব মনে পড়ছে সেইসব মানুষদের কথা যাদের কথা ভাবতে চাই না, যারা সারাদিন খাটনির শেষে কোনদিন বাজার সওদার ডাল-আটা নিয়ে আর কোনদিন বা খালিহাতে ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ফিরত, উঠোনে বসে গল্প হত পাঁচজনে। রাত্রে ঘুমের মধ্যেও যারা সতর্ক থাকত যদি দূরে বড় রাস্তার মোড়ে শেষরাত্রে কোনো চাকার শব্দ কি বুটের শব্দ ওঠে।

এই যারা আজ কাজ করতে এসেছে তারা সেইসব ভালোমানুষদেরই তিনজন আর যারা বন্ধ হয়ে আছে, ঘোমটা দিয়ে সরে গেছে অস্বাভাবিক ভাবে তারাও সেই দলেরই। গ্রাম-গঞ্জের সাধারণ মানুষজন। স্বাভাবিক পরিবেশে দেখা হলে এরা পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করত। দু' মুঠো মুড়ি

ধরে দিত, দুপুরবেলায়, জুটলে দুটি ভাত। ঘেরার পাঁচিল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে দলে থেঁতলে দিয়েছে। জমাদারকে যখন হাসপাতাল থেকে ভাতের থালা এগিয়ে দিচ্ছে আনন্দ, ভারি বিনীতভাবে জিগেস করি,

না খেয়ে কাজ করবে ওরা, আমরা এতগুলো মেয়ে ভাতের থালা নিয়ে বসব ? আমাদের থেকে একটু করে দিলে তো তিনথালা হয়ে যায়, আপনি একটু দিয়ে দেবেন ওদের ?

নিজের থালাটা সামনে রেখে কী করে আর আপত্তি করে জমাদার। মেয়েরা খুব খুশি একটা কাজ অন্তত বাড়ির মত করতে পেরে। এসব ভাবনার সাহসও তো কেড়ে নিয়েছে জেলখানা। বাচ্চার মায়েরা বাদ, বাকি বেশির ভাগ যা দিল তা শেষ করা তিনজনের পক্ষে বোধহয় দুষ্কর।

জমাদারের গোঁফে তা দেবার ভাবটা এমন যেন খাবারের ব্যবস্থাটা সেই করেছে তার কাছারিবাড়ি থেকে।

সকালবেলার একঘন্টা বরাদ্দ। বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। টিচাররা এসেছেন বাচ্চাদের পড়াতে। বন্দিনী মায়েদের সঙ্গে এসেছে এরা, কেউ বা জেলেই জন্মেছে। শুনেছি কোনো কোনো সভ্যদেশ নাকি সন্তানসম্ভবা মাকে কারাদণ্ড দেয় না ! এই বাচ্চারা বেড়াল দেখেছে, কিন্তু কুকুর দেখেনি কখনও। সখী খাতুনের তিন বছরের সাজা শেষ হয়ে বাড়ি যাবার দিন সাতেক আগে, বছর তিনেকের ছেলের পিঠে এক বিরাশি সিক্কার চড় সন্ধেবেলায়। কী হয়েছে সখি ? কেন মারছিস ? সখি ভ্যাঁ করে কেদে ফেলে, দেখ দিদি কি অলক্ষণ কথা বলে। ছেলে শুধাচ্ছে—

মা ওয়ার্ডার না গেলে, ঘরে আমাদের কে লকাপ কইরবে ?

টিচার দুটি মানুষ ভালো। বড় দিদিমণি ফর্সা, রোগা, রক্তহীন চেহারা, কোনোদিন আমার সাথে কথা বলার কোনো ঝুঁকিই নিতে চান না। কিন্তু কোনোদিন চোখে চোখ পড়ে গেলে বিরূপতা দেখিনি। ছোটজন শান্তিদি বেশ সপ্রাণ স্বভাবের মহিলা। কখনো-সখনো সেলের সামনে দাঁড়িয়ে একটু গল্প করে গেলে বুঝতে পারি শাসনযন্ত্র একটু ঢিলে। এমনকি এক-আধবার নিজের 'দেশ' পত্রিকাটাও পড়তে দেন। ওঁরা সকালে একবার বাচ্চাদের পড়িয়ে চলে যান, আবার দুটোর সময় আসেন। বাচ্চারা কতোদূর কী শিখতে পারে জানি না, কিন্তু তাদের সম্মিলিত কণ্ঠের গড়গড় করে 'সত্য কথা বলব, সত্য পথে চলব, দলের হয়ে নড়ব জয়হিন্দ মাসিমা নম—সকার' শুনলে বুঝতে পারি তিনটে বাজল। মোটের ওপর দুই মহিলাই কিন্তু বাচ্চাদের ভালোবাসেন।

মহক্কাদির বয়স কত হবে কে জানে ! চল্লিশের বেশি নয়। বড়ছেলে আছে এই জেলেই। বাকি চার ছেলেমেয়ে এখানে ওর সঙ্গে এসেছে। বাবার ধর্ষিত সোনাভানের বয়স এখন হবে তেরো-চোদ্দ। সেই বালিকা সেফ কাস্টডিতে আছে যাবজ্জীবন দণ্ডিত বন্দিনীদের সঙ্গে। বাকি তিন বাচ্চার থাকবার কোনো জায়গা নেই বাইরে, তাই তারা থাকে মায়ের কাছে। এই একটি মাত্র ক্ষেত্রে বহরমপুর জেলের আইন একটু উদাসীন। সাজা হয়ে মা যখন আসে তখন হয়ত বাচ্চাদের বয়স দুবছর কি তিন বছর কি দশমাস ছিল। আসামীকে জেলে পাঠিয়ে দেবার পর আদালত তার কথা 'বিস্মরণ হয়ে যান' যদি না মৌচাকে কেউ খোঁচা দেয়। সুতরাং ওই কুয়োটির ভিতরে বসবাস করতে করতে সে বাচ্চার বয়স যে সাত দশ বারো হয়ে গেল একথাও কারো তেমন খেয়াল হয় না, অন্তত যদি সে বাচ্চা ছেলে না হয়। কিন্তু একসপ্তাহের মধ্যে ব্যবস্থা করে মায়ের কাছ থেকে কেড়ে সেই বাচ্চাকে সরকারি উদ্ধারাশ্রমের নরকে পাঠিয়ে দিতে পারে মেট্রন বা যে কোনো ওয়ার্ডার শুধু একবার অফিসে এই কথাটি পৌঁছে দিয়ে যে বাচ্চার বয়স ছ'বছরের বেশি হয়ে গিয়েছে। এবং সেইসব বাচ্চাকে আর কোথাও পাঠানো হয় না, কোন ভালোবাসার, সুস্থতার পরিবেশে। কোথাও নয়, একমাত্র সরকারি উদ্ধারাশ্রম ছাড়া। জেলের মধ্যে ওই একটিমাত্র অবলম্বনে একটি মেয়ে তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে—তার বাচ্চা ঘিরে। কোনো মানসিক সংশোধনের জন্য এইসব 'সংশোধনাগার' থেকে মানবিক সমস্ত অবলম্বন ছিঁড়ে নেওয়া হয়। একথা নিশ্চয়ই আইনপ্রণেতারা জানেন। মাথার ওপর এই 'লিলুয়া নিয়ে যাবে'র খাঁড়া ঝুলতে থাকায় মেট্রন, ওয়ার্ডার, সিপাহি, মেট, পাহারা সকলের পায়ের নিচে পাপোষের মত হয়ে থাকে মহক্কাদি, তিনবাচ্চা নিয়ে আসা বিশবছরী মাজেদা খাতুন, দুই বাচ্চার মা সখী, দুই বাচ্চার মা চন্দনী আরও বাকি যত বাচ্চার মায়েরা।

অপরিচয় কি মানুষকে উদাসীন করে দেয় ? কতটা ? যে উদাসীনতা প্রায় নিষ্ঠুরতার কাছাকাছি ?

পারবতিয়া বলে একজন মাঝবয়সী বুড়ি এসেছে তিন বছরের সাজা নিয়ে। কে জানে কেন ! ওর কথা স্পষ্ট করে কিছুই বোঝা যায় না। একেবারে দেহাতি হিন্দি বেরোয় এবড়ো-খেবড়ো ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে। কাছে গিয়ে যে সব কথা বুঝবার চেষ্টাও করে না কেউ কেন না চিরকুটি নোংরা ওর পোশাক আশাক। গুদামে শাড়ি নেই বলে ও নিজের জামাকাপড়ই পরে আছে। কেবল একটা কথা বোঝা যায় পুষ্প নেইয়ার চেঁচামিচি থেকে যে

পারবতিয়ার পায়ের আঙুলে ব্যথা। প্রায়ই সেলের ওপাশের বারান্দা থেকে পুষ্পর গলা শুনি, সে বললে তো হবেনি বাছা, খাটনির কয়েদী, তোমার ভাগের খাটনি কে করে দেবে? পায়ের আঙুলে উঁচোট লেগেছে তা বাগানের ইটগুলো তো ধুতে পারো, ঝাঁট নয় নাই দিলে! উঁচোটের বেথায় শয্যেশায়ী, অমনধারা বেথা আমি অনেক দেখিচি বাপু—দুচার দিন দেখব তা'পরে আমি এমন ওষুদ দোব যে তোমার বেথা পালাতে পথ পাবে নি।

একদিন স্নান করে ফিরছি সেলের দিকে, হাওদার কিনারে দেখি পারবতিয়া বসে কাঁদছে। কী হয়েছে পায়ে তোমার? পা বাড়িয়ে দেখাল। ফাটা, থ্যাবড়ানো, খেটেমরা পা। বুড়ো আঙুলের মাথায় একটা নোংরা কাপড়ের পটি বাঁধা। সেটা জলে ভেজা।

হাসপাতালের দিকে যেতে দেখেও ওয়ার্ডার কিছু বলে না। বরদা-মায়ের ব্যাপারের পর থেকে সবাই ভাবে আমি ডাক্তারি চিকিৎসা করতে জানি। ডাক্তার দে-র প্রশ্রয়ে ধারণাটা ওয়ার্ডারদের মধ্যেও কিছুটা ঢুকেছে।

একটু ডেটল আর তুলো চেয়ে নিয়ে পারবতিয়ার আঙুলের পটিটা খোলবার সময়ে আমিও ভেবেছিলাম কাটাকুটি তো কিছু নেই, হয়ত ভয়ে আর দুঃখে বেশি কাহিল হয়েছে ও। ভেজা পটিটা খুলে নোংরা চওড়া নখের ওপরটা, আঙুলটা ডেটল দিয়ে মুছতে গিয়ে হাত থেকে তুলো পড়ে যায়। এক নিমেষের জন্য সমস্ত শরীরটা বিবমিষায় ঝাঁকিয়ে ওঠে। হোঁচট খেয়ে ফেটে গেছিল নখের তলাটা। নোংরা নয়, নীলকালো বিক্ষত নখের নিচের সেই ক্ষতস্থান থেকে ডেটলের গন্ধে বেরিয়ে আসছে পোকা। ম্যাগটস্।

সেদিন তখনও টিচাররা আছেন, আমি সেলের দিকে ফিরছি, আনন্দ ডাকল আস্তে আস্তে, দিদি-তোমাদের ওখানকার জেল থেকে মেয়ে এসেছে—লাইফার। পুরুলিয়া জরাইকেল্লা সীমান্তের বনাঞ্চল থেকে এসেছে, যেন কোন আদিম মানবগোষ্ঠীর প্রাণী। দোহারা লম্বা চেহারার খোলা অংশগুলি প্রায় সবই ঢাকা বিচিত্র উল্কিতে, পেছনে ঝুঁটি পাকানো চুলে পুরনো কাঠের কাঁকই গোঁজা। শিকলে বেঁধে সেপাইরা ভেতরে এনেছে তাকে। দাঁড়িয়ে রইল অবুঝ ঘৃণা মাখানো দৃষ্টি বেপরোয়া সোজা মেলে। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া, নাম লেখানো, ওয়ার্ডের ভেতরে যাওয়া প্রতিটি কাজে বাধা দিল আসুরিক ক্ষমতা নিয়ে। ওজন নেবার মেশিনটাকে লাথি মেরে ছিটকে দিল দূরে। প্রথম থেকেই ওর জায়গা হল শিকলবাঁধা সেলে। কিন্তু পুষ্প নেইয়া সে কথা মানবে কেন? ও তো পাগল নয়। সশ্রম কারাদণ্ডের আসামী, ওর ভাগের খাটনি খাটবে কে? শিকল বেঁধে রেখেও একমাত্র যে কাজ

করানো যায় তা হল চরকায় সুতো কাটা। কিন্তু চরকা ভেঙে ছুড়ে দেবে না তার নিশ্চয়তা কী? সুতরাং তাকে মেরামত করতে হল। অত্যাচারে, অনাহারে একসময়ে ক্লান্ত হয়ে এল প্রতিরোধ। কিন্তু দুটো-তিনটের বেশি কথা বলত না কখনও। কোন আরণ্যক উপজাতির মেয়ে, নাম বুধা। দুবার সাঙ্গা হয়েও যে ওর সন্তান হয়নি, তার কারণ সম্বন্ধে বিশ্বাসে ওর কোনো দ্বিধা নেই। ডাইনীর চোখই তো শুকিয়ে দিয়েছে ওর প্রজনন-ক্ষমতাকে! হোক না সে ওর নিজের জেঠি। সুতরাং ডাইনী মেরে ওর তো ধারণা যে ও পাঁচজনের উপকারই করেছে। তাই পালিয়ে যাবার তো কোনো চেষ্টা করার কথা ভাবেইনি। বাপের গরু খুলে রাখা গাড়িটার ওপরে বসে জিরোচ্ছিল। কেন যে গাঁয়ের সরকারি চৌকিদার ওকে ধরে আনল সে কথা আজ পর্যন্ত বুঝতে পারেনি। তারপর গভীর কালো ছায়ামাখা স্যাঁতসেতে জঙ্গলের বদলে, কেন যে এই সব নোংরা দেওয়াল, পাকাবাড়ি, অদ্ভুত অনাত্মীয় মানুষদের দুর্বোধ্য ভিড়—এগুলোর একেবারে কোনো অর্থ নেই ওর কাছে। জেলের মোটা নীলপাড় সাদাশাড়ি দিয়ে টিকিটে ওর টিপছাপ নিতে এসেছিল মেট্রন। এক মুহূর্তে বুধা যেন একেবারে পাগল হয়ে যায়। মেট্রনকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুটে আসা ওয়ার্ডারের ওপর। দিন তিনেক পর সর্বাঙ্গে কালশিটে আর চোখে খাঁচায় ভরা জন্তুর দৃষ্টি নিয়ে বলে—অমনি নীলকালি দিয়ে কাগজে টিপছাপ নিয়েই তো, ওকে গাড়িতে তুলে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। বছরখানেক একেবারে চুপচাপ হয়ে যায় বুধা। এমনকি চরকা কাটার খাটনির বদলে ওর শারীরিক সামর্থ্য অনুযায়ী বাগান ঝাঁট দেবার কাজ দেওয়া হয়েছে। খুলে দেওয়া হয়েছে পায়ের শিকলও। কণ্ঠার ডানার হাড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, শুধু রয়ে গেছে একই রকম চুপচাপ। একমাত্র বরদা-মায়ের কাছে কখনো কখনো বসে থাকতে দেখি। তারপর একদিন গরমের ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে, বুধা হঠাৎ ওয়ার্ডের পাঁচিলের গায়ে বিশাল শিরীষ গাছটায় উঠতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে হৈ হৈ চিৎকার ঢিলছোড়া, ওয়ার্ডারের হুইস্‌ল, পাগলাঘন্টি। কোনো কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না করে, সটান উঠে যেতে থাকে ও, যতক্ষণ না চোখ পড়ে পাঁচিলের অপর দিকে। ও বোধহয় ভেবেছিল ওধারে মুক্তি। মূর্খ মেয়েটার মাথায় আসেনি যে তা হলে গাছটা ওখানে থাকত না। জীবনে আমি বহু হতাশ মুখ দেখেছি। অন্যের কাঁধে এবং আয়নায়। কিন্তু বুধার মুখের মত মুখ যেন আমাকে আর কখনও দেখতে না হয়। ওপারে বিস্তৃত আর একটা ওয়ার্ডের উঠোন। ও নেমে আসার কোনো চেষ্টাই করল না।

সেই হতাশ এক্সপ্রেশানটা আঁটা রইল মুখে। তে'তলা সমান উঁচু ডাল থেকে ঝাঁপ দিল নীচের পাথুরে চাতালে।

পাথর হয়ে যাওয়া মনও কয়েকদিন বড় উদাস স্পৃষ্ট হয়ে থাকে, বুধার জন্য। যেন অন্য কোন গ্রহের প্রাণী এমন সুদূর থেকে এসেছিল। ভূগোলে আর কতদূর, কিন্তু মানভূমের ঘন জঙ্গলের ভিতরে অবস্থিত তার গ্রাম সমস্ত দিক থেকেই বহু বহু সময় দূর এই শহর থেকে, এর সংগঠিত সভ্যতা থেকে। সেই গ্রামের বাইরে মেয়েটি কোনোদিন যায়নি, সাঁওতাল সমাজ ছাড়া অন্য কোনো সমাজ সে জানে না, সাঁওতালি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা সে বোঝে না। সেই সমাজের রীতিনীতি থেকে আকাশপাতাল ভিন্ন, তার পৃথিবীতে অর্থহীন ও অস্তিত্বহীন এক সংবিধানের অধীনে তার সম্পূর্ণ অবোধ্য এক ভাষায় এবং তার বোধের সম্পূর্ণ বাইরে স্থিত অপরাধে তার বিচার হয়ে গেল। যে রাষ্ট্রের কোনো অস্তিত্ব, কোনো ভূমিকা তার কিংবা তার গ্রামবাসীদের জীবনধারণে কখনও ছিল না, বুধার জীবনের কুড়িটি বছর কেড়ে নেবার ক্ষমতার মধ্য দিয়ে সেই রাষ্ট্র দেখা দেয়। যাদের বেঁচে থাকবার অধিকারের ক্ষেত্রে সমান অধিকার অলীক ঠাট্টা তাদের দণ্ডবিধানের ক্ষেত্রে আইন, দণ্ডবিধির সমতা।

সবচেয়ে কাজে লাগে খবরের কাগজ নেবার জন্য। যদিও তেমন কোনো খবর থাকলেই কাগজ বন্ধ। অনেকদিন বন্ধ থাকার পর আবার লাইব্রেরির বই দু'একটা পাচ্ছি। বেশিরভাগ জেল লাইব্রেরিতেই দেখেছি নির্বিকার ধর্মগ্রন্থ আর নিচুস্তরের যৌন বইয়ের প্রাধান্য। এ ছাড়া থাকে একদা জেল প্রশাসক মহারথী সাহিত্যিকদের কিছু বই। প্রত্যেকটি অনেকগুলো করে কপি। যেসব পড়লে মনে হয়, জেলে লেবুকুঞ্জের পাশে পাশে ঘুরে বেড়ায় কেবল যুবতী বন্দিনীরা। আর তাদের দুঃখের কথা শুনবার জন্য থাকেন কিছু সুন্দর ডাক্তার ও সহৃদয় প্রশাসক। তবে বাস্তবে তাঁদের সম্পর্কে পুরনো বন্দীদের মতামতগুলো কান পেতে শোনবার মত। মেদিনীপুর জেলে ইংরেজ আমলে ডেটিনিউদের জন্য আনা, কিছু ভালো ভালো বই আছে। আর আছে খুব পুরনো এডিশান, কালো মলাটে বাঁধানো ভারী ভারী এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা। দুটি বাচ্চাসহ আটটি প্রাণীকে বন্ধ করে রাখা ঘুমন্ত ঘরে, হঠাৎ স্যাঁতসেতে বাগান থেকে হাত দেড়েক লম্বা কুচকুচে কালো সাপ ঢুকে পড়লে তাকে সংহারের এক মাত্র হাতিয়ার হয়েছিল জ্ঞানে গুরুভার বইগুলো। যে ওয়ার্ডার আগের রাত্রে বহু ডাকাডাকিতেও গরাদ খুলে দেখতে রাজি হননি, লাঠি হাতে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছিলেন ; পরদিন সকালে তিনি মৃত সাপটি দেখে প্রায় বিস্ময়মুগ্ধতা প্রকাশ করেন, বাঃ আপনার তো দারুণ সাহস ! উত্তর দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না তবু বলেছিলাম, আপনার ছেলেমেয়ে ঘুমিয়ে থাকা বন্ধ ঘরে সাপ ঢুকে পড়লে আপনারও সাহস বাড়ত। প্রকৃতপক্ষে দিনের পর দিন আমার সাহস বাড়াতে সাহায্য করার জন্য, এঁদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত কি না বুঝে উঠতে পারি না।

এখানকার লাইব্রেরি থেকে 'ফর হুম দ্য বেল টোলস' আনিয়েছিলাম। রাত্রে পড়তে পড়তে হো হো করে হেসে উঠতেই, ওয়ার্ডার দৌড়ে এসেছে। *একা সেলে থেকে থেকে পাগল হয়ে গিয়েছি কি না দেখতে।*

যুদ্ধ' আর আনন্দকিশোর মুন্সীর 'ভেলকি থেকে ভেষজ' প্রায় মুখস্থ হয়ে গেল। শেষে 'সহজ বেতার শিক্ষা', আনিয়ে পড়ি। কিছু সাদা কাগজের জন্য অনেকবার বললাম। বৃথা।

দীর্ঘ কারাবাসের সাজা হলেই সেটা সশ্রম সাজা হয়। মেয়েদের কাজ সাধারণত উঠোন বাগান ঝাঁট দেওয়া, ছোলা ভেজে জাঁতায় পিষে ছাতু তৈরি করা, চরকায় সুতো পরিয়ে জট ছাড়িয়ে সেটা তাঁতের নলীতে পরিয়ে দেওয়া, পাগলদের দেখাশোনা করা ; প্রধানত এই সবই। এ ছাড়া দু-এক জন যারা কাজ শিখে নিতে পারে, তারা হাসপাতালে রোগী দেখাশুনো করে—এটা অত্যন্ত আরামের এবং আগেই বলেছি ক্ষমতাশালী পদেরও কাজ। এ সব কাজের জন্য কয়েদীরা বছরে পনেরো দিন রেমিশন পায় ও মাসে বারোটাকা বেতন। বেতনের অর্ধেক তারা খরচ করতে পারে। অর্থাৎ মেট্রনকে দিয়ে চেয়ে পাঠালে অফিস থেকে ঈপ্সিত জিনিসটি, যদি তা জেলকোড অনুসারে বেআইনি না হয়, কিনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যে দামে তাই তাদের শিরোধার্য করে নিতে হয়। বাকি অর্ধেক টাকা জমা থাকে। খালাস পেয়ে চলে যাবার সময় কয়েদীকে পুনর্বাসনের পাথেয় হিসেবে সেই জমা টাকা দিয়ে দেওয়া হয়। তা থেকে বেরোবার সময়ে 'খুশি হয়ে' এর ওর হাতে মোট কত দিয়ে যেতে হবে, তার সাধারণত নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে। যেহেতু নেশার জিনিস বা রঙিন পোশাক ইত্যাদি আনানো যাবে না, সুতরাং মেয়ে বন্দীদের বেতনের টাকাটা জমেই থাকে। শীতের মুখে হঠাৎ খেয়াল হল, দিদি অফিস থেকে উল আনিয়ে দিলে তুমি সোয়েটার বুনে দেবে ? দিদির উৎসাহ ওদের চেয়ে বেশি। কেন না তার তো সময় কাটতে চায় না। অথচ তাকে সজীব সজাগ থাকতেই হবে, হার মানা চলবে না। সুতরাং সাপ্তাহিক ইনসপেকশানের দিন সুপারিনটেণ্ডেন্টের কাছে অতি বিনীত আর্জি পেশ করা হল। নেপালি ভদ্রলোক বোধ হয় চট করে এর মধ্যে কোনো আপত্তির কারণ আবিষ্কার করে উঠতে পারলেন না। কেবল ঈষৎ বিস্ময়ের স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, উনি তৈরি করে দেবেন বলেছেন ? উল এল। প্রথমে মহক্কা বেগমের বাচ্চাদের জন্য। তারপর মাজেদা, তারও বাচ্চাদের জন্য। কাকা, বরদা-মা, ফুলমালা ব্যস ! যেই ওয়ার্ডার শান্তাকে মেরেছিল, সে যেদিন এক বাণ্ডিল উল হাতে করে ঢুকল, সেটা ছুড়ে দিইনি শুধু অন্যদের সোয়েটারগুলো ওর লোভের থাবায় বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে ভেবে।

—কেন বুনে দেবেন না ?

—তোমার কাজ করে দেব না বলে।

উল বন্ধ হল। অফিসে রিপোর্ট সোয়েটার বোনাটা ছুতো। উল দিয়ে দড়ি তৈরি হচ্ছে। সার্চ করে পাওয়া যায়নি? ও যা মেয়ে, সাংঘাতিক! কোথাও লুকিয়েছে। ভাবীর দুঃখ কেন নিজেরটা আগে বুনতে দেয়নি। আমার খুশি এই, ফুলমালার নিপুণ আঙুল কৌশলটা রপ্ত করে নিয়েছে। আমি যখন থাকব না, তখন তো ও বুনতে পারবে। ওর অদ্ভুত ক্ষমতা আছে যে কোনো কাজ নিপুণভাবে আয়ত্ত করার।

ফুলমালা বর্মনী। ওয়ার্ডের সবচেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চেহারা আর ফিটফাট স্বভাব। সামান্যতম ময়লা কোথাও থাকলে ফুলমালার কাছে মাপ নেই। দুপুরে বিশ্রামের সময়টুকু পা মেলে বসে গুনগুন করে যা হোক কিছু একটা বই পড়ে। ওয়ার্ডের প্রয়োজনীয় যে সব নিত্যকার জিনিস ভেতরে আসে, গেটের কাছে ওয়ার্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে, কয়েদীদের তরফ থেকে সে সব জিনিস বুঝে নেবার দায়িত্ব ওর। কোনো জিনিস কম এলে, বাচ্চাদের দুধ বা চিনি খারাপ এলে, ফুলমালার চিকণ গলার উঁচু ধমকাধমকিতে ওদিকের সেপাই গেট ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে একটা রসিকতা ওয়ার্ডে চালু ছিল। সব সময়ে হাসত। খাঁদা নাক, চেরা চোখ দিয়ে হাসি ঠিকরে পড়ছে। কথা বলার ধরনটাও আমাদের উত্তর বাংলার ডায়লেক্টে অনভ্যস্ত কানে ভারি মিষ্টি লাগে। ছোট, ফর্সা সুছাঁদ, মঙ্গোল ছাপ চেহারায় একেবারে বেমানান ওর গলায় এপার-ওপার বীভৎস একটা কাটা দাগ। এটা জানি, যে ও বিশবছরী, খুনের আসামী। কিন্তু প্রশ্ন করতে সাহস হতো না—কোন আঘাতে হাত দিয়ে ফেলব। একদিন নিজেই বলল খানিকটা বিদ্রূপ আর খানিকটা উদাসীন হাসি মিশিয়ে। মেয়ে দু'টি খেতে-পরতে পাবে, সেই আশায় ভাগচাষী বাপ তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে দিয়েছিল সতীনের ঘরে। চার-পাঁচ বছরের প্রাপ্তি, সব অর্থে শারীরিক নির্যাতন, 'হাঘরে মেয়ে'র লাঞ্ছনা আর দুটি সন্তান। এক সর্বনাশা মুহূর্তের রাগে, ক্ষোভে, অসহায় ক্রোধে বাচ্চাদুটোকে বিষ খাইয়ে নিজের গলায় হাঁসুয়া চালিয়ে পড়েছিল খেতের আলে, মা মরা বাচ্চাদের রাখবে কে' সেই কথা ভেবে। কপালের লিখনে সেদিনই রাত্রে লণ্ঠন হাতে খেত পার হচ্ছিল গ্রামের লোক। নিজের সন্তানদুটিকে ঠাণ্ডা মাথায় খুনের দায়ে— ! ফুলমালা ! কখনো যার কোল খালি থাকে না। ওয়ার্ডের নোংরাতমটা পর্যন্ত, একটা না একটা বাচ্চা কাঁখে ঝুলছেই ! ফুলমালা সেদিন আমার গরাদের সামনে দেওয়াল হেলান দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল। কাঁদেনি। কিন্তু হঠাৎ যেদিন সুপ্রিম কোর্টের আপিলে রিলিজ হবার খবর এলো ওর, আছাড় খেয়ে পড়ল বাগানের মাঝখানে ধুলোয়। অশ্রুহীন আর্ত

চিৎকারে আকাশ ফাটিয়ে। কোন ঘরে ফিরে যাবে ও? কোন উঠোনে? কাকে কোলে নিয়ে?

আমি যে সেলটায় থাকি, সেটা ওয়ার্ডের পিঠের দিকে, পশ্চিমতম প্রান্তে। পাশাপাশি তিনটে সেল। একেবারে পূর্ব প্রান্তে আরও তিনটে সেল আছে। সেগুলো একেবারে অন্ধকার। যামিনীকে ইনজেকশান দিতে গিয়ে একবার সেগুলো দেখেছিলাম। আরেকবার দেখেছিলাম পরে, যেদিন আমাকে অজ্ঞান রক্তাক্ত অবস্থায় ওখানে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। আমার সেলের সামনে বারান্দার পরে পাঁচিল। আগে বলেছি তার ওপারে দেখা যায় একটা অশত্থ গাছের মাথাটুকু। বছরের ঋতুচক্র আমার কাছে আসা-যাওয়া করে, শুধু চঞ্চল পত্রমুখর ওই শীর্ষটি দিয়ে। কখনো কখনো দেখি বাইরে আছাড়ি পিছাড়ি প্রচণ্ড ঝড়ের দাপট ; কিন্তু পাঁচহাত দূরের এই সেলে তো তার একটি বিন্দুও চুঁয়ে আসে না ! এই সেলে বন্ধ থাকলে, না আমি অন্যদের দেখতে পাই, না ওরা আমায়। দৈবাৎ কেউ পেরিয়ে গেলে, মাথা নিচু করে দ্রুত হেঁটে যাওয়া দেখে বুঝতে পারি, পেছনে ওয়ার্ডার দাঁড়িয়ে আছে। সারাদিনের সব কাজ শেষ করে সাড়ে পাঁচটায় লক আপে যাবার আগে, বিমলাভাবী রোজ একবার আসে। দুটো বিড়ি ধরিয়ে পরম যত্নে একটা আমায় দেয়, একটা নিজে নিয়ে গরাদ ঘেঁষে বসে। সারাদিনের সব খবর পাই ওর কাছে। কোন ওয়ার্ডার একগোছা লিচু ছিঁড়ে নিয়েছে কাল রাত্রে—তারা নিজের বাপ-ভায়ের মাথা খেয়ে এখানে এসে থাকে না কেন, শান্তার বাড়ি থেকে ওর মা-বাবা পার্সেল করে কান্তু বিন্দুর জামা পাঠিয়েছে, আপনি নাকি সুপার সাহেবের ভাষা বলতে পারেন, লক্ষী ওয়ার্ডারনী বলছিল ! এরকম গুচ্ছা গুচ্ছা আম আমাদের দেশে গাঁয়ে—

আর কখনো এক ঝলক ছুটে আসে বাচ্চারা। তাদের কে কবে আটকাতে পেরেছে ! দিয়ে যায় একটা গাছের পাতা, একটা শালিকপাখির পালক কিংবা সকালের জলখাবার রুটির একটা টুকরো। আর একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পেয়েছিলাম গরাদের ভিতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে মাথার কাছে রাখা, একমুঠো বেলফুলের কুঁড়ি। কে যে রেখে গিয়েছিল জানি না। কিন্তু নিঃসঙ্গ ধূসর দিনগুলির মধ্যে একঝাঁক তারার মত, একদল ভালোবাসা ভরা মুখের মত সঞ্জীবনী আজও তাদের গন্ধের স্মৃতি।

আমার পাশের সেলে থাকে বিনোদা। পাগল। লম্বা, ফর্সা, বছর ছাব্বিশ সাতাশ বয়স। শক্ত সুঠাম গড়নের চেহারায়, খাটো মোটা শেমিজে, উঁচো দাঁত আর খুব ছোট করে ছাঁটা চুলে ওকে কেমন ইস্কুলের ছেলেদের মত

দেখায়। খুব মুডি মেয়ে। যেদিন চান করবে না—করবেই না। গালাগাল দিয়ে পুষ্প নেইয়ার উর্ধ্বতন অধস্তন আঠাশ পুরুষের শ্রাদ্ধ করবে। আবার মাঝে মধ্যে খুশি মনে গায়, গেয়ে শোনায়। কোনো কোনোদিন রাত ভোর। স্পষ্ট জোর গলা, 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে' এই সব। কখনো কখনো বিয়ের গান, হাসির গান। আর কি হাসতেই পারে বিনোদা ! বড় বড় চোখ ভর্তি হাসি দেখতে পাই, শিকল ধরে টেনে যখন ওকে স্নান করাতে নিয়ে যায়। সকালে গুনতির সময় মড়া সেজে পড়ে থেকে, শেষে হা হা করে হেসে উঠে, ওয়ার্ডারকে ভয় দেখানো ওর একটা প্রিয় খেলা। সারাদিন হাসে, যতদিন না হঠাৎ সাময়িক স্মৃতি ফিরে আসে—ঘরের চালে আগুন ধরে যেতে তরুণী মায়ের ঘুমচোখে বালিশটা তুলে নিয়ে বাইরে ছুটে বেরোনোর স্মৃতি, অল্প অল্প ধোঁয়া ওঠা ছাইয়ের মধ্যে প্রায় ছাই হয়ে যাওয়া মাংসপিণ্ডটার গন্ধের স্মৃতি। যতক্ষণ সুস্থ মানুষ হয়ে থাকে বিনোদা, ততক্ষণ বুকফাটা চিৎকার করে কাঁদে, কোনো অবোধ জন্তুর মত সমস্তদিন, সারা রাত্রি। তারপর আবার পরম করুণায় বিস্মৃতি আসে। পাগল হয়ে গিয়ে আবার ভালোমানুষের মত হাসিখুশি হয়ে ওঠে। হা হা করে হেসে উঠে শুধোয়, এই দিদি আমি রাত্তিরে খাইছি নাকি রে ? খাইছি ? ল' তাইলে এট্টা গান শোন ! আবার 'মনমাঝি তোর বৈঠা নে রে'র সুর জেলের প্রাচীরের ওপর দিয়ে অশথের মাথা ছুঁয়ে, বুঝি বা গঙ্গা পার করে।

তার পাশে অবশিষ্ট সেলটার বাসিন্দারা যাওয়া আসা করে। আয়তামাঈ ছিল কয়েকদিন। অন্তঃসত্তা থাকাকালীন স্নায়বিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল।. সস্নেহ কোনো মেডিক্যাল কেয়ার সেন্টারের বদলে এসেছে, দার্জিলিং এর ঠাণ্ডা পাহাড় থেকে, শুকনো সাদা ধুলোয় ভরা এই বহরমপুর জেলে। সেখানে নাকি পাগল রাখবার ব্যবস্থা নেই। প্রায় চাকার মত গোল একটা বাচ্চার জন্ম দিয়ে, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠছিল আয়তামাঈ। হঠাৎ মেট্রনের মনে হয়েছে, আয়তামাঈ বাচ্চা নিয়ে ভারি চুপচাপ বসে আছে। ও আগে পাগল ছিল। সুতরাং ফরমান জারি হল বাচ্চা সরিয়ে নাও—আয়তা বাচ্চাকে কোলে নিতে বা দুধ খাওয়াতে পারবে না। বন্দীদের ভাগের খাবারে পুষ্ট শরীর, এই রাষ্ট্রক্ষমতার প্রতিনিধিটির সূক্ষ্ম বিচার ও নির্দেশ নিরক্ষর একগুঁয়ে মা'টির পছন্দ হয় না এবং অবাঞ্ছিত জোরের সঙ্গে সে নিজের আপত্তি প্রকাশ করে। পুষ্প নেইয়ার শাড়ির আঁচল ফেঁসে যায়, আয়তামাঈয়ের চোখের কোলে ও খোলা পিঠে নীল সবুজ হয়ে রক্ত জমে থাকে। বাচ্চাটা সারারাত্রি কাঁদে। তার নামে বরাদ্দ চিনি, মেট্রন ও ওয়ার্ডারের

পবিত্র চা সরবতে যুক্ত হয়। মাটির নাম ধরিত্রী ! তাই সমস্ত রাত্রি মায়ের বুক থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়া দুধ সেলের মেঝেয় জমে থাকে ! জ্বলে ওঠে না, ফেটে পড়ে না, ধ্বংস করে দেয় না ! অসহায় চিৎকারে বিদীর্ণ আয়তামাঙ্গী চলে যায় লালগোলায় পাগলদের জেলে। কয়েকদিন দুধ চিনির জোগান দিয়ে, দায়িত্বজ্ঞানহীন বাচ্চাটা মরে যায়। খালি সেলটায় সাইদা খাতুনকে সকালে এনে বিকেলেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। পাগল সাইদা একটানা আটবছর অন্ধকার সেলে থাকবার পর আলোয় এসে ওর স্বভাবসিদ্ধ অতিমৃদু স্বরে সকলকে কাকুতি করতে থাকে, ওকে অন্ধকারে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। সাড়া না পেয়ে, অদ্ভুত ধৈর্যে একটানা মাথা ঠুকতে থাকে গরাদে। রক্তে সারামুখ ভেসে যাবারও অনেক পরে, ওর সেলের দরজা খোলার শব্দ পাই। সাইদাকে কোনো দিন দেখিনি। শুনলাম কেবল।

অসুস্থতার হেরফের নেই। বমি করেই চলেছি। আবার দু'ঘন্টার ছুটি সেল থেকে। কিন্তু এখন আর বিশেষ ঘোরাঘুরিও করতে পারি না। আমগাছগুলোয় গুচ্ছ গুচ্ছ আম ধরেছে। এতো কাছ থেকে এমন দেখিনি কখনও। ওয়ার্ডে বাগানভরা কাঁঠালগাছ। তার পাতাগুলি এমন ভারী, বাতাসেও নড়ে না। একটা পাখিও বাসা করে না, পাঁচিলঘেরা গাছগুলোয়। সেই থেকেই বুঝি কাঁঠালগাছকে আমার গাছ মনে হয় না ! জুনের শেষ গরমে অস্থির সবাই। মেট্রন আর ওয়ার্ডার পাগলের মত ছুটে এল হেড ওয়ার্ডারের সঙ্গে। কী ব্যাপার ? প্রথমেই উথাল-পাথাল সার্চ। মনে ভাবছি কোনো পালানোর চেষ্টা হয়েছে কি ছেলেদের ওয়ার্ডে ? তারপর বেরুল বেড়াল। আই জি প্রিজনস আসছেন কাল ! তো কী হয়েছে এলে ! সে কথা শুনবে কে ? গলা কেটে নেওয়া মুরগির মত ধড়ফড় করে বেড়াচ্ছে মেট, ওয়ার্ডার আর সিপাইরা। আষাঢ় মাসের তীক্ষ্ণ রোদ্দুরে বাগান ঝাঁট দিয়ে দিয়ে সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়ার মত তক্‌তকে করা হল। প্রতিটি ফুলগাছ ধোয়া হল জল টেনে এনে। তারপর বাগানের কেয়ারির কিনারার ইটগুলো খুঁড়ে, তুলে, নতুন নকশায় বসিয়ে, নতুন করে রং করা হল একটা করে চুন, একটা করে আলকাতরা দিয়ে। দরদর করে ঘামছে মেয়েরা। নিঃশ্বাস আটকে আসছে গরমে। বিকেলে আর হাত-পা ধোবারও জল নেই। কোনোরকমে রাত কাটিয়ে, পরদিন সকালে আর এক পর্ব। সকালের খাবার আটটার বদলে চলে এল সাতটারও আগে। সাড়ে এগারোটায় তাঁর আসবার কথা। সে সময় যেন কোনো অবাঞ্ছিত হাঁটাচলা, নড়াচড়া না হয়। আবার ঝাড়া-মোছা, বাড়ির বাইরের দিকটা অর্থাৎ আলকাতরা স্কার্টিং করা চুনকামটাও

ধুয়ে ধুয়ে সমস্ত দাগ অদৃশ্য করে ফেলা হল। কম্বলগুলো ভাঁজ করে রেখে দিয়ে, থালাবাটিগুলো সরিয়ে নিয়ে, গুদামে বন্ধ করে রাখা হল। আমি একবার মেট্রনকে জিগেস করলাম আই জি' রা কি থালায় করে ভাত খান না? নাকি জেলে ভাত খাওয়াটাই একটা বেআইনি গোপনীয় ব্যাপার? জবাবে শুনলাম, না, সকলের থালা গেলাস তো সমান পরিষ্কার নেই। দেখতে খারাপ লাগবে।' বারোটায় গেটে ভি আই পি ঢোকবার ঘন্টা বেজে উঠল। সমস্ত কয়েদীরাই টিকিট গুছিয়ে রেখেছে। বিশেষত যাদের মুক্তির দিনের হয়তো আর দু'-তিন বছর বাকি, সেরকম বিশবছরীরা। বাকি সকলেরই রেমিশান হিসাব করে, সাজার সময় পুরো হয়ে গেলে জেল অফিস থেকেই তাদের রিলিজ অর্ডার চলে আসে। কিন্তু যাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়, তাদের রিলিজ অর্ডার আসে রাইটার্স বিল্ডিং থেকে। কাজেই রেমিশান ইত্যাদি সমস্ত কিছু সত্ত্বেও, তাদের তাকিয়ে থাকতে হয় রাইটার্স বিল্ডিং নামক কোনো সুদূর স্বর্গের দিকে, যেখানে বসে সর্বশক্তিমান এক আই জি প্রিজন্‌স সই কবে করে দেবেন সেই মুক্তির হুকুমনামায়। তাঁরা ফাইলের কাগজ সই করে উঠতে পারেননি যা ফাইল কোথাও চাপা পড়ে গিয়েছে বলে, একটি মানুষ বাইশ-চব্বিশ বছর, এমনকি একচল্লিশ বছর ধরে জেলে পড়ে আছে, এমন ঘটনা বিরল হলেও অমিল নয়। সেই আই জি প্রিজন্‌স ইনসপেকশানে আসছেন নিজে। সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে ওয়ার্ডে প্রথমে বাচ্চাদের খাবার চলে আসে, তারপর বারোটা, সাড়ে বারোটায় কয়েদীদের সকলের। কিন্তু আজ তো ভি আই পি এলেন বারোটায়। জেলের মেনগেটে তাঁর ঢোকার ঘন্টা পড়া মাত্র, ওয়ার্ডের ভেতরে মেয়েরা ফাইলবন্দী হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। দেওয়ালের ধার ঘেঁষে লম্বা লাইন, নাক পর্যন্ত ঘোমটা টানা, জড়োসড়ো ভঙ্গি, হাতে টিকিট। বাচ্চাদের বলা হয়েছে, ওয়ার্ডের পেছনে গাছতলায় চুপ করে বসে থাকতে। বলা বাহুল্য এর কোনোটাই আমাকে বলা হয়নি। আমি কেবল দেখছি, কি অর্থহীনভাবে মানুষকে আতঙ্কিত করে রাখে এই আমলাতন্ত্র! দাঁড়িয়ে একটা বাজল! দেড়টা! বড়দের কথা ছেড়ে দিলেও, বাচ্চারা খিদেয় অস্থির। কিন্তু সাধারণ বাচ্চাদের মত কাঁদা বা অভিযোগ জানানো বা ফাইলে দাঁড়িয়ে থাকা মায়ের কাছে আসবার মত বিলাসিতা এরা কল্পনাই করতে পারে না। দুটোর সময় গেটের সিপাই খবর দিল আই জি চলে গিয়েছেন। ইনসপেকশান! নাঃ, ইনসপেকশান করেননি। সুপারের খসখসে ঢাকা অফিসে বসে, আলোচনা আদি করে, কফি বিস্কুট খেয়ে, ফিরে গিয়েছেন।

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কেবল এই খবরটুকু জানানো যায় যে, দুপুরের খাবার এলো পৌনে তিনটেয়। আর রাত্রের খাবার নিয়ম মত সাড়ে চারটেয়। খাবার নিয়ে ওয়ার্ডের ভেতরে যাবার নিয়ম নেই—তক্ষুনি খেয়ে থালা মেজে নিতে হবে। সাড়ে পাঁচটায় লক্-আপ।

হৃদয়হীন ঠাট্টার প্রতীকের মত, কিংবা দানবের দাঁতের মত, রয়ে গেল কেবল বাগানের কেয়ারিতে বসানো, সেই সাদাকালো ইটের সারি।

বর্ষা ভালো করে নামেনি তখনও। ছেলেদের ওয়ার্ড থেকে জন চারেক শক্ত চেহারার বন্দী ও একজন মেটকে নিয়ে, সিপাই-সহ হেড ওয়ার্ডার আমাদের ওয়ার্ডে হাজির। কাঁঠালগাছগুলো আপাদমস্তক বোঝাই হয়েছে ফলে, সেগুলো পাড়া হবে। এই মেটকে বিমলাভাবী চেনে। আর আমরা সবাই নামে চিনি, সাহসী আর সৎ বলে। লেখাপড়া জানা ছেলে। লাইফার। ওয়ার্ডের সামনের বাগানের সব গাছের কাঁঠাল নামানো হল। একটা পর্বতের মত হয়েছে। পিছনে স্নানের জায়গার দিকে আরও সাতটা গাছ আছে। ভাবী কী একটা বলতে যাচ্ছিল। মেট ভাবীর চোখের দিকে তাকাল। তারপর কাঁঠাল ভাগ হল। ওয়ার্ডের সমস্ত বাসিন্দাদের নামে একটা করে দিয়ে যা বাকি রইল, সেগুলো কম্বলে বোঝাই করে বয়ে নিয়ে চলে যাবার সময়ে মেট আর একবার ভাবীর দিকে তাকিয়ে, চলে গেল। পেছনের গাছগুলোর ফল রয়ে গেল, ছেলেদের ওয়ার্ডের তরফ থেকে মেয়েদের আর বাচ্চাদের জন্য নিঃশব্দ সওগাত। পরে শুনেছি অখিল মেটের কথা। ও জেলের বন্দীদের পঞ্চায়েত সদস্য বলে সবাই ওকে বলে অখিল পঞ্চায়েত। যাবজ্জীবন সাজা। ওর কোনো বদস্বভাবী প্রতিবেশী সন্ধেবেলা অখিলের বোনকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিল। সেই মুহূর্তে অখিল ঘরে ঢোকে। সে ফিটার মিস্ত্রির কাজ করত। বোনের বিয়ের কথাবার্তা চলছিল বলে তাকে গ্রামের বাড়ি থেকে ক'দিনের জন্য কলকাতায় নিজের কাছে এনে রেখেছিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা কাজ থেকে ফেরার পথে সে বৃষ্টিতে আটকে পড়েছিল বলে বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল। ওরকম এক ঘটনার মুখোমুখি পড়ে মানুষের পক্ষে সবচেয়ে স্বাভাবকি কাজটিই অখিল করে। হাতে ধরা কোনো ভারী যন্ত্র দিয়ে সজোরে লোকটির মাথায় মেরেছিল। সে মরে যায়। মৃতের বারবার ফিট হয়ে যাওয়া স্ত্রী ও ক্রন্দনরত ছেলেরা খুব জোরের সঙ্গে আদালতে বলে যে নিহত লোকটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে দোকানে যাওয়ার পথে অখিলের বাড়ির সামনে অখিলের হাতে মারা যায়। আগের দিন অখিল তাদের বাড়ি

জলের কল সারাতে এসে টাকাপয়সা নিয়ে ঝগড়া করেছিল। ঘটনার দিন সন্ধেবেলা অখিল মাতাল ছিল। তার বোন সন্দেহজনক জীবন কাটাত, দাদাকে বাঁচানোর জন্য সে সহজেই একটি ভদ্রলোকের নামে মিছে কথা বলছে। কে যে কাকে অপরাধী বানায় আর কে তার বিচার করে!

আধঘুমন্ত অবস্থায় পাঁচিলের উপর থেকে পড়ে গিয়ে পিঠের হাড়ে চোট পেয়েছি তখন। ভেঙেছে যে সেটা জানি না, কিন্তু অসমান জমিতে, শুকনো খেতের আল বেয়ে চলাফেরা করতে পিঠে খুব লাগে। এদিকে প্রতিদিনই আশপাশ থেকে গ্রেফতার হয়ে যাচ্ছেন কয়েকজন করে সঙ্গী, প্রতিদিনই গুটিয়ে ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে জাল। এমন সময়ে একদিন দুপুরবেলা জরুরি মিটিং। আশপাশের গ্রামঘেঁষা বস্তি থেকে কজন এসেছেন। বসা হয়েছে এমন জায়গায় যেগুলি আমরা সাধারণত এড়িয়ে চলি। চারপাশে ফাঁকা খেত, ভাঙা জমি, অল্প ঝোপঝাড়। মাঠের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটি ছোট জলধারা, নদী বলতে একটু সঙ্কোচ হয়, স্থানীয় ভাষায় তাকে বলে 'জোড়'। শহরের কাছে এর ধারে আছে অপেক্ষাকৃত ছোট এক শ্মশান। সেই ধারার অনেকখানি নিচে একটি পরিত্যক্ত ভাঙা মন্দিরে আমরা বসেছি। প্রায় শেষ সকাল থেকে। দুপুর চলতে শুরু করলে সঙ্গীরা ফিরে গেছেন। একজন শুধু ফিরে আসবেন সন্ধ্যার মুখে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। পিঠের ব্যথা বেড়েছে বলে শুয়ে আছি ছোট্ট মন্দিরের ভাঙা গর্ভগৃহের বারান্দায়।

এই সময়ে জ্বলন্ত রোদ ভেঙে জোড় পেরিয়ে সেই লোকটি এল। শক্ত দড়ি-পাকানো চেহারা। ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল। ময়লা পোশাক, লালচে চোখ। এসেই খুব ধমকের গলায় বলল, তুই কে? এখানে কী করছিস? উঠে বসেছি ততক্ষণে, আর খুব দ্রুত ভেবে নিয়েছি, কী উত্তর দেব। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে মানুষটি গরিব। অকারণ এর কাছে মিথ্যে কথা বলব না, বললেও বিশ্বাস করবে না। সবচেয়ে খারাপ তো এই পর্যন্তই হতে পারে যে, এ গিয়ে পুলিশকে খবর দেবে। যদি দেয়ই তবে এর যেতে ও তাদের তৈরি হয়ে আসতে যা সময় লাগবে, তাতে আমি উঠে বহুদূর চলে যেতে পারব। অন্যদিকে, যদি পুলিশকে বলার লোক না হয়— !

বললাম বসতে। প্রথমে সে তেরিয়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বইসব নাই, তু বল কে বটিস?

না বসলে কি কথা বলা যায়? একটি কথা তো লয়!

কী জানি কী ভেবে বসল এবার। হাতের বেঁটে লাঠিটা হাঁটুর উপর রেখে। বললাম, সরাসরি বললাম সবাই আমাদের যে নামে উল্লেখ করে। দু-চার

কথায় বললাম কারা আমাদের মানুষজন, কী করার কথা আমরা ভাবি।

পুলিশকে ভয় পাস না তোরা?

না, পাই না। কত সঙ্গীসাথীরা তো প্রাণও দিয়েছেন ভয় না পেয়ে।

আমি কে জানিস?

ঘাড় নাড়ি।

যে নাম উচ্চারণ করে তা ওই অঞ্চলের এক কুখ্যাত দুর্ধর্ষ ডাকাতের নাম। অনেক হত্যার দায়ও আছে নাকি তার নামে। আমার মুখে তেমন কোনও চমক না দেখে শুধায়, ভয় পাচ্ছিস?

না। ভয় কেন পাব? ডাকাত হয়ে তো জন্মায় না কোনও গরিব মানুষ, দারিদ্র্য তাকে ডাকাত করে দেয়, চোর করে দেয়, এ কথা অজানা নয় আমার।

আস্তে আস্তে পালটে গেল মুখের পেশী, বসার ধরন। পাঁচ মিনিট আগের কড়া ধমক দেওয়া ক্রুদ্ধ লোকটি হয়ে গেছে এক ব্যথা-পাওয়া বালক। মায়ের কাছে খুলে দেখাচ্ছে তার আঘাতের চিহ্নগুলি, বলছে তার সারাজীবনে লাঞ্ছনার কাহিনী।

তিন পুরুষ ধরে তারা ভাগচাষী ছিল মহাজনের। সবচেয়ে আগে যে জমি নিজেদের ছিল পরে তার মালিকানা খোয়ালেও, ভাগে চাষ করলেও, একই মমতা থাকে সেই জমিতে। নতুন আইন হতে তিনপুরুষের ভাগচাষী জমির মালিকানা পেয়ে যেতে পারে এমন ভয়ে মহাজনের ছেলে নতুন মালিক একদা তাকে বলেছিল, এবার তুই আসিস না, জমিতে আমি অন্য লোক নিয়েছি।

লোক নিয়েছি মানে? আমি চাষ করব না?

না, বললাম তো!

কেন? আমি ফাঁকি দিয়েছি কোনো দিন? রক্ত জল করিনি জমির উপর? ফসল ঝেড়ে বেঁধে মেপে মেপে তুলে দিয়ে আসিনি তোমার উঠানে? তবে কেন আমাকে তাড়াবে?

আমার খুশি। আমার নিজের জমি, আমার যাকে খুশি আমি ভাগে দেব।

এ বিটি, উয়ার পায়ে ধরতে গেলি আমি। কুনও দিনও বলি নাই যি ই জমি আমার, কুথাও নিজের নাম লিখাই নাই। কেনে লিখাব! সেটি ধম্ম হত নাই। কিন্তু আমার বাপদাদার চষা জমি। আমার মায়ের মতন সেটি। আচাক্কা কহে দিলেক তুকে চাষ কইরতে দিব নাই? তুমি কি জাইনবে

জমির মায়া! কুনও দিন এক মুঠা মাটি হাতে করি ছুঁও নাই? তুমি জান খালি জমির পয়সা। আর সকল লোকের মাঝে রোহিণের আগে আমাকে কহে দিচ্ছ ভাগে দিব নাই? তো রাগ উইঠবে নাই মাথাতে? হামিও কহে দিলি পাঁচ লোকের মাঝে—জমি অন্যকে ভাগে দিবে তো তুমার মাথাটি আমি কাটে ফেলাব।

তখনও জানেনি যে সত্যিই পরদিন সকালে গিয়ে দেখবে অন্য গাঁয়ের অচেনা লোক হাল নামিয়েছে সেখানে। হনহন করে মহাজনের বাড়িতে ফিরে যেতে গিয়ে দেখা। মাঝপথে একটি ছোট কালভার্টের উপর। সে বুঝি জমির দিকেই আসছিল। হেসে বলেছিল, কেন রে, জমি অন্যকে দিলে নাকি আমার মাথাটি কাইটে লিবি তু? জমি কি তোর বাপের? জমি আমার।

আর কিছু সে বলত কি না জানা গেল না। এ পর্যন্ত ভাগচাষী থাকা লোকটির হাতের লাঠি তার মাথায় নেমে এসেছিল দিক্‌শূন্য ক্রোধে। কিন্তু তারপরই একটা লোককে মেরে ফেলার ভয় ও পাপবোধে সে আক্রান্ত হয়। দূরের সেই গ্রামে থেকে সেই লাঠি হাতে হেঁটে কয়েক ক্রোশ আসে সে—সদর থানায়। এজাহার দেয়। তারপর শুরু হয় তার নতুন জীবনের প্রক্রিয়া। খাতায় লিখে নেওয়ার পরই তাকে খুব একচোট মারে পুলিশ আর শুনিয়ে দেয় তার অবশ্যম্ভাবী ফাঁসির খবর।

মৃত্যুকে স্থিরভাবে প্রত্যক্ষ জেনে তো ভয় পেয়েছিলেন আত্মবলিদানে উদ্যত শুনঃশেপও। আমাদের এই ভূতপূর্ব ভাগচাষীটিও সুতরাং ভয় পায়। ছাড়া পেতে চায় হাড়িকাঠ থেকে। দারোগা বলেন, দশ হাজার টাকা এনে দিলে কেস মকুব হয়ে যাবে তার। কোর্ট জেল, ফাঁসি কিছুই হবে না। আর না হলে—

কিন্তু দশ হাজার টাকা যে দেখতে কেমন তাই বা কে জানে! সে হদিসও বাতলে দেয় পুলিশ। হ্যাঁ, থানার পুলিশই। গঞ্জের কাঠের ব্যবসায়ীর গদিতে কেনাবেচা হয় কত কত টাকার, সে আর কেউ না জানলেও তাদের তো জানতেই হয়। সন্ধেবেলা যখন ক্যাশ গুটিয়ে নিয়ে গদি থেকে বেরোয়—একটা লাঠির বাড়ি খেলেই তো পড়ে যাবে। চেঁচাতেও পারবে না।

দশ হাজার টাকা এল। ফাঁসির দড়ি থেকে এবার তো বাঁচল গলা! কিন্তু ডাকাতির দায়? লোককে জখম করা ছাড়াও দশ হাজার টাকার শোকে পাগল ব্যবসায়ী যদি একবার কোনোরকমে জানতে পারে!

সে-ই চক্রের শুরু। ডাকাতি, রাহাজানি, ট্রাকে ছিনতাই, খুন। একটা কেস থেকে বাঁচবার জন্য থানাকে টাকা দেওয়া, সেই টাকা জোগাড়ের জন্য

আবার নতুন অপরাধ। পরে আর পুলিশকে হদিস বাতলে দিতেও হত না।

দল তৈরি হল ধীরে ধীরে। ঘরবাড়ি গেল। পরিবার-পরিজন ছিল না—হওয়ার কথা ছিল, হয়ে ওঠেনি। কত বছর পার হয়ে গেছে ! ভূতের মতো, প্রেতছায়ার মতো কেবল গ্রাম থেকে গ্রামে, মাঠে শ্মশানে, ভাঙা মন্দিরে ঘুরে ফেরা, দিনের আলো থেকে মুখ লুকিয়ে। পুলিশের ভয়ে, থানার ভয়ে, ফাঁসির দড়ির ভয়ে। 'এ বিটি উ মন্দিরের ভিতরে যে আছে। তার কিরা—একটি জিনিসের সাধ হয় মনে এখন, নিজের ঘরটিতে বইসে একদিন দুবেলা গরম ভাত খাব। নুন দিয়া ফেনভাত লয়, শুকনা গরম ভাত দুবেলা খাব—লাল হয়ে ওঠা চোখ ফেটে কঠিন চোখের জল, দুটি একটি ফোঁটা গড়িয়ে নামছে গালের ফাটল বেয়ে। কাঁচাপাকা চুলে ভরা মাথাটি নুয়ে এসেছে মাটির দিকে।

খানিক পরে তার মনে হয়েছিল সামনে বসে থাকা মেয়েটিকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব তারই। এরা কী বা জানে পালিয়ে থাকার ! তার সঙ্গে খুব দূরে সাধুর ডেরায় যেখানে 'সাতজন্মেও কেউ খুঁজে পাবে না' যেতে সম্মত না হওয়ায় অভিমানই হয় তার, যতক্ষণ না বুঝিয়ে বলতে পারি পালিয়ে দূরে থাকা আর জেলখানায় থাকা কেন একই রকম আমাদের কাছে।

সঙ্গী এসে পড়ার আগে জোড় পার হয়ে চলে যাচ্ছে মানুষটি। ক্লান্ত। নিজের সব কথা বলে ফেলে আর চুপ করে বসে থেকে আবার ঢুকে যাচ্ছে তার নিজস্ব আড়ালে।

বরদা মায়ের ভাগের খাটনিটা রোজই করে দেয় যে কমলাদি, তাকে দেখে অনেকদিন পর্যন্ত খেয়াল হয়নি, যে এখানে কেউ কেবল অন্যকে সাহায্য করার জন্য, নিকিয়ে মুছে চারদিক তকতকে করে রাখার জন্য, সকালে গলায় আঁচল দিয়ে সূর্যপ্রণাম করার জন্য আসে না। এখানে যারা থাকে তারা সবাই অপরাধী, প্রমাণিত অপরাধী। সামাজিক স্বাস্থ্যের পোকা বাছাই করে তাদের এখানে রাখা হয়েছে। তার ওপর কমলা লাইফার। ৩০২ ধারায় ঠাণ্ডা মাথায় ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার দোষে দোষী। শান্তা কমলাদির মা হয়েছে। ম্লান বিষণ্ণ মুখখানায় হাসি ফোটাবার জন্য কি কাণ্ড যে করে মেয়েটা ! মেয়ের জন্য বর আনবে, তার মস্ত ভুঁড়ি থাকলে হাঁটবে কী করে, সেটা দেখাতে গিয়ে, ওই ছোট্ট চেহারায় একটা আস্ত কম্বলকে পেটের ওপর বেঁধে, হাঁটতে গিয়ে পড়েছে উল্টে। সবাই হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে। কমলামাসিও হাসে একটুখানি। ওর আবার বর। পনেরো বছরে বিয়ে হয়ে, সতরো বছরে বিধবা। মা যায় পাঁচবাড়ি ধান ভানতে, চাল ঝেড়ে দিতে। যা আয় হয়,

তাতে দুটো মানুষের পেটে একবেলার খাওয়াও জোটে না। বুঝে শুনেও বাঘের মুখেই ঠেলে দিতে হয় অঠোরো বছরের বড় শান্ত, বাধ্য মেয়েটাকে, বড় বাড়ির কর্তা যখন উঠোন গোয়াল পরিষ্কার করার কাজে কমলাকে পাঠিয়ে দিতে বলেন। সেই মেজকর্তা যিনি বিধবা মেয়ের গর্ভধারণের অপরাধে গ্রাম থেকে উঠে গিয়ে গঞ্জে ঘর ভাড়া নেবার হুমকি দিলেন বলে, তাঁরই বীজের সন্তানটি জন্মানো মাত্র মুখে চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছিল কমলাদি। যে মেজকর্তা বাচ্চা খুনের মামলা চলাকালীন বেশ পৌরুষের অহঙ্কার নিয়েই আদালতে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, আসামীর কাঠগড়ায় নতমুখ কমলাদিকে দেখেছেন। খুন যে কমলাদির হাত দিয়েই হয়েছে, তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। গতবছর মরে গেছে কমলার মা। মনে আছে অন্যপ্রান্তের আর একটি ছোট কমলার কথা। কখনও চোখে দেখিনি তাকে।

একটি তরুণ ছেলে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে থেকে কাজ করতে গেল। মাসখানেক পর একবার এল। একথা-সেকথা রিপোর্টিং-এর পর ইতস্তত করে জানাল তার সমস্যা—একটি মেয়েকে যদি গ্রাম থেকে নিয়ে আসে, তাকে শহরের শ্রমিক-বস্তিতে আশ্রয় দেওয়া যাবে?

প্রথমেই রেগে গেলাম। কোনও কিছু না শুনেই বকলাম খুব। রোমান্টিকতা করার ইচ্ছা থাকলে পাড়া ছেড়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে আসবার কী দরকার ছিল! কাজের জায়গায় এইসব সস্তা রোমান্স, তারপরে আবার সে মেয়েকে নিয়ে গ্রাম থেকে পালিয়ে আসা— ! এটা কোনো পিকনিক পার্টি নয়, সে কথা মনে রাখতে হবে।

সাথীটি বিনা প্রতিবাদে চুপ করে সব কথা শুনল। আমার কথা শেষ হওয়ার পর নিজের বক্তব্যের বাকি অংশটুকু শেষ করল। এই মেয়েটির মায়ের মরণাপন্ন অসুখের সময় এর বাবা গ্রামের মহাজনের কাছ থেকে গোটাকতক পায়রা চেয়েছিল বৌকে পুষ্টিকর পথ্য দিয়ে তাড়াতাড়ি সারিয়ে তুলবে ভেবে। মহাজন অবলীলায়, উদারভাবে দশটা কবুতর নিয়ে যাবার অনুমতি দেয় তাকে। বৌ অবশ্য বাঁচেনি পায়রার মাংস খেয়েও। দশ বছর পর যখন মেয়েটির বয়স চোদ্দ-পনেরো, তখন মহাজন হঠাৎ চাষীকে ডেকে পাঠিয়ে দশ বছর আগে নেওয়া কবুতরের দাম শোধ করে দিতে বলে। তার মধ্যে সেই দশটি পাখির গত দশ বছরে বর্ধিত বংশক্রমের হিসাব ধরা ছিল। এটা গল্পকথা নয়, এই পোড়া জেলায় বহু জমিখণ্ড পায়রাচালি, পায়রাজোত, ভুজাভাঙা এইসব নামে এরকম বহু ঘটনার সাক্ষী আছে। সেই কয়েক শত পায়রার মহাজন নির্ধারিত দাম দেওয়া চাষীর সাধ্য ছিল না। থাকবে না

সে কথা মহাজনও জানত। অকারণ দশ বছর পর হঠাৎ পায়রার দাম চায়নি সে। যে দাম চাষীর ঘরে আছে, তা-ই চাইল মহাজন — বেগার খাটতে যেন পাঠিয়ে দেয় চাষীর মেয়েকে। পনেরো বছর বয়সের সাধ্য যতরকম খাটনি হতে পারে সবকিছুই বেগারে খাটবার জন্য মা-মরা, যত্নে বড় করা মেয়েকে মহাজনের ঘরে পৌঁছে দিয়ে এসে গলায় দড়ি দিয়ে মরে বেঁচেছিল বিনা জমিতে আজন্ম চাষ করে আসা সেই চাষী। ভাগ্য মেনে নিয়ে দুবেলা দুমুঠো উদয়াস্তেরও বেশি, অর্ধরাত্রি পর্যন্ত নিজেকে ক্ষয় করে যাওয়ার ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিল মেয়েটি। আজ প্রায় দুবছর ধরে। আমাদের সাথীটি ওখানে গ্রামের ভূমিহীন অতি দরিদ্র চাষীদের মধ্যে একটু একটু করে নিজের কথা বলতে শুরু করেছিল। তার মুখে প্রতিরোধের কথা শুনে, বাঁচবার গল্প শুনে, মহাজনের বাগাল মানে রাখাল এই ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করেছে, এই মেয়েটিকে কি তারা বাঁচাতে পারে? এখনই?

ভিতরটা কেঁপে গিয়েছিল।

বস্তির বিড়ি শ্রমিকদের জিজ্ঞেস করলাম। তাদের বাড়ির মেয়েরা বললেন, এটা কি শুধোবার কথা? যদি আমাদের একবেলা একমুঠো জোটে তারও জুটবে। এতগুলো মানুষের মধ্যে একটা পেট কি বাড়তি হয়?

সাথীটি ফিরে গেল।

তারপর প্রায় মাস দুই-তিন আমার সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। আমি নিজের অঞ্চলে আছি, শহরে এসে অন্যদের সঙ্গে কাজের কথা সেরে ফিরে গিয়েছে। এইটুকু শুনেছি আশপাশের গ্রামেও যাওয়া-আসা করছে সে।

প্রায় মাস তিনেক পর দেখা হতে তাকে জিজ্ঞেস করলাম সেই মেয়েটির কথা, যাকে নিয়ে আসবার কথা ছিল। বস্তির লোকেরাও ইতিমধ্যে খোঁজ নিয়েছেন তার।

চুপ করে রইল খানিক। তারপর শুনলাম। বাগালটির সঙ্গে তাকে কথা বলতে দু-একদিন দেখেছেন মহাজনগৃহিণী। তারপর কী যে হয়েছিল বাড়ির ভিতর, কেউ জানে না। গোয়ালের আড়া থেকে ঝুলছিল মেয়েটির গলায় দড়ি বাঁধা শীর্ণ দুঃখী দেহটি।

যে বড় ওয়ার্ডটায় কমলাদিরা থাকে, তারই একপাশ আলো করে বিরাজ করেন শ্রীমতী নীহারিকা দত্ত, ডিভিশান টু। কলেজ স্ট্রিট অঞ্চলের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের গৃহিণী। পরিবারটির বড়োত্বের কথা ওঁর মুখে শুনি আর ওঁর বড়োত্ব সামনে এসে দাঁড়ালে দেখতে পাই। এখানে আসবার পর, প্রথম দিন ওঁকে ভেবেছিলাম ওয়ার্ডার। ভুলভাঙার পরও বেশ ক'দিন আমায়

চা বিস্কুট খাইয়েছেন নিজের দলের লোক ভেবে। তারপর যখন দেখলেন শহরের মেয়েটির সঙ্গে এইসব 'নোংরা ছোটলোক' মেয়েদের ভারি ভাব। সে ডিভিশান প্রিজনার নয়, হতে চায় না এবং তার বাড়ি থেকে দামী জিনিসপত্র আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই, তখন হতাশ হয়ে পড়লেন। তাও কোনো রকমে চলছিল। মা অন্তপ্রাণ ভালোমানুষ ছেলেদের, নিজেদের বৈভবের, মেজ ছেলেকে ভুলিয়ে বিয়ে করা 'মন্দা চেহারার' অলক্ষণা বৌয়ের কথা শোনাতেন। যে বৌ ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেছে, শুধু ওঁদের বিপদে ফেলবার জন্য। কিন্তু পাঁচফুট সাতইঞ্চি লম্বা 'মন্দা চেহারার' মেয়েটিকে মেরে ফেলতে হলে, তাকে কতো মারতে হয়, এই কথা আমি একদিন জিজ্ঞেস করার পর থেকে আমার সঙ্গে আর কথা বলতেন না। আসলে ওঁর জাজমেন্ট কপিটা পড়বার পর মনে পড়েছিল যে কাগজে এবং সংলগ্ন অঞ্চলে, এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে যথেষ্ট হৈ চৈ হয়েছিল। বাংলাদেশের বধূরা তখনও এরকম সহজদাহ্য পদার্থের তালিকাভুক্ত হয়নি। সবিতা দত্ত নামে সেই মেয়েটির মৃতদেহ তিনতলার ছাদ থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হলে, পাড়ার লোকেদের বিক্ষোভে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। গা ঢাকা দিয়ে থাকা মাতাপুত্র পুরী বা ওরকম কোনো জায়গা থেকে গ্রেপ্তার হয়।

ডিভিশান-গর্বিতা মহিলার নাম বাসিন্দাদের মুখে মুখে 'ভিডিশান বুড়ি'র অপভ্রংশে 'বিভীষণ বুড়ি'। জেলে থাকার নানা রকম অসুবিধায় বিরক্ত মহিলা বাড়ি থেকে লেপ আনালেন পার্সেলে। সুপার সাপ্তাহিক রাউন্ডে এলে নাক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে পাঁচফোড়ন থেকে কাঁচকলা থেকে সোনামুগের ডাল পর্যন্ত যে ফর্দটি গড়গড়িয়ে পড়ে গিয়ে, কিছুই না পাবার অভিযোগ জানাতেন, তেমন ফর্দ আর গঞ্জনা স্বয়ং সুপার গৃহিণী কখনও দিয়েছেন কি না সন্দেহ! বিনা গঞ্জনাতেই অবশ্য প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু পেয়ে যেতেন রাজনৈতিক বন্দী এক ভূতপূর্ব এম এল এ। ধরা যাক তাঁর নাম মায়া চট্টোপাধ্যায়। আইন অমান্য করে, চার দিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন। যখন ওঁরা সকালে কোর্টে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হয়েছেন, তার মধ্যেই বিনোদার পাশের সেলটা ব্লিচিং ফিনাইলে ধুয়ে, ধুনো দিয়ে রাখা হল। খাট, সাদা চাদর-ঢাকা বিছানা, বড়ো বালতিতে বারান্দায় রাখা হাতমুখ ধোবার জল এসে গেল। পুরনো মেয়েদের কাছে শোনা গেল, আগে নাকি শীতকালে আরও বেশি বেশি সংখ্যায় রাজবন্দীরা আসতেন। জেল কর্তৃপক্ষ তাদের চটি থেকে গরমপোশাক পর্যন্ত করজোড়ে বন্দোবস্ত করতেন। যাহোক, মায়াদেবী যে কটা দিন থাকবেন চারজন মেয়ে তাঁর ফাইফরমাশ খেটে দেবার

জন্য এই বারান্দায় হামেহাল হাজির থাকবে। আমার সঙ্গেও একবার কথা বলতে এলেন মহিলা। বললেন যে এভাবে কাউকে বন্ধ করে রাখা খুব অন্যায়। আমার যে শাসকবর্গের কাছ থেকে যতোটা সম্ভব সুবিধা ছিনিয়ে নেওয়া অর্থাৎ ডিভিশান ওয়ান নেওয়া, কৌশলগত ভাবেই উচিত, সে পরামর্শও দিলেন। সম্ভবত সেই যতদূর সম্ভব ছিনিয়ে নেবার ফলেই ওঁর খাবার আসত বাইরের ডিভিশান ওয়ান কিচেন থেকে। আর দুপুরের আহারের পর ওঁকে শীতের রোদে সতরঞ্চি পেতে শুয়ে পড়তে হত। হানিফা আর ইতোয়ারী পেটে তেলজল মালিশ করত। তবে অস্বীকার করব না, ভদ্রমহিলা একদিন আমায় একপ্লেট ক্রিম বিস্কুট দিয়েছিলেন, এবং আমি নিলাম। আমার ভজাকাকা, পুষ্প, খুকুমণি, মালা এরা কোনোদিন ক্রিমবিস্কুট চোখেই দেখেনি।

দু'বছর পেরিয়ে গেছে হাসপাতাল থেকে ফেরার পর, পুষ্প একটু একটু হাঁটে। আর আমার ওপর নিজের অধিকারটা খুব ভালো বোঝে।

আমাকে তুই ভালোবাতিত না? আমি তোল মেয়ে না?

শেষ কথাটা ওকে ডাক্তারবাবু শিখিয়েছেন।

আর এই তো খুকুমণি! পুষ্প নেইয়াকে ফেল পড়িয়েছে মেয়ে। জেলার সুপারিন্টেন্ডেন্ট রাউন্ডে আসছেন। খুকুমণি তার স্বস্থানে অর্থাৎ আমার সেলের দরজায় হেলান দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত। জেলার জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই, পুষ্প নেইয়া ছুটে আসে আর প্রায় ছুটেই ফিরে যায়। ছোঁয়া মাত্র 'ওলে-মাচ্চেলে' করে এমন চিল চেঁচিয়েছে, যে সুপারের হাসির মত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে। ওর জায়গা পাকা হয়ে যায় সেই হাসির প্রশ্রয়ে। রাউন্ডের পরে ওর মাকে বকে লাভ নেই। তার মার্কা নেই। দুইবাচ্চা নিয়ে বাংলাদেশ থেকে আসা বৌ মানুষটি এমনিতেই সদা জড়োসড়ো। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছিল। ও আন্ডার ট্রায়াল। আর তাছাড়া মাকে থোড়াই কেয়ার করে ওই মেয়ে। তুলতুলে গা ছুঁই গরাদের ফাঁক দিয়ে। আমার এই পশ্চিমমুখী সেলের দরজায় সারাদিন শুয়ে থেকে গরমে মাথা ভরে যায় ঘামাচিতে। নিতান্ত লক আপের সময়ে ওর মা নিয়ে যায় টেনে। রোজই সকালে এসে বলে, রাত্রে ঘুমোবার আগে পর্যন্ত সেলের দিকে মুখ করে বসে 'মাচ্চে লে' বলে ক্রমাগত কাঁদে। মাসি টাসি নয়। ও আমাকে ডাকে সোজাসুজি নাম ধরে। হঠাৎ কোথা থেকে দৌড়ে আসে,

—আমি নক্কি মেয়ে?

প্রশ্নটার অবশ্যম্ভাবী অর্থ হল কোথাও কোন একটা নষ্টামি করে এসেছে। হ্যাঁ মাগো তুমি লক্ষ্মী মেয়ে। লক্ষ্মী মা তুই, এখানে কেন গো? কোলো

ঘরের উঠোনে না খেলে ?

হানিফা বলে একটি নতুন সাজা পাওয়া মেয়ে এসেছে। তাকে প্রথম দেখলাম একটা অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে দিয়ে। আমগাছে নাকি একটা সাপ উঠছিল। পুষ্প নেইয়ার লাঠি টেনে নিয়ে, একটি মেয়ে সেটা মেরেছে। এরকম দুর্জয় সাহস কার হতে পারে বুঝতে পারলিাম না। সাপ মারা তো সাহসের কাজ বটেই। কিন্তু পুষ্প নেইয়ার হাত থেকে লাঠি টেনে নেওয়া ! তারপর স্বয়ং পুষ্প নেইয়ার আবির্ভাব, মেয়েদের কিচিরিমিচিরের মধ্যে। হ্যাঁ হেম্মত আছে ও মেয়ের ! নিমেষের মদ্যে মাথাটা থেতুঁলে দিয়েচে গো ! এর মার্কা দিতেই হবে—অ্যাট্টকুন মেয়ে বিশবছরী—ও মার্কা না পেলে কি চলবে' ? দেখলাম সেই 'অ্যাতটুকুন মেয়ে বিশবছরী'কে। বছর আঠেরো-উনিশের দপ্‌দপে চেহারা, ঘনকালো চুলের ঝাঁকের তলায় ছোট্ট কপালে ঘনকালো জোড়া ভ্রূ আর ছোট ছোট কিন্তু ঝকঝকে চোখ। বিশবছরী ! হিম হয়ে যায় ভিতরটা। কিন্তু ভাবনার সময় পাই না। পুষ্প নেইয়ার বক্তব্য ডাক্তারবাবুকে হানিফার টিকিটে লিখে দিতে হবে যে, একটা বিষধর সাপ মেরেছে। নিয়মানুযায়ী নাকি বিষধর সাপ মারলে সাত দিন মার্কা পাওয়া যায়। নিশ্চয়ই বলব ডাক্তারকে।

ডাক্তার একবার মৃদু হেসে কেবল জিজ্ঞেস করেন, বিষধর ছিল তো সত্যি ?

বিষধর কি না সে তো মেরে ফেলার পর দেখা যায়। সাপ মেরেছে সাহস করে, এটাই কি আসল কথা নয় ?

আচ্ছা আচ্ছা বেশ !

কিন্তু সে মেয়ের সাহস্র আছে দেখা গেল অন্য বিষয়েও। নিজের খাটনি করার ফাঁকে নাকি কান্তু-বিন্দুকে ভাত মেখে খাইয়ে দিচ্ছিল। ওয়ার্ডারের তির্যক মন্তব্যের জবাবে ফুঁসে উঠেছে,

নাই বা নিজের পেটের হলো। খাওয়ালে কিছু দোষ আছে। সকলে কি তোমার মত বাঁজা, যে ছেলেপেলের দরদ জানেনি ? এমন মার খেয়েছে ঠোঁট কপাল ফাটা। হাঁটুটা সাতদিন পরেও বীভৎস ফোলা। ডাক্তার কোনো মন্তব্য করতে চাইলেন না। কিন্তু মনে হল আমার সঙ্গে উনিও একমত, যে হাঁটুর জখমটা পাকাপাকি হয়েছে। জেলারের কাছে আমি ব্যাপারটা জানাবো ঠিক করেছি। কিন্তু হানিফা নিজেই আমার হাত ধরল। ইতিমধ্যেই সিস্টারের ঘটনাটা শুনেছে। এই যন্ত্রণা সহ্য হবে কিন্তু সে অসম্মান ! তাহলে ও গলায় দড়ি দেবে।

আজকে সেই খোঁড়ানো চলনেই প্রায় ছুটে খবর দিয়ে যায় হানিফা, দিদি

আবার মালতী এসেছে। মালতী আবারই আসে। বারবার ! জড়বুদ্ধি। চেহারাতেও জান্তব বিকৃতির ছাপ। রিপু বলতে শুধু লোভ, খাবার লোভ। তবু ও জন্তু নয়। ওর শরীরও নারী বলে প্রতিভাত হয়। কোর্টে ঢুকে গণ্ডগোল করার দায়ে আসে বারবার। প্রায় প্রতিবারই অন্তঃসত্বা। গতবার মাস আষ্টেক আগে এসেছিল ছোট্ট ফরসা ছেলে কোলে। সারাদিন মানিকচাঁদকে আদর করত, কোলে ফেলে বিচিত্র স্বরে গান গাইত। সত্যিকারের যে কোন মা ! এবারও পা ঘষে ঘষে এসে দাঁড়াল সেলের সামনে। সেই একই চেহারা। জন্তুর মত মুখে নির্বোধ হাসি। শরীরে মানুষদের লোভের ক্লিন্ন ভার। জিজ্ঞেস করি, মানিকচাঁদ কই মালতী ?

ভাবতেই পারিনি আধফরসা মুখ এমন কুঁচকে মালতী হঠাৎ কেঁদে ফেলবে। চা মিষ্টির দোকানে বারে বারে বিরক্ত করছিল বলে, গায়ে গরম জল ঢেলে দিয়েছিল। ও তো ঠিক মানুষ নয় !

মানিকচান্দ মইরা গেছে দিদি গো। হানিফা পুষ্প নেইয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করে ফেলার ভয়ে, বকতে বকতে আসছিল।

আবার এখানে চেঁচাচ্ছিস মালতী ?

হঠাৎ সুন্দর দীপ্ত মুখখানা ঠিক মালতীর মতই কুঁচকে উঠে বেঁকে যায়। মুখ ঢেকে ডুকরে ওঠে হানিফা। ওর জায়ের ছেলে টলোমলো পায়ে পিছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে, কাঁধের ওপর দিয়ে টপ্‌কে, গুড় জ্বাল দেবার ফুটন্ত কড়ায় পড়ে গিয়েছিল। শরিকী ঝগড়া তার নিজের পথে বেঁকেছে। কিন্তু জেলের পাঁচিলও হানিফার শোককে প্রশমিত করতে পারেনি।

হায় গো দিদি, সে যে মোর জাহান ছিল গো চাচী বিনু যে জাইন্‌ত নাই।

মালতী হানিফার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমি দেখি। ওরা দুজনেই আমার সেল থেকে প্রায় দুহাত দূরে।

দিনগুলি ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে। চব্বিশে ফেব্রুয়ারি জেল কর্তৃপক্ষ বিনা কারণে, বিনা প্ররোচনায় সাতজনকে হত্যা করেছে। গুলির শব্দে পাছে বাইরে জানাজানি হয়, তাই বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয় তাদের। তার মধ্যে সতের বছরের বালক গোরা ছিল। যে খুন হয়, তার নিরুপায় দাদার চোখের সামনে। সেলের বন্ধ এত কড়াকড়ি, যে আমি পুরো ঘটনাটা বিন্দুমাত্র জানতে পারিনি। অন্তত কুড়ি বাইশ-দিনের আগে। মায়ের পাঠানো কি একটা জিনিস এলো। পার্সেলে জড়ানো খবরের কাগজে বহরমপুর জেলের ঘটনা সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের টুকরো দেখে, ওয়ার্ডারদের পাথুরে নীরবতা, ডাক্তার

বা বিমলাভাবীর আমার সেলে না আসা সমস্ত কিছু এখন নিছক কড়াকড়ি ছাড়াও অন্য অর্থ নিয়ে প্রতীয়মান হয়। কী হয়েছে, একথা জানবার জন্য, সাথীদের জন্য, এক অনির্দিষ্ট আতঙ্ক আমার গলা চেপে ধরে। একমাত্র যা অস্ত্র ছিল মরিয়া হয়ে তারই সাহায্য নিতে হয়। সেল পরিস্কার করার জন্য ঝাড়ুদার ঢুকলে, আমার বাইরে এসে দাঁড়ানোর নিয়ম। সেদিন সব চেঁচামিচি অগ্রাহ্য করে বারান্দা থেকে নেমে সোজা বাগানে গিয়ে দাঁড়াই। সুপার না এলে বন্ধ হবো না, তাঁর সঙ্গে আমার দরকার আছে এই কথা জানিয়ে। সুপার এলেন না। বেলা দুটো নাগাদ সমস্ত মেয়েদের লক আপে বন্ধ করে দেওয়া হল। বিমলা ভাবী অনেক বার বলেছিল—

আপনি আজকে কথা শুনুন, চলে যান!

ওয়ার্ড বন্ধ হয়ে যাবার পর হেড ওয়ার্ডার আসে জনা পনেরো সিপাই নিয়ে। ফিমেল ওয়ার্ডের ওয়ার্ডার তো ছিলই। সেদিন অনেক রাত্রে আমার জ্ঞান ফেরে সাঁঈদার অন্ধকার সেলে। শুধু হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা মোটা শেমিজটা গায়ে আছে। শাড়ি ছিঁড়ে টুকরো হয়ে কে জানে কোথায় চলে গেছে! মাথা খানিকটা স্বাভাবিক হলে উঠে বসি। কিছু সময় বাদে কী জানি কোথায় পেটা ঘড়িতে এগারোটার ঘন্টা পড়ে। মিনিট পরে অন্য একটা ঘড়িতে আবার এগারোটা। তারপর জেল গেটের ঘড়িতে। এমনি ক'রে পাঁচবার রাত্রির নিস্তব্ধ বাতাসে ঘন্টার রেশটুকু অনেকক্ষণ কেঁপে কেঁপে ওঠে। মনে আছে সেই সময়েও এই কথাটা মনে করে আশ্চর্য হয়েছিলাম যে, এই পাঁচটা ঘন্টার মধ্যবর্তী সময়ের সমস্তটাই কি এগারোটা বাজছিল! সময় কি থেমেছিল!

সকালে কখন মেট্রন এসেছে, সঙ্গে আজ সেই বৈষ্ণবী ওয়ার্ডার ছাড়াও দুজন সেপাই। হাতে হ্যান্ডকাফ দিল। এদের সামনে লজ্জা পাবার প্রশ্ন ওঠে না কিন্তু ডাক্তার দের সামনে যেতে একবার সংকোচ হল। এরা বোধহয় সেই কাতরতাটুকুই দেখতে চায় নাহলে পাগলদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবার সময় কাপড় জড়িয়ে মাথায় ঢাকা দেয়, আমাকে একটা শাড়ি দিল না কেন, এই ভাবনা কাঁধকে সোজা করে দেয়। আর বৃদ্ধ ডাক্তারটির মুখ বিবর্ণ দেখায়। একবারও জিগেস করেন না কোথায় আঘাত। চোখ নামিয়ে ওষুধ লাগাতে লাগাতে কেবল অস্ফুট গলায় বলেন,

—বড় অশ্রদ্ধা হয় নিজের ওপর।

দুদিন পর সুপার এলেন সেপাই পরিবৃত হয়ে। নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলেন, কিছু আন্ডারট্রায়াল ছেলে সিপাইদের আক্রমণ করলে, দেয়ার ওয়জ এ স্কারমিশ, অ্যান্ড আনফরচুনেটলি সাম অব দ্য বয়েজ গট কিল্‌ড।

স্কারমিশ ! লকআপে বন্ধ, খালিহাত ছেলেদের সঙ্গে লাঠি বেয়নেটে সজ্জিত সিপাইদের ! আনফরচুনেটলি গট কিল্‌ড—ব্যস্‌ ! কেন তবে ফুলমালা, বরদা-মা, কমলাদি ? কেন বৃথা— ? যদি এমন মসৃণ 'আনফরচুনেটলি গট কিলড়্' ?

জেলার, সুপারিন্টেন্ডেন্ট বদলি হয়ে গিয়েছেন। সেই তরুণ ডেপুটি জেলারটি চাকরি ছেড়ে চলে যাবার আগে দেখা করে গেলেন। ডাক্তার দে মাঝে মাঝেই অসুস্থ থাকেন। অন্য ডাক্তার আসেন তাঁর জায়গায়। ফিমেল ওয়ার্ডের যে একটিমাত্র ওয়ার্ডারকে সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার করতে দেখতাম, তার পারতপক্ষে আমার সেলের দিকে ডিউটি থাকে না। এই মহিলাটি সমস্তক্ষণ কমবয়সী মেয়েদের পেছনে লাগে আর এত হাসে যে ওর নাম দিয়েছি হাসি। সেদিন সন্ধ্যায় ওর ডিউটি ছিল। একবারও কারো সামনে আমাকে বলতে আসেনি লক্‌-আপে ঢুকে পড়বার জন্য। ওরা বোধহয় শুরু থেকেই জানত ওদের কী করতে হবে, তাই এড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। তারপর একদিনই মাত্র দুপুরে ওর ডিউটি পড়েছিল এই দিকের ওয়ার্ডে। কালি মুখ করে এসে দাঁড়িয়েছিল জেলের দরজা ঘেঁষে, জানো, সেদিন আমি ঠিক করেছিলাম চাকরি ছেড়ে দেব। এরচেয়ে বরং ভিক্ষে করে খাব। বলতে গিয়ে খুব ম্লান হেসেছিল। কিন্তু তিনটে ছেলেমেয়ে একটা অথর্ব রুগ্‌ণ লোককে বাঁচিয়ে রাখা যাবে এমন দাম কি এই গতরের আছে ? তারপর একটু থেমে, সেদিন আমার হাতের চুড়িতে লম্বা চুল লেগে ছিল, পোশাকে রক্তের দাগ ছিল কার চুল শুনে আমার ছেলে মেয়ে আমার হাতে ভাত খেল না, জানো ? সেদিন আমরা কেউ খাইনি। রাতে বাড়িতে আলোও জ্বালিনি। আমার মেয়ে সারারাত কেঁদেছে।

খবরের কাগজ সম্পূর্ণ বন্ধ। বাংলাদেশে যুদ্ধ চলছে। তার উড়ে উড়ো গুজব শুনি। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি সমস্ত পৃথিবী থেকে। আমি যে বেঁচে আছি একথা অন্যরা কেন, আমি নিজেই যেন বা ভুলে যাচ্ছি মাঝে মাঝে। কোনো যোগাযোগ করতে পারছি না কারুর সাথে। কী করব সে কথা চিন্তা করছি। এর মধ্যে দুটো নতুন ঘটনা ঘটল। বাংলাদেশের যুদ্ধের POW প্রায় দেড়শ মহিলাকে গোটা চল্লিশ কাচ্চাবাচ্চা সমেত, একদিন এই ওয়ার্ডে ভরে দেওয়া হল। একটা বড় ওয়ার্ড ঘর খালি করে দিতে হল তাদের জন্য। ওয়ার্ডার, মেট্রন, মেটরা সকলেই দিশেহারা—এতগুলো বাসিন্দা বেড়ে গেল। থাকার জায়গা, জল, পায়খানা সব কিছুরই প্রচণ্ড সমস্যা। দ্বিতীয় ঘটনাটা প্রায় ব্যক্তিগত। বমির সঙ্গে অনেকখানি রক্ত উঠে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান ফিরে সেলের মধ্যে একসঙ্গে বিমলাভাবী, ডাক্তার

দে, এ পর্যন্ত অপরিচিত নতুন জেলার আর ওয়ার্ডারকে একসঙ্গে হাজির দেখে বিব্রত। ডাক্তারের মুখ গম্ভীর। তুলে হাসপাতালে নিয়ে শোয়ানো হল। রাত্রি সাড়ে আটটায় ঘন্টি বাজিয়ে হঠাৎ জেলার আবার ভেতরে এলেন। মেট্রনকে সঙ্গে করে। ওয়ার্ডারদের সামনে আমাকে বলে গেলেন— আপনি যতো দিন না সুস্থ হচ্ছেন, হসপিটালে থাকবেন। এখানকার মেট আপনার দায়িত্বে থাকবে। কিন্তু ঘরের বাইরে বেরোবেন না। হসপিটালের মেট মানে বিমলাভাবী। অত্যন্ত বুদ্ধিমান নতুন লোকটি।

বলার প্রয়োজন বিশেষ ছিল না। কয়েকদিন বিছানাতেও উঠে বসা সহজ হয়নি। লিকুইড ডায়েট। শুনলাম ডাক্তার এক্‌স-রে করানোর কথা বলেছিলেন—স্পেশাল ব্রাঞ্চ-এর কর্তারা অরাজি। কিন্তু কদিনেই ধীরে ধীরে খাট থেকে নেমে দরজার কাছে এসে বসি। বিমলাভাবীর কাছে রোজই শুনছিলাম যে পাকিস্তান (বাংলাদেশ নাম তখনো ভেতরে আসেনি) থেকে আসা এই মেয়েরা খুব নোংরা স্বভাবের। কারো কোনো কথা বোঝে না। ভাবী একা ওদের সঙ্গে বকে বকে হয়রান হয়ে যাচ্ছে। এবার চোখে দেখলাম। যে মাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যে আমি এক আধটু হিন্দি বুঝতে, বলতে পারি, নবাগত এই মেয়েরা দলবেঁধে এসে হাজির হচ্ছে— ডাক্তারের কাছে ওষুধ চাই, সঙ্গের জিনিসপত্র কোথায় চলে গেছে, জেল গেটে জমা নিয়ে নিয়েছিল, সেগুলো ফেরত চাই। সর্বোপরি, সকলের পায়ে পড়ছে, কারুর স্বামী, ভাই কোথায় ছিটকে গেছে। কোথায় আছে তার খোঁজ এনে দাও। একটা ব্যাপার বুঝে আমি প্রথম অবাক হই—এরা পাকিস্তানি POW। কিন্তু এরা মোটেই খানসেনা (যা এদের বলা হচ্ছে) অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানি নয়। এরা বিহারি মুসলমান। বাড়ি প্রধানত আরা, অযোধ্যা, ছাপরা, বালিয়া। পুরুষরা পূর্ববাংলায় পুলিশ-মিলিটারির চাকরি করত। বন্দুক ভালো করে ধরবার আগেই ব্যারাক বন্দী হয়েছে, ভারতীয় সেনাদের হাতে। ছেলেরা ডিউটিপোস্টিং থেকে, কি ছাউনি থেকে। বাড়ির মেয়ে ও বাচ্চারা লাইন থেকে। এই মেয়ে বৌরা একেবারে সাধারণ অশিক্ষিত, পর্দানসীন মুসলিম মেয়ে বৌ। ঘরের বাইরেটা কেমন তাও জানত না। হঠাৎ এরকমভাবে জেলে এসে পড়ে, সর্বোপরি বাড়ির লোকজনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে, একেবারে উদ্‌ভ্রান্তের মত হয়ে গিয়েছে। বাচ্চারা ক্রমাগত অসুখে ভুগছে। জলের অপ্রতুলতা, অল্প লোকের জায়গায় দেড়শ-দুশো অতিরিক্ত লোক ঠেসে দেওয়া, সমস্ত মিলিয়ে যে অপরিষ্কার ও বিশৃঙ্খলা, তারজন্য সমস্ত দায়টা যে এদের, এমন ঠিক বলা যায় না। এদের মধ্যে আবার অন্তত পাঁচটি আসন্নপ্রসবা।

মাসখানেকের মধ্যেই অবশ্য দলে দলে এদের পুরুষ আত্মীয়রাও বিভিন্ন জায়গা থেকে, এই জেলেই চালান হয়ে এলো। গেটের কাছে পুরো দলটাকে ডেকে নিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়া হল। সম্মিলিত কণ্ঠের একটা প্রবল রকম কান্নাকাটির পর, আবার ফিরে আসা। কিছু কিছু পোশাক-আশাকও এলো। ফিরে এসে আবার কান্না। এবার কিন্তু ধীরে ধীরে তার সাথে যুক্ত হতে লাগল ঝগড়া। নিজেদের মধ্যে কে সেপাইয়ের বৌ ছিল, কে বা হাবিলদারের। কে নিজের সম্পদের মিথ্যে গল্প ফেনাচ্ছে। কার বাড়িতে রোজ গোশ্‌ত রান্না হত। এই সব নিয়ে ঝগড়া। এক একদিন সত্যি চুলোচুলি পর্যন্ত পৌঁছত। মেট্রন যেহেতু একবর্ণ হিন্দি বোঝে না এবং একমাত্র অবাঙালি ওয়ার্ডারটি অত্যন্ত রূঢ়ভাষিণী ও পুরো ওয়ার্ডে 'আনপপুলার' সেই শান্তার ঘটনার পর থেকে, সুতরাং শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা হাসপাতাল পর্যন্ত গড়িয়ে ভাবীর কাছে পৌঁছত। পাঁচটি শিশু জন্মাল এবং একটিও বাঁচল না। আমি বলব না যে কেউ ইচ্ছাপ্রসূতভাবে তাদের অবহেলা করেছিল। কিন্তু জেলের অন্যান্য বন্দীরা, বহরমপুর জেলে, পরস্পরের ব্যাপারে যতোখানি যত্ন নেয় তার খুবই অভাব ছিল। এই মেয়েদের প্রতি সকলেরই একটা বিরক্তি, উদাসীনতা এমনি চাপা বিদ্বেষের ভাব। একথার উল্লেখ আমি এজন্য করলাম যে, সাধারণ ভালোমানুষরাও সাম্প্রদায়িক বা যুদ্ধবাজ প্রচারে কতোখানি প্রভাবিত হয় তা তখন অতি স্পষ্ট দেখেছি। কেউ জানে না বাংলাদেশে কী হয়েছে। এরাই বা কারা, শুধু বাইরে থেকে যাঁরা আসা-যাওয়া করেন, তাঁদের মুখে ছড়ানো উড়ো গুজব আর উগ্র জাতীয়তাবাদী কথাবার্তা সাধারণ বন্দীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই POW-দের মধ্যে মাত্র একটি মেয়েকেই আমার আলাদা করে মনে আছে। তার নাম ছিল আনোয়ারা বেগম। বছর ত্রিশেক বয়স, শান্ত, খুব কম কথা বলত। তারও বাচ্চাটি ওই ভিড়ের ওয়ার্ডের মধ্যেই জন্মায় এবং মারা যায়। যেদিন বাচ্চাকে এই অপরিচিত মাটিতে গোর দেবার জন্য সে সিপাই পাহারার সামনে স্বামী ও বড় ছেলের হাতে তুলে দিয়ে এল, তারপর হাসপাতালের সামনে একটা কাঁঠালগাছের নিচে চুপ করে সারাদিন বসে রইল। ওদের মধ্যে একমাত্র সেই একটু-আধটু পড়তে জানত।

রমজান মাস চলছে, রোজা ভাঙবার পর ইফতারির জন্য বিকেলের শেষে রোজ একজগ করে জল মেশানো-সরবত আসছে আর একপ্লেট করে চিনি। রোজা রাখছে প্রায় পঁয়ত্রিশ জন। অবশ্য POW-রা নেই এই হিসেবের মধ্যে। ওদের ইফতারি আসছে আলাদা যদিও কোন ইতরবিশেষ নেই তার গুণে।

বিকেলের খাবারের সঙ্গে আসে একটা ছোট বালতিতে ভেজা ছোলা। সকালে সূর্য ওঠার আগে বন্ধ ওয়ার্ডের মধ্যে মুখ-হাত ধুয়ে ওই একমুঠো করে ছোলা চিবিয়েই রোজা শুরু হবে। মহক্কাদির মেয়ে সোনাভান একছর রোজা রেখেছে। মাজেদাদির বড় মেয়ে শাপেনুরও। মাজেদাদির সবচেয়ে ছোটমেয়ে, চারবছরের নাজনীন, যাকে বাব্‌লি বলে ডাকে, মায়ের কাছে একটু ধমক খেলেই চলে যায় বাগানে। একটা আমগাছের নিচে পা ছড়িয়ে বসে ফর্সা গোলমুখখানা ওপরদিকে তুলে চোখবন্ধ করে কাঁদবে 'ও গে আল্লাগে আমি আল্‌ পালি না — আমালে তুই নিয়া যা গে আল্লা'

আল্লাও কাঁদেন কি না ভাবি।

রক্তহীনতায় ওর কচি মুখখানা ফুলো ফুলো দেখায়।

মাসপাঁচেক পরে, যখন ওদের চালান যাবার হুকুম এলো তখন আবার সেই বিভ্রান্ত কান্নাকাটি। ওরা তো ভারতের লোক, বিহারি। দশ পনরো কি বিশ বছর আগে পূর্ব পাকিস্তান চলে গিয়েছিল। কিন্তু ভারত সরকার তো ওদের ফেরত নেবে না। ওদের ডিপোর্টেশান হবে পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানে ওরা কিছুই জানে না। না ভাষা, না জায়গা, না ভবিষ্যৎ।

আর এরই মধ্যে একদিন কবে ঈদ এসে পড়ল। রোজা শেষ হল। আগের দিন ছেলেদের ওয়ার্ড থেকে গেট পাহারার কাছে দিয়ে গেছে এতটুকু আতর লোবান, একমুঠো বাদাম আর ছোহরা। মাজেদা খাতুনের ছোট্ট মেয়ে শাপেনুর, উত্তেজনায় মুখ লাল করে, ফিস্‌ফিস্‌ করে খবরটা বলে দিয়ে উধাও।

সকালে কখন ওদের নাওয়া ধোয়া হয়েছে কী জানি। ব্যস্ত চলাফেরার আভাস পাচ্ছি একটু আধটু। বাগানে বোধ হয় জমায়েত হচ্ছে সবাই দোয়া পড়তে। হঠাৎ যেন সমুদ্রের শব্দের মত কিরকম হু হু করে ওঠা তীব্র আওয়াজ। গভীর, মোচড়ানো। প্রথমে অজানা আতঙ্কে চমকে উঠে দাঁড়িয়েছি। কী হচ্ছে ওখানে ? বুঝতে দেরি হয়নি তারপর। কিন্তু আশ্চর্য সবচেয়ে স্বাভাবিক যে শব্দ, তাকে চিনতে এই এক নিমেষ দেরি হল কেন ? সেকি শুধু এই জন্য যে, কান্নার স্বাভাবিক আওয়াজও ভুলে গেছি ! জোরে কাঁদা নিষেধ এখানে—সবাই দাঁত চিপে—ঠোঁট কামড়ে কাঁদে। আজ সেই বুকফাটা কেঁদে ওঠার স্বাধীনতাটুকু দিয়েছে খুশির ঈদ—বাবা-ভাই-সন্তান-পরিজন-প্রতিবেশী—ভেঙে দুমড়ে গুঁড়িয়ে যাওয়া সংসারের বদলে।

ধূ-ধূ নিঃশব্দ দুপুরের শেষ প্রান্তে এক ফাঁকে কাকা এল। ফ্যাকাশে মুখ, চোখদুটো লাল। হাতে গুঁজে দিল খেজুরের কুচিটুকু—কথা বলবার, হাসবার চেষ্টা করে, থর থর করে কেঁপে ওঠা ঠোঁট নিয়ে পালিয়ে গেল। চুপি চুপি

একে একে হাসিফা, মহকাদি, রমেজা-নানী, শাপেনুর—একমুঠো খোবানির গোটা পাঁচ-সাত কুচি তো আমার হাতেই জমে গিয়েছে! এখানে সমস্ত খাবারের স্বাদই বড় নোনা।

ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়া সংসারগুলি যেন, ছায়ার মতন পায়ে পায়ে লেগে, মজ্জার ভিতরে ভিতরে, আঙুলের মাথায় মাথায় চলে আসে এখানেও। রমেজা-নানীর বয়স ষাট কি তার বেশিই হবে। গোলাপী রঙের থাপুস থুপুস চেহারা। ধপধপে শাদা চুলে এখনও একটু কোঁকড়ানো ধাঁচ। দ্যাখো—সমস্ত সময় কি ব্যস্ত! খায় শুধু ডাল আর তরকারিটুকু। ভাত, সকালের ছোলাসেদ্ধ সব যত্ন করে ধুয়ে চৌবাচ্চার পাড়ে শানের ওপর মেলে দিয়ে দিয়ে, তাকে ঝনঝনে করে শুকোয়। দুপুরে লক আপের বাইরে থাকে বরদা-মা, রমেজা-নানী, সিধু মেঝেন, আর যোগমায়া মাসি—এই চার বুড়িতে। সেই খড়খড়ে শুকিয়ে যাওয়া ভাত আর ছোলার কাক তাড়াতে, সারাটা দিন গাছের নিচে পা মেলে, হাতে একটা ভাঙা ডালের কাঠি নিয়ে বসে কি নানী নিজের উঠোনের স্বপ্ন দেখে? ধান শুকোনোর গন্ধ পায়? হলুদ রোদ্দুরের ওম? সে মহামূল্য সম্পদ পুঁটলি বেঁধে রাখতে দেবার অনুগ্রহ করেছে পুষ্প নেইয়া। নানী এক একদিন পুষ্প নেইয়ার চুল বেছে দেয়, হাতে-পায়ে তেল মাখিয়ে দেয়। নিজে এক দানাও খাবে না ওগুলো—হঠাৎ কোনোদিন সুবিধামতো পিছনদিকে কাঁঠালপাতা জ্বেলে থালায় করে ভাজবে—তারপর সব বাচ্চাদের হাতে হাতে দেবে সেই মুড়ি, চিঁড়ে, চালভাজার প্রক্সিটুকু। আমি একদিন চেয়ে খেয়েছি বলে, চিবুক ধরে চুমু খায় নানী—কোঁচকানো গালের আঁকাবাঁকা রেখা বেয়ে দ্রুত গড়িয়ে আসে চোখের জল।

যোগমায়াকে ফুলমালা মা বলে। মাঝে মাঝে বুড়িকে খেপায় দুধ খেতে চেয়ে। কী যে অদ্ভুত হাসি ফোটে দন্তহীন মুখখানিতে। 'কেন জ্বালাতন করিস—নাই দেখ্—সাচাই নাই—' যেন বা সত্যি থাকতে পারত দুধ ওর বুকে। আর থাকলে এগারোটা সন্তানের পরে, ফুলমালাকে কি দিত না! কাঁঠালগাছে এক আঙুল সমান কষি এসেছে, কাপড় আড়াল দিয়ে তাই একটা তুলে এনে ফুলমালাকে ভোলায় 'রাগ কৈস না ঝিটি—এইহান খা, লবণ দিয়া খা।'

আরেকজন না দেখা মায়ের কথা ভুলিনি।

গ্রেফতারের পর যে কদিন থানায় ছিলাম, প্রথম দু-চারদিন ছাড়া দিনের বেলা কর্তাদের বিশেষ দেখা পাওয়া যেত না। বিশ্রাম নিতেন বোধহয়। হেড অফিস থেকে কষ্ট করে এসেছিলেন সেই স্পেশাল টিম। খেলা শুরু

হত রাত্রি দশটার পর। কোনওদিন তিনটে কোনওদিন চারটে। সে অন্য বৃত্তান্ত। কিন্তু এই দুপুরগুলো কাটত না।

দিন পাঁচেক কেটে যাবার পর হঠাৎ একদিন একটা-দেড়টার ঝিমধরা দুপুরে লকআপের চাবি খোলার শব্দ পেয়ে মনে মনে শক্ত হয়ে যাই। আজ আবার নতুন কোনও 'বিশেষজ্ঞ' এসেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু দরজা খুলেছেন থানার ভারপ্রাপ্ত স্থানীয় অফিসার। এঁরা তো খুব একটা পাত্তা পাচ্ছেন না স্পেশাল ব্রাঞ্চের সামনে। আজ হঠাৎ কী হল?

লোকটির মুখটা ঈষৎ বিপন্ন, কাঁচুমাচু। এটার কারণ বুঝি। যা কিছুই করতে হোক ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, মহারথীরা তো চলে যাবেন, এঁদেরকে তো থাকতে হবে এই শহরেই। ইশারা করলেন কিন্তু প্রতিদিনের অভ্যস্ত কামরাটির দিকে নয়, অন্য একটি অফিসঘরের পিছনের দরজার দিকে। এই দুপুরে অফিসঘরে কেউই প্রায় নেই, জন দুই সিপাই বসে আমাদের দেখছে। পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেখি সেটা একটা খোলা জায়গা। ডানদিকে নির্দেশ করলেন অফিসারটি। থানার কম্পাউন্ড শেষ হয়ে একটা কোয়ার্টার। আবছা বুঝতে পারছি প্ল্যানটা। 'পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে থানা কম্পাউন্ডের বাইরে গুলিতে নিহত' হওয়া খুব নতুন নেই তখন আর। একটা সামান্য খটকা—এই দুপুরবেলায়?

ভেবে লাভ নেই। কিছু করার নেই যখন। কিন্তু কোয়ার্টারের ভিতরে ঢুকছি। তা হলে কি এটাই সি আর পি ব্যারাক? প্রথম রাত্রি থেকেই যেখানে আমাকে ফেলে আসার ভয় দেখানো হচ্ছিল? সামনে মোট কথা কেউ কোথাও নেই। এটা বাড়িটার খিড়কি দরজা। ঢুকে বাঁ পাশে ইশারা করছেন ভদ্রলোক—স্নান করে নিন। এটা কীরকম রসিকতা? মিঠেকড়া নানারকম চাল দেখা গিয়েছে এর মধ্যে, হ্যামলেটের চরিত্র আলোচনা থেকে শুরু করে—সে যাক। কিন্তু এটা যেন সে সবের থেকে আরও নতুন। না ভেবেই বা থাকা যায় কী করে! কীরকমের ফাঁদ এটা? বাথরুমের ওপাশে অন্য কোনও দরজা আছে, বাইরে থেকে খোলা যায়? ভিতরে অন্য কোনও লোক আছে? কিসের জন্য তৈরি থাকব?

অফিসারটি প্রায় অস্ফুট স্বরে আবার বলেছেন, তাড়াতাড়ি স্নান করে নিন। কিছু প্রশ্ন করতে পারছি না, ভয় পেয়েছি ভেবে যদি হাসে মনে মনে!

যা হয় হবে। জোর ঝট্‌কা দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। পাল্লাটা পিছনের দেওয়ালে গিয়ে পড়ল। ভিতরে অন্য কোনও দরজাও তো নেই!

সামনে বড় লোহার বালতিতে টলটলে ভর্তি জল, মোড়ক-খোলা সাবান, কাচা তোয়ালে। পাঁচদিন স্নান করিনি। আর কিছু না ভেবে আপাতত আরামে স্নান করলাম।

বেরিয়ে দেখি সামনে দাঁড়িয়েই আছেন অফিসার। একইরকম নৈর্ব্যক্তিক মৃদুস্বরে, চুলটা জড়িয়ে নিন দয়া করে, কাউকে কিছু বলবেন না। এবার সরাসরি মুখের দিকে তাকাই। থানার দিকে ফিরতে ফিরতে চোখ এড়িয়ে নিয়ে বলেন, 'আমরাও মানুষ, আমাদেরও মেয়ে-বোন আছে বাড়িতে।'

লক আপে বন্ধ আবার। যেন মাঝখানে কিছুই হয়নি। সিপাইরা কেউ কেউ সাক্ষী ছিল আমি নিজেই দেখেছি। কিন্তু চাপাই থেকে গেল ব্যাপারটা। বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল না নিজের কাছেই।

এখন কিন্তু প্রায়ই মনে পড়ে মানুষটিকে। আর দুজন না-দেখা মানুষকেও। তাঁদের কথা শুনেছিলাম পাঁচ বছর পরে—লজ্জা করে না একটা মেয়েকে এইভাবে রেখে দিতে? চান করবে না, বাথরুমে যাবে না সে?' এই তীব্র অভিযোগে তাঁকে ভাত রেঁধে দিতে অস্বীকার করেছিলেন পুলিশ অফিসারটির স্ত্রী আর মা।

একটা নতুন জিনিস শেখা গিয়েছে, কুরুশকাঠি দিয়ে লেস বোনা। POW সেই মুসলিম মেয়েরা ভারি উৎসাহ করে শিখিয়েছিল। এই সুতো আর অফিস থেকে আনায় না কেউ, উলের অভিজ্ঞতার পর। ওয়ার্ডাররা এনে দেয়, জমানো গায়ে মাখার তেল, বাচ্চার চিনি, সাপ্তাহিক মাছের যোগফলের বিনিময়ে। বিকেলে বাগানে হাঁটতে হাঁটতে নতুন একজন এসে কথা বলল। নিধু মেঝেন। পঞ্চাশের বেশিই বয়স হবে। সাঁওতাল। শীর্ণ কালো মুখে নম্রতার হাসি। জমিতে চাষের অধিকার নিয়ে জমিদারের লোকজনের সঙ্গে মারামারি থেকে খুনোখুনি হয়েছে। নিধু এখানে এসেছে, তার একছেলে ওধারে আছে। দুজনেই নিচের কোর্টে বিশবছরের সাজা পেয়েছে। আপিল গেছে হাইকোর্টে। আর এক ছেলের একটা পা কাটা গেছে অন্য পক্ষের টাঙিতে। সেজন্য কারো সাজা হয়নি অবশ্য। আস্তে আস্তে বলে,

—এ বিটি, আমাকে এমন একটি বনায়ে দিবি? সুতা আনা করাব আমি?

আশপাশে যারা বাগান খাটনি করছিল হেসে উঠেছে, কেন গো? লেস বসানো সায়া পরবে তুমি?

আর লজ্জায় একেবারে জড়োসড়ো হয়ে গেছে নিধু— না তো, বেটার বউয়ের লাইগ্যে।

সুতো আনিও মাসি। বুনে দেব।

আষাঢ় মাসের খুব খাঁ খাঁ দুপুরে সেলের দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল নিধু মেঝেন। শুধোই—

কই মাসি, আনিয়েছ সুতো?

পুষ্প নেইয়া দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রায় আছে দেখে আস্তে আস্তে দরজা ঘেঁষে বসে

নাই আনালি বিটি। চৌদ্দ বছর গেলে তবে খালাস পাব। ততদিনে কুথা বা বৌ রইবে, কুথা বা ঘর।

তারপর একটু থেমে, হঁ বিটি, কত হপ্তায় চৌদ্দ বছর হয়ে? আষাঢ়ের এই রোদে জ্বলে যাওয়া আকাশের মত তার স্বর।

সে বছর প্রবল বর্ষা। গঙ্গার জল ঠেলে নালার মধ্যে দিয়ে জেলের উঠোনে ঢুকছে, অনেক পুঁটিমাছ সমেত। কমবয়সী মেয়েরা অনেকেই—হানিফা, শান্তা ইতোয়ারী, সোনাভান, ক্ষীরোদা, ফুলমালা—গামছা দিয়ে সেগুলোকে ধরছে। সব একসাথে জড়ো করে গেটের সিপাইকে মিনতি করা হল বড়ো চৌকা থেকে একটু ভাজিয়ে এনে দিতে। উঠোনের জল বেড়ে বারান্দার কিনার ছুঁই ছুঁই। শুনেছি গঙ্গায় নাকি স্টিমার দাঁড় করানো থাকে সারা রাত। জল আর একটু বাড়লেই, জেল ইভ্যাকুয়েট করানো হবে। সেটা সুখপ্রদ কি না কে জানে। কিন্তু একটা নতুন কিছু তো নিশ্চয়ই। আমি আর ফুলমালা জল মাপি। ভাবী বলে যেমন আপনি, তেমনি ফুলমালা! ওতে কি কিছু দেখতে পাবেন? খোলের ভিতর বন্ধ করে রাখবে তো!

ভাবী যখন বলছে, হবেও বা। ভাবী জেলের সব জানে। দাম দিয়েছে না! যে কোনো বিপদ থেকে ফিমেল ওয়ার্ডকে বাঁচানোর বুদ্ধিও জানে ভাবী।

একবার মেয়েদের সমস্ত শাড়ি এসেছিল খুব কাঁচাসুতোর। সমস্ত মানে সারা বছরে তিনটে। সেগুলো দেবার সময়ে পুরনো ছেঁড়া শাড়িগুলো গুনে গুনে ফেরত নেওয়া হবে। সেই তিনখানা শাড়িই থাকতে হবে কাচা পরিস্কার। কাপড়কাচার জন্য আসে সোডা। সোডা দিয়ে পিটিয়ে কাচতে সকলের শাড়ি ছিঁড়ে গেছে। মেট্রনকে অনেকবার বলা বেকার হলো, আবার একটা করে শাড়ি দেবার অন্যায় আবদার নিয়ে সে জেলারের কাছে যেতে পারবে না স্পষ্ট বলে দিয়েছে। সুতরাং ওয়ার্ডের মেয়েরা পরে আছে কুটিকুটি ছেঁড়া শাড়ি। মঙ্গলবার সুপারসাহেবের ইন্‌সপেকশান রাউন্ড, এখানকার ভাষায় 'ফাইল'। ভাবী তার আগেরদিন খাবার নিয়ে আসা ছেলেদের সঙ্গে আঁসা বড় জমাদারকে দিয়ে বলে পাঠাল মেয়েদের ভিক্ষা যে সাহেব যেন দয়া

করে পরদিন ফাইলে না আসেন। ওয়ার্ডে কী হবে কী হবে চাপা উত্তেজনা। মেট্রন ফুঁসছে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার স্পর্ধায়। হলই বা বিমলা। ও কি বিশবছরী নয়!

বড় জমাদারের মুখে শুনে সুপার কিন্তু তক্ষুনি ওয়ার্ডারকে দিয়ে ভাবীকে ডেকে পাঠিয়েছেন অফিসে আর সেখানে গিয়ে যা বলে এসেছে তার মর্মার্থ হল — সুপার সাহেব তো মেয়েদের বাবার মত, তাঁর সামনে লজ্জা করেই বা কী করবে কিন্তু সাহেবের সঙ্গে ফাইলে তো আরও সিপাহি জমাদার থাকে, মেয়েরা নঙ্গা হয়ে আছে। কী করে সকলের সামনে দাঁড়াবে? খাবার গেলে আজকাল মেয়েরা 'নম্বরের' ভিতরে থাকে কিন্তু সাহেবের ফাইলে কী করবে? নিজেদের লাজ রাখবার জন্যই সে এতবড় গোস্তাকি করেছে। সুপার থ।

হুকুম হল স্পেশাল হিসেবে এক্ষুনি দুটো করে নতুন কাপড় পাবে মেয়েরা এবং এটা টিকিটে লেখা হবে না। অর্থাৎ পুরনো কাপড় এখন ফেরত দিতে হবে না। সেটা দিন হিসেব করে সময়মত নেওয়া হবে বার্ষিক তিনটে পাবার সময়ে।

অবিরাম বৃষ্টিতে বাগানময় জল। বাগান খাটনির ছুটি। গোড়ায় জল জমে জমে কাঁঠালগাছগুলোর পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ছে ক্রমাগত। চুপিচুপি নিজেদের মধ্যে ঠিক হয়েছে জলে হাডুডু খেলা। দুপুরবেলা ওয়ার্ডারকে ডেকে বলি হঠাৎ খুব দরকার পড়েছে বাইরে যাবার আর সেল থেকে বেরিয়েই দৌড়। ওরা তৈরিই ছিল— ফুলমালা ইতোয়ারী সিস্টার কয়লামুখি আর ওর বৌদি শান্তি সুখী আরও কজন। বাগানে, গাছের নিচে নিচে প্রায় হাঁটুসমান জল। হাডুডু খেলার ছলে হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি আর খোলা হাসি। ওয়ার্ডার একটু দূরে দাঁড়িয়ে গজগজ করে ও মিনতি করে। তালা খুলে দেবার অফিসিয়াল দোষটা তার সুতরাং বেশি রাগ দেখাতে পারে না। তাছাড়া বিমলাভাবী হাসছে হাসপাতাল ওয়ার্ডের বারান্দায় বসে। মাজেদাদি ওয়ার্ডারের কথায় বলতে এসেছিল উঠে বন্ধ হয়ে যাবার জন্য। দু-তিনজনে মিলে ওকে টেনে এনে জলে ফেলে দিয়েছি। টানাটানিতে পড়ে গিয়ে মোরামে ঘষে হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত সমস্তটা ছাল উঠে গেল। রক্ত ফুটে উঠতে দেখে এত ভালো লাগল! কোন পীড়ন বা আঘাত ছাড়াও এমনি সাধারণভাবে কেটে গিয়ে রক্ত বেরোয় এখনও! হাসির হুল্লোড় যে এতটা উঠেছে, আমকাঁঠালের মাথা ছাড়িয়ে পাঁচিল পার হয়ে অফিসে পৌছনোর মত, সেটা বোঝা যায়নি। গেটের সিপাই যখন এসে বলে সুপার সাহেব জানতে চেয়েছেন ফিমেল ওয়ার্ডে কী হয়েছে, সবার মুখ শুকিয়ে যায়। বলেছিলাম গিয়ে বলতে

যে আমি মিছে কথা বলে সেল থেকে বেরিয়ে দৌড়ে জলে নেমে পড়ায় বাকি মেয়েরা কয়েকজন আমাকে ধরতে নেমেছিল। ঝুম্‌রির একটুও পছন্দ হয়নি কথাটা। নিজের মনে গজ্‌গজ করছে, কেনে, এক লোকের দোষ দিব কেনে, সবাই লোক খেইল্‌তে ছিলি। মেট্রনের রাগ হয়েছিল তার প্রাধান্য খর্ব হওয়ায়। সে সেই রাগ ঝাড়তে সত্যি কথাটা বলে দিয়েছে জেলারকে। তাতে জেলার নাকি হেসে বলেছেন, তাই নাকি?

এই সামান্য ব্যাপারে কিন্তু একটা বড় লাভ হল।

সাহেব জেলার যে মেট্রনের চেয়েও ভয়ানক, কোনো কথা বললেই ডাণ্ডাবেড়ি দেবেন এই আতঙ্কটা চোট খেল। 'জেলার সাহেবের ফাইলে বলব' এই কথাটা মাঝে মাঝে শোনা যায় আজকাল মেয়েদের চাপা গলাতেও।

বিমলাভাবীর কথা শুনি, এটা ভাবী জানে। তাই হাঙ্গার স্ট্রাইকের সময় কথা না শোনাটা, বুঝি যে ওর মনে খুব লাগে। বার বার ঘুরে আসে সেলের দরজায়— কী যে করছেন ! বারান্দা মুছতে মুছতে বাহা মেঝেন নিচুস্বরে বলে, এ দিদি, তুমি খায়ো নাই—ওয়ার্ডে কারো খাবার মন নাই রে। খুব ছুঁয়ে যায় ওর উল্কিভরা কালো মুখের চোখদুটি। রুটিন বাঁধা ডাক্তারি চেকআপ। জোর করে খাওয়াবার চেষ্টা করলে, আবার বমির সঙ্গে ঝলকে রক্ত উঠে আসা। সুপারিনটেন্ডেন্টের, রাইটার্স থেকে আসা ভি আই পি-র রাউন্ড। হাঙ্গার স্ট্রাইক ভাঙবার শর্তে আমার শহরের জেলে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করার আশ্বাস।

এসব আশ্বাস সাধারণত মিথ্যে হয় জানাই কথা, সুতরাং আবার জানাতে হয় একথা যে কোনো শর্তই গ্রহণযোগ্য নয় আমার কাছে। এর আগে আট কি নয়দিনের দিন অত্যন্ত দামী চকচকে স্যুটপরে যে ফর্সা স্বাস্থ্যবান, জেলখানায় বেমানান চেহারার ভদ্রলোক এসেছিলেন তাঁর পেছনে জেলার, ডেপুটি জেলাররা ইত্যাদি বিরাট বাহিনী ছিল। তিনি কথা শুরু করেছিলেন—

আপনার কী অসুবিধে আমাকে বলুন, আপনি তো আমার মেয়ের মত—দিয়ে। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই,

আপনার জন্য আমি সব করব কিন্তু না খেয়ে থাকলে আপনি তো গাড়িতে করে যেতে পারবেন না। দেখুন আপনি আমার বোনের মত—

এরপর পাছে বান্ধবীর মত বা আর খানিকপরে মায়ের মত বলে ফেলেন, আমি কেবল জিগেস করি তাঁকে—

আপনি যে তখন থেকে আমি করে দেব আমি দেখছি বলছেন, আপনি কে?

নিমেষে চক্‌চকে হাসি গুটিয়ে ফুটো বেলুনের মত হয়ে গেল চেহারাটা। মুখ ফিরিয়ে গট্‌গট করে চলে গেলেন। দেখতে পেলাম পেছনের দুই ডেপুটি জেলার হাসছেন। জানতাম ভদ্রলোক আই জি প্রিজ্‌ন্‌স। এটা ওঁর অনেকদিনের পাওনা ছিল। ওঁর জন্য সারাবেলা না খেয়ে ছিল বহরমপুর জেলের ফিমেল ওয়ার্ডের বাচ্চারা। আর তাদের মায়েরা আশায় দমবন্ধ করে 'টিকিট' হাতে নিয়ে তিনঘন্টা ধরে দাঁড়িয়েছিল ফাইলে।

আলো-অন্ধকার পার হতে হতে জ্ঞান ফেরে বহরমপুর হাসপাতালে। দুহাতে স্যালাইন আর রক্তের বোতল লাগানো, সেই ব্যথাতেই। তিনদিন একেবারে শুয়েছিলাম। রক্তের বোতল খুলে নেওয়া হয়েছিল প্রথম রাত্রিতেই। ঘুমের অতল থেকে চোখ মেলে এক একবার দেখছিলাম মুখের ওপর খোলা কাচের বালবের আলো। পায়ের সামনে একদল অর্জুনপ্রায় চার-ছ'জন খাকি পোশাক, একদৃষ্টে মুখের দিকে তাকিয়ে। সকালবেলা একজন ডাক্তার এলেন। অত্যন্ত বিরক্তভাবে 'কী ব্যাপার ওয়ার্ডের মধ্যে পুলিস কেন ?' বলে। শুনলাম তাঁর নাম ডাঃ তালুকদার। আমাকে বললেন, দেখুন মশাই, এখানে আমাদের সাথে তো আপনার শত্রুতা কিছু নেই— আপনি লড়ে যান ওদের সঙ্গে। কিন্তু কালপরশু মরে গেলে কী লাভ বলুন। আমাদের এখান থেকে একটুখানি সুস্থ হয়ে নিন তারপর ফিরে গিয়ে ফের শুরু করে দিন। স্যালাইন খুলিয়ে দিলেন। কিন্তু প্রতিদিন খোলাখুলি লেগে রইলেন— একে আমাদের কোনো কিছু নেই, এত কষ্টে লোকগুলোকে একটু সারাবার চেষ্টা করা যাচ্ছে বিশেষত এই পেশেন্টের অজস্র ঘুম দরকার, সেখানে মাথার ওপর পুলিস বসে থাকলে আমি আর চিকিৎসা করে কী করব ! পাহারা দিতে হয় ওয়ার্ডের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিন।

যদিও এরকম অন্যায্য আবদারে কান দিতে তাদের বয়ে গেছে।

প্রথমদিন জাগা-ঘুমোনর মাঝামাঝি একটা আচ্ছন্ন জায়গা, অন্ধকার, রক্তের বোতল থেকে কাঁপুনি আর শীত নামছিল আর মাঝে মাঝে অদ্ভুতভাবে মনে হচ্ছিল আমি মরে যাচ্ছি কিন্তু মা কিছু জানতে পারছে না। মাঝরাত্রির ওয়ার্ডের ভিতর দিয়ে শীতকালের গঙ্গার বাতাস চলছিল। ডঃ তালুকদারকে ভোলা যায় না যিনি পাশের বেডে শুয়ে থাকা এক পথে বাসকরা বুড়ির লাম্বার পাংচার করছিলেন পার্টিশানের আড়ালে, ট্রেনি নার্স বলছিল, মুন্ডুটা সোজা করে রাখব স্যার ? আর বললেন, মুন্ডু নয়, মানুষের ওটা মাথা। ফুচি বলে ছোট মেয়ে ছিল, তার পিঠে অ্যাবসেস, অপারেশান হবে। আমার খাট থেকে ওঠা বারণ, পুলিসদের বারণ। কিন্তু ফুচি পুলিশদেরও ভয় পায়

না, যখন-তখন এসে আমার পাশে শুয়ে থাকে। ওর বাড়ির গল্প, মায়ের গল্প। আর পাঁচটায় ভিজিটিং আওয়ার্সের ঘন্টা পড়ামাত্র ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে চলে আসবে, ঘন্টা পড়ে গেল, মা এল না। দুই কি পাঁচমিনিট হয়ত দেরি হত সেই ক্লান্ত তরুণীটির, নদীর ওপার থেকে পুল পেরিয়ে হেঁটে আসতে। অপারেশানের ডেট পড়েছিল ফুচির, অস্থির হয়ে উঠেছে বাড়ি যাবার জন্য। সন্ধ্যাবেলা ভারি হতাশমুখে কাছে এসে বসল। কালও অপারেশান হবে না গো মাসি। বাড়ি চলে যাব, আবার আসতে হবে।

কেন রে?

জান না? ডাক্তারবাবুরা টাইট করবে কাল থেকে।

সন্ধ্যাবেলা ডঃ তালুকদার রাউন্ডে এলে ফুচির অভিযোগটা জানালাম, কী করব? প্রথমে অবাক হয়েই হো হো করে হেসে উঠেছেন ভদ্রলোক। পরদিন সকাল আটটা থেকে স্ট্রাইক শুরু হবার আগে সাড়ে ছটায় ও.টি. রেডি করিয়ে সেরে দিলেন ফুচির অপারেশান।

ভোলা যায় না সেই সিস্টারদের যাঁরা পুলিসগার্ডদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে আমাকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজেদের স্নানঘরে, স্নান করার জন্য। সেখানে সরাসরি বলেছিলেন, আপনি কি এখানকার রাস্তা চেনেন? কাউকে চেনেন? যদি পারেন আপনি পালিয়ে যান, এদিকে যা হবে আমরা দেখব। সেই 'যা হবে'র অর্থ তখন কারও অজানা ছিল না। পাঁচদিন পর আমি, ধরে ধরে হলেও, হাঁটতে পারছি রিপোর্ট পাওয়ামাত্রই যখন পুলিস জেলে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করল ডঃ তালুকদারের ক্ষোভ চাপা ছিল না।

বিশ্বাস করুন আমি কিন্তু টুকে পাস করিনি, সময় পেলে আপনাকে আমি সুস্থ করে দিতে পারতাম। তারপর সমস্ত পুলিস অফিসারদের সামনেই— আসলে আপনার খুব বেশি সুস্থ থাকাটা বোধহয় তেমন বাঞ্ছিতও নয়, প্রাণটা আপাতত টেঁকা দরকার।

ডঃ তালুকদারের সঙ্গে বোঝাপড়া যাই হোক, সেটা তো জেলের সঙ্গে নয়, জেলে এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাও হয়নি ট্রানসফারের। কারো সঙ্গে, বাইরের পৃথিবীর সঙ্গেই কোনো যোগাযোগ নেই এত দীর্ঘ দিন যে নিজেও যেন নিজের অস্তিত্ব ভুলে যাচ্ছি। আমাকে এভাবে বছরের পর বছর বন্ধ করে রাখবার কোনো একটা কারণ তো ওদের দেখাতে হবে!

এবারে তৃতীয়দিনেই আবার, তারও পরে আবার হাসপাতাল, অন্ধকার, রক্তের বোতল, জ্ঞানে-অজ্ঞানে মেলামেশা ক'দিনের পরে শুনি—ট্রান্সফার

অর্ডার—প্রেসিডেন্সি জেল। অনেক রাত্রে স্ট্রেচার বার হয় সেল থেকে। এই অ্যাম্বুলেন্সে করে তিমিরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। স্ট্রেচারে শুয়ে আড়াই বছর পর, হঠাৎ দেখি আকাশভরা তারা। সমস্ত আকাশ যেন সহসা বিশাল কোন বস্তুপুঞ্জের মত ঝাঁপিয়ে আসে! ভ্যানে তুলবার আগের তিন মিনিটে আমার সেই এক আকাশ তারার etermity.

এই প্রেসিডেন্সি জেল।

নানারকম অনুভূতি অসুস্থ শরীর, উদগ্রীব মনকে ঘিরে ধরে। কলকাতায় ঢুকেছে গাড়ি। কালীপুজোর রাত্রি। মানিকতলার মোড়। আবছা আবছা শুনছি 'ফিমেল ফাটকে'র একটা ওয়ার্ড নাকি ভরে গিয়েছে রাজনৈতিক দায়ে বন্দী হয়ে আসা মেয়েতে। মধ্যবিত্ত মন খুব ভিতরে ভিতরে কোথাও এজন্যও যেন খুশি হয়। প্রায় দু'বছর পর নিজের অভ্যস্ত বাংলায় কথা বলতে পারব। আলিপুর। গোপালনগরের ব্রিজ। কিন্তু—এই প্রেসিডেন্সি জেল!

যথারীতি রাত্রেই পৌঁছেছি। মাঝরাত্রে। এত রাত্রেও জেল গেট আলোয় ঝলমল করছে। সিপাহি জমাদারদের ভিড়। প্রথমে তো বাইরেই দাঁড়াতে বলেছিল। তারপর আমাকে নিয়ে আসা অফিসার ইনচার্জ এগিয়ে গিয়ে গেটের সার্জেন্টকে কিছু বলায় ভেতরে ঢুকতে দিল এইমাত্র! কিন্তু কেমন যেন, আমাদের কেউ কোনো গ্রাহ্যই করছে না। খানিক দাঁড়িয়ে থেকে বসলাম। জেলার, সুপারিন্টেন্ডেন্ট সবাই ইতস্তত ব্যস্ত আনাগোনা করছেন। তারপর বোঝা গেল। নিশীথ ভট্টাচার্যের সেলের চাবি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই চাপা হৈ চৈ।

মেট্রন নাকি ছুটিতে। জেলারের কাছ থেকে চাবি নিয়ে হেড ওয়ার্ডার আর একজন সেপাই আমাকে পৌঁছতে যায়। অনেকদিন সেলে থাকা, হাঁটার স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে নিয়েছে। বহরমপুরে মেয়েদের ওয়ার্ড ছিল জেলের মেন গেটে ঢুকেই। এখানে জেলের একেবারে শেষ প্রান্তে। অস্পষ্ট আলো-অন্ধকারের মধ্যে গলি আর চাতাল পার হয়ে চলেছি। একবার হেড ওয়ার্ডারকে বললাম, আমাদের মেয়েরা যেখানে আছে, আমাকে যেন সেখানেই রাখা হয়। উত্তরে শুনলাম 'হবে, সব হবে।' ঘন্টা বাজিয়ে গেটের ভিতরের তালা খুলিয়ে, বাইরের চাবি খুলে, সঙ্গের সিপাহিকে বাইরে রেখে, হেড ওয়ার্ডার আমাকে নিয়ে ভেতরে ঢোকে। এই ওয়ার্ডের ডিউটিরত ফিমেল ওয়ার্ডারকে ডাকে। এবং প্রেসিডেন্সি সেলের ফিমেল ওয়ার্ড প্রথম ধাক্কাতেই আমাকে একেবারে ধ্বস্ত করে দেয়। হাসপাতালের মত লোহার খাটের বিছানায় টাঙানো

গজকাপড়ের মশারি তুলে ওয়ার্ডারকে আদিরসাত্মক সম্বোধন করতে করতে যে যুবতী গরাদের ভেতরে, গেটের সামনে কড়া আলোর নিচে এসে দাঁড়ায়, তার পরনে একটি সায়া। অতি পৃথুল উর্ধ্বাঙ্গে আবরণ বলতে শুধুমাত্র প্রচুর পাউডার। হাতে ভারী রুপোর বালা, নাকে নাকছাবি।

শিখার সঙ্গে এই আমার প্রথম এনকাউন্টার। পরে বুঝতে পারব যে, শিখা হচ্ছে প্রেসিডেন্সি জেলের অবস্থা-ব্যবস্থার এক নিখুঁত প্রতীক! গোটা বারো চিটিং কেসের আন্ডারট্রায়াল আসামী। আপাদমস্তক নাগরিক পাপের এক সম্পূর্ণ চেহারা যেন। প্রেসিডেন্সির ফিমেল ওয়ার্ডে তার অধীনস্থ সহযোগী দুটি। সরযূ এবং লালমোতি। দুজনেই বাড়িউলী ছিল। সরযূ একটি মেয়ের গর্ভপাত করাতে গিয়ে তাকে মেরে ফেলে। লালমোতি ছ'টি প্রায় বালিকাকে বিক্রি করার ঠিক আগে ধরা পড়ে। একজন বিশবছরী মেট। সাজা শেষ হতে আর বছর দুই বাকি। অন্যজনের সাজা সাতবছর। শেষ হতে তারও তিনবছরের কমই বাকি। লালমোতি সোনারপুর ক্যানিং অঞ্চল থেকে এসেছে। তার স্বামীও এই জেলেই আছে। তার কাজ ছিল সমস্ত ধরনের পুরষালী অত্যাচার দিয়ে অপহৃত মেয়েদের মনোবল ভেঙে দেওয়া। তাদের আতঙ্কিত করে তোলা। লালমোতি, সরযূ দু'জনের কেউই লেখাপড়া জানে না। তাদের বয়সও অস্তমিত। সুতরাং মেট এবং পাহারা হওয়া সত্ত্বেও, শিখার আন্ডারট্রায়াল সাম্রাজ্যে তারা অধীনস্থ কর্মচারীর মত থাকে। স্বভাবতই এসব কথা আমার একদিনে জানা হয়নি। সেদিন রাত্রে শিখাকে দেখে কেবল স্তম্ভিত বিতৃষ্ণা ছাড়া আর কিছুই হয়নি। সেই হাসপাতালেই কাটল প্রথম রাত্রির বাকিটুকু। পরদিন সকালে উঠোনে বেরিয়ে দেখি, সত্যিই একঝাঁক মেয়ে। রাজনৈতিক কারণে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বন্দী হয়ে এসেছে। ওদের কাছ থেকে সাগ্রহ অভ্যর্থনা। উঠোনে দাঁড়িয়ে সবাই কথা বলছি, শুনছি।

প্রেসিডেন্সি জেলটা নোংরা, বিশৃঙ্খল। একটা বড় উঠোনের একদিকে দূরে ভেতরে আসবার দরজা। তার পাশেই হাসপাতাল। দুদিকে বড় বড় আধা অন্ধকার ঘর। চতুর্থ দিকটায় একটা দোতলা ব্লক। তার একতলায় কয়েকটা অন্ধকার খুপরির দরজা। আর দোতলার পুরোটাই ইটের খোপ খোপ করা পাঁচিলে মোড়া। তখনও জানি না যে আগামী দুবছরেরও বেশি সময়, ওই ইটের খোপগুলোই আমার পৃথিবীর জানলা হয়ে উঠবে। উঠোনের ডানদিকে একটিমাত্র জীর্ণ চেহারার কাঁঠালগাছ। তার তলায় বাঁধানো গোল বেদি। সেদিকে আসামীদের ওয়ার্ডের পেছনে আছে পাগল ওয়ার্ড। বাঁদিকের ওয়ার্ড ঘরের পেছনে ডিভিশান ওয়ার্ড। এই নিয়ে মেয়েদের থাকার জায়গা।

বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে বা কথা বলতে পারছি না। নতুন বন্ধুদের সঙ্গে ওদের ওয়ার্ডের ভেতরে ঢুকলাম। কেমন প্রায় হোস্টেল আবহাওয়া। মেঝেতে চারদিকে পাতা বিছানা, রঙিন বেডকভার—কতোদিন পর যে বাইরের পৃথিবীর মানুষের ঘর সংসারের এই জিনিসগুলো দেখছি! ছড়ানো রঙিন জামাকাপড়। কিছু দেওয়ালে টাঙানো তারে ঝুলছে। কতোদিন পর এতজনের সঙ্গে খোলামেলাভাবে কথা বলা! একটু যেন অনভ্যস্তই লাগছে। ঘরটার অন্যপাশে কিছু বাচ্চা। একেবারে বাচ্চা। পাঁচ থেকে দশ-এগারো বছর। শুনলাম ওরা কেউ হারানো বাচ্চা, কারো মা পাগল ওয়ার্ডে আছে। আমাকে ওদের কথা আলাদা করে বলতে হবে। ওদের কথা। আমাদের সেই ছোট ছোট সমব্যথী সাথীদের কথা! আমাদের সন্তানদের কথা! গণেশ, বিজু, ভোলা, রূপা, মান্নাদের কথা।

আমার এই নতুন পাওয়া সঙ্গীরা সবাই প্রায় কিশোরী। কেউ বা সদ্য তরুণী—প্রীতি, বেলু, রীতা, মালা, স্বাতী, ডালিয়া—। তখনও জানি না যে মাত্র দুদিন ওদের সাথে একসঙ্গে থাকতে পারব। শেষোক্ত দুজন ছাড়া বাকিদের আর প্রায় দেখতেও পাব না।

সকাল দশটায় হাসপাতালে ডাক্তার এলেন। শিখার সঙ্গে গল্পটল্প করতে করতে নতুন আমদানি—আচ্ছা—কী অসুবিধা আপনার? বমি?—ওঃ ঠিক আছে জেলুসিল জাতীয় কিছু ওষুধ লিখতে শুরু করেছেন। থামলেন। অ্যাঁ—হাঙ্গার স্ট্রাইক? অ—তাহলে এখন ক'দিন পেঁপেসেদ্ধ আর দুধ খান—ঠিক আছে? ডাক্তারের চা বিস্কুট এসে পড়েছে। বেরিয়ে এসে বাঁচি।

উঠোনে ঘোরাফেরা করছে বন্দী মেয়েরা, যেন মানুষের ভাঙাচোরা টুকরো। ক্লান্ত, বিবর্ণ, হতশ্রী। প্রেসিডেন্সি জেল মহানগরীর তলানি ফেলবার জায়গা। এর নাম 'বি-ক্লাস' জেল। এখানকার বাসিন্দারা প্রায় প্রতিদিন আসা-যাওয়া করে। বেশিরভাগই আন্ডারট্রায়াল—হাজতী। যারা সাজা নিয়ে আসে, তাদেরও কারও সাজা তিনদিন, কারও পনেরোদিন কারও বা ছ'মাস। দুবছর বা তার বেশি দিন সাজা হলেই চালান বহরমপুর। প্রথম দিন ওয়ার্ডের মধ্যে যে জিনিসটা আমায় সবচেয়ে অবাক করে দিয়েছিল, তা হচ্ছে বিশাল দুটো উনুন। বহরমপুরে বিমলাভাবী পর্যন্ত আগুন জ্বালাতে সাহস করত না। কখনো-সখনো পেছন দিকে খুব কোণে শুকনো কাঁঠালপাতা জড়ো করে একটা পেঁয়াজ পোড়াবার পর সমস্ত ছাই একজায়গায় করে, মাটি চাপা দিয়ে ফেলেও পরদিন সাফাই ডিউটির জমাদার ঘুরে না যাওয়া পর্যন্ত, একটু ভয়ে ভয়ে থাকতে হত। এখানে শুনলাম পাগলদের কয়েক গ্যালন দুধ জ্বাল

দেওয়া, হাসপাতালের 'পেশেন্ট'দের চা করে দেওয়া, মেয়েদের জামা-কাপড় সেদ্ধ করে কাচা ইত্যাদি কারণে ভেতরেই এই উনুনের ব্যবস্থা। যে ঘরটার মধ্যে বুক সমান উঁচু উনুন দুটো আছে, সবার মুখে মুখে তার চলতি নাম ভাঁটিঘর। তার মুখোমুখি দোতলা ব্লকটায় ওঠবার কাঠের সিঁড়ির দরজা। তালা দেওয়া। সঙ্গীদের সাথে ঘুরে ঘুরে সব দেখছি। এখানে কেউ সেলে থাকে না?

না, থাকে! একজন আছে সেলে।

সেকি! কোথায়!

ওই একতলায় অন্ধ খুপরিগুলোর একটায়।

ওকে আলাদা রেখেছে কেন?

ওর নাম কৃষ্ণা। হাজারীবাগ জেল থেকে এসেছে। অনন্ত সিংহের গ্রুপের সঙ্গে ট্রাইবুনালে বিচার হচ্ছে—ওর সঙ্গে কথা বলা বারণ।

সে আবার কী! আমাদের সঙ্গীর সঙ্গে আমরা কথা বলব। বারণ করবে কে।

মেট্রন বারণ করেছে।

ভাঁটিঘরের ছাইগাদার কোণে কয়েক গোছা ঘাস জন্মেছে। তারই একটা গোছা তুলে নিয়ে গেলাম সেলটার দরজায়। অন্ধকার, ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। কৃষ্ণা হয়ত তার একটু আগে ঘুম থেকে উঠেছে। মুখটা ফোলাফোলা। পরে জেনেছি শুধু ঘুম থেকে ওঠা নয়, সেলটার মেঝে থেকে যে জল ওঠে, মোটা করে খবরের কাগজ পেতে সেটা খানিকটা ঠেকানো হয়ত যায়, কিন্তু ড্যাম্প ঠেকানোর উপায় নেই। তাই গা-হাত-পা, ফুলে থাকে। কিন্তু সে সব কথা পরের। সেদিন প্রথম দেখায় শ্যামলারঙের ছোটখাট চেহারা, নীল কামিজ পরা কৃষ্ণাকে আমি অবাঙালি ভেবেছিলাম। ঘাসের গোছাটা এগিয়ে দিলাম।

আমার এখানে আসা বারণ! একটু তির্যক সুর।

—জানি। কিন্তু কাদের বারণ সেটাই তো কথা।

—কোথা থেকে এসেছেন?

ইতিমধ্যে উঠোনের কোন প্রান্ত থেকে যেন ওয়ার্ডার ছুটে এসেছে।

—ওখানে যেও না, ওখানে যাওয়া বারণ।

—শুনেছি।

—চলে এসো। ওর সঙ্গে কথা বলা মেট্রনের বারণ।

—দেখছ তো আমরা এখন কথা বলছি!

ফিরে এসে ওয়ার্ডের সাথীদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতেই সবাই একমত

হয়ে গেল। আসলে ওদের নিয়ম যে না মানা যায়, আমাদের এখানে পৌঁছনোর প্রাথমিক শর্ত যে সেটাই, এটা ওরা আগে ঠিক ভেবে দেখেনি। খেয়াল করে এখন প্রবল উৎসাহ। কৃষ্ণাকে স্নান করবার জন্য খুলে দিয়েছিল ওয়ার্ডার। আমরা তাকে বলে দিলাম, ও আর সেলে ফিরে যাবে না। আমাদের সঙ্গে থাকবে। মেট্রন আসতে, তাকেও সেই কথাই বলা হল। একই কারণে যারা বন্দী হয়েছে, তাদের এক জায়গাতেই রাখতে হবে। বিকেলে দুটো নতুন ব্যাপার হল। প্রথমত ওয়ার্ডে হেড ওয়ার্ডার সন্ধ্যাবেলা লক-আপের আগে গুনতি নিতে এলে, জেলের আইন অনুযায়ী সমস্ত বন্দীরা দুজন দুজন লাইন করে, তাদের সামনে মাটিতে বসে। ওয়ার্ডাররা গুনতি করে। এখানে আমাদের মেয়েদের ওয়ার্ডেও সকলকে সে রকম বসতে দেখে, যেন ভেতরে কিছু গেঁথে গেল। এখানে খবর আসেনি, এই সিপাহিদের পায়ের কাছে বসে গুনতি দেবার বিরোধিতা করে, কত অত্যাচার সহ্য করেছে মেদিনীপুর, বহরমপুর জেলের ছেলেরা ? আজ আমরাও লাইনে বসলাম না। আমরা তো তোমাদের বলিনি, যে আমাদের ধরে এনে বন্ধ করে রাখো। যারা ধরে এনেছে তাদেরই দায় গুনতি মেলানো। আমরা তো আর মুরগি নই, যে সন্ধেবেলা গুনতি করে খাঁচায় বন্ধ করে দেবে। লক-আপের পর অনেকক্ষণ গান গাওয়া হল। দ্বিতীয় ব্যাপারটাও সবারই পছন্দ হল। এতদিন পর্যন্ত সবাই যে যার নিজের থালা বাটিতে নিজের খাবার নিয়ে এসে খেত। নিজের জায়গা, বাসন পরিষ্কার করে নিজের বিছানা পেতে শুত। এমনকি বাচ্চাদের খাওয়া-শোয়ার সঙ্গে আমাদের সঙ্গীদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। সেদিন দুপুরের খাবার সকলেরটা একসঙ্গে নেওয়া হয়েছিল। একজায়গায় গোল করে বসে খাওয়ার পর আমি সবগুলো বাসন মাজতে চাইলে, ডালিয়া বেলুর সঙ্গে মিলে হৈ হৈ করে একসঙ্গে সবার বাসন ধোয়া, জায়গা পরিষ্কার হয়ে গেল। সন্ধের খাবারের সময় আমরা বিনু রূপাদেরও আমাদের কাছে ডেকে নিলাম। ওদের কাছে আমাদের ওখানকার গ্রামের বাচ্চাদের গল্প করলাম। ওদের অনেক গল্প শুনলাম। রাত্রে গল্প করার আনন্দে ঘুমই এল না। নিয়ম ভাঙার প্রবল উত্তেজনা। রাত্রে বেশ জ্বর এল। অন্যরা না জানলেও আমি আর কৃষ্ণা জানি, ব্যাপারটা এত সহজে মিটে যাবে না। কৃষ্ণারও আছে হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে একবছর কাটানোর অভিজ্ঞতা—জেল প্রশাসনের সঙ্গে ক্রমাগত লড়ার অভিজ্ঞতা।

পরদিন সকাল থেকে ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটে গেল। প্রথমে অফিস থেকে স্লিপ এল, আমাকে ও কৃষ্ণাকে জেলারের অফিসে গিয়ে কথা বলার নির্দেশ জানিয়ে। সঙ্গীরা সেই স্লিপটা স্রেফ মাটিতে ফেলে দিল। তারপর

জেলার এলেন। প্রথমে মিষ্টি করে, পরে ভয় দেখিয়ে বললেন কৃষ্ণাকে সেলে ফিরে যেতে হবে। 'দরকার বুঝলে'- আমাকেও নাকি তিনি 'সলিটারি সেলে' পাঠাতে পারেন। বাকিদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন, যে তারা অকারণে বিপদে পড়তে যাচ্ছে। তারা উত্তর দিল, জেলে বন্ধ থাকাই তো যথেষ্ট বিপদ এবং এতাবৎকালের 'ভারি ভাল' লোকটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত 'ঠিক আছে' বলে বেরিয়ে গিয়ে, ষোল-সতেরোটি হাসিখুশি কিশোরী তরুণীর মোকাবিলা করবার জন্য, কুড়িটি লাঠিধারী সেপাই নিয়ে ফিরে এলেন। তারা অভ্যস্ত নির্মমতায় মেয়েদের ওপর লাঠি চালাল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের জেদই বজায় রইল। কৃষ্ণাকে একা নয়, স্বাতী, ডালিয়া স্নিগ্ধা-সহ আমাদের পাঁচজনকে সেলে বন্ধ করতে হল। বাকিদের নির্ভয় অগ্রাহ্য ওঁদের খুবই বিরক্ত করে তুলল। সিপাহিদের হাতে ধরা চুলের গোছা, ঠোঁট কেটে রক্ত গড়াচ্ছে, কিশোরী ডালিয়ার অদ্ভুত স্থির, শান্ত মুখে উঠোন পেরিয়ে সেলের দিকে হেঁটে আসবার ছবিটা এখনও স্পষ্ট চোখে ভাসে। এবার দোতলার সেলে আমি আর কৃষ্ণা। স্নিগ্ধ-স্বাতী-ডালিয়া নিচে। ওয়ার্ডের দরজাও বন্ধ। ওদের কী হল, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আমার সেলটা থেকে কোনো দিকে কিছু দেখা যায় না। শুধু শুনতে পাচ্ছি শ্লোগান দেবার সম্মেলক শব্দ।

সেই দ্বিপ্রহর থেকে পরদিন বিকেল পর্যন্ত তুমুল জ্বর। সময়টা কিছুটা যেন আচ্ছন্ন অবস্থায় কাটল। কেবল মনে আছে, বাইরে কোথাও বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিল। এই সময়ের মধ্যে একবারও সেলের দরজা খোলেনি। আমাদের জল বা খাবার দেবার জন্য, বা কোনো প্রাকৃতিক প্রয়োজনের জন্যও, কেউ আসেনি। পরদিন বিকেলে প্রচুর সিপাহি জমাদার সঙ্গে নিয়ে, লাঠি চালানোর ফল দেখতে বোধহয় জেলার এলেন। জামা-কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছে টুকরো টুকরো হয়ে—প্রথমে স্বাভাবিক সংকোচ হচ্ছিল। তারপর অসহায়তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনে হল, ওরা যা করেছে, তাতে যদি ওদের লজ্জা না হয়, আমাদের লজ্জা কেন! তিনি নিচে নেমে গেলে বাকিরা হয়ত তাঁকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়েছে, ভাঁটিঘরের মুখোমুখি সিঁড়ির দরজা হয়ত অসাবধানে খোলা ছিল। কাঠের সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ। বিজু আর গণেশ, ছোট্ট মানুষ দুটি দৌড়ে ওপরে উঠেছে। হাতে কম্বল আর রুটি। ঝুপ ঝুপ করে সেলের দরজার সামনে নামিয়ে দিয়ে, ছুটে নেমে যায়। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিচ ওয়ার্ডারের চেঁচামিচি শুনতে পাই। রুটিগুলো স্পষ্টতই ওদের নিজেদের ভাগের। গতকাল রাত্রি থেকে লুকিয়ে রাখা। আমার খিদে পায়নি, কিন্তু কান্না পেয়েছিল। বিজুর বয়েস নয়, গণেশের হয়ত সাত। বিজুর বাবা চোর,

ছেলেদের ওয়ার্ডে আছে। ও তাকে সাহায্য করত বলে এখানে। গণেশের মা-পাগল ওয়ার্ডে আজ প্রায় তিন-চার বছর। বাড়িতে ওকে দেখবার কেউ নেই বলে মায়ের সঙ্গে দিয়ে গেছে ওকে। ওরা কখনো কারো ভালোবাসা পায়নি। পরিবার জানে না, নিরাপত্তা জানে না, লেখাপড়া জানে না। বিজুর দ্রুত ফিস্ ফিস্ স্বর, মাসি খুব ব্যথা লেগেছে না গো? মাসি তোমাদের শীত করছে?

এই সেলটা অদ্ভুত। সত্যিকারের সলিটারি সেল যাকে বলে। সামনে প্রায় দশ বারোফুট দূরে দেওয়াল, যেখান দিয়ে সিঁড়িটা উঠে এসেছে। অথচ সিঁড়ির মাথাটা দরজার সামনে নয়। কেউ উঠে এলে, কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যায়, কিন্তু কে এল, দেখা যায় না। একদিকের দেওয়ালে হাত পাঁচেক উঁচুতে একফুট মত একটা কাটা জায়গা দিয়ে আলো-হাওয়া আসবার র‍্যাশনিং। তিন-চার দিন পর থেকে এক একজন ওয়ার্ডারকে দেখতে পাই। দশ মিনিটের জন্য দরজা খুলে দেয় স্নান করার জন্য। সারাদিনে ঐ একবারই। সেল থেকে বেরিয়েই ডানদিকে বাথরুম। বাঁ দিকে দেখতে পাই লম্বা ঢাকা বারান্দার মধ্যে অনেকগুলো পরপর বন্ধ গরাদ। ওরই মধ্যে কোনোটায় কৃষ্ণা রয়েছে! ওকে ওই দিকের বাথরুমে নিয়ে যায়। ও! এই জন্যই দোতলার সেল! এখান থেকে কোনো কারণেই নিচে যাওয়া বা কারো সঙ্গে কথা বলা চলবে না। আমি তো কাউকে দেখতেও পাচ্ছি না। ওয়ার্ডারদের মুখে ধীরে ধীরে শুনলাম, এটা নাকি ফাঁসি সেল। হাজতীদের এখানে রাখা হয় না। বারোবছর আগে একবার এটা খোলা হয়েছিল এক জনকে রাখবার জন্য। কাকে রাখবার জন্য আমি জানি। বিমলাভাবীকে। ভাবীকে তো আর বলা যাবে না যে, দেখে নিয়েছি আপনার গল্পে প্রেসিডেন্সি জেল আর আপনার সেল! ভাবীর 'নিজের সেল'-এর একটা আলাদা তাৎপর্য আছে। উত্তরপ্রদেশের খানদানী ঘরের বিধবা মেয়েরা কাচের চুড়ি পরে না। তাই স্বামীর ফাঁসির দু'-চারদিন আগে কোর্টেই বোধহয় আত্মীয়-স্বজনেরা ছলছুতো করে, ভাবীর হাতে চারাগাছা সোনার চুড়ি পরিয়ে গিয়েছিলেন। ভাবীর সেই শোকার্ত প্রায় অচেতন দিনগুলোর মধ্যে কোনো ওয়ার্ডারই সান্ত্বনা দিতে দিতে সেগুলি খুলে নেয়। বারণ করার ইচ্ছেই হয়নি। অনেক পরে যখন বিমলাভাবী আবার কথা বলত, দাপটে ধমকাত কোনো ওয়ার্ডারকে, তখন এই কথাটা প্রায়ই বলত—বলব না! চার চারটে সোনার চুড়ি দিয়ে এই জেলখানার ঘর কিনেছি ওয়ার্ডার উল্টাসিধা করলে জরুর বলব।

দু'চার দিনে নিচের ওয়ার্ডের সাথীরা আমাদের একটা-দুটো করে পোশাক

ওয়ার্ডারের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারল। প্রথম দিন, মানে সেলে আসবার পর তৃতীয় দিনে, ভাত খেতে দিয়েছিল খবরের কাগজে করে। কিছু চেঁচামেচির পর সেদিন রাত্রে থালায় খাবার এল। ওয়ার্ডার অনেকটা দূর থেকে থালাটা গরাদের সামনে ঠেলে দিল। পুরে বুঝলাম—ভয়! কাছে এলে আমরা নাকি থালা দিয়ে মারতে পারি!

একেবারে কিছু করার নেই। বিনা চিকিৎসায় কেবল শুয়ে থাকলে অসুখ সারবে এমন আশা করাটা একটু বাড়াবাড়ি। তাছাড়া ডান হাতের কবজিটা অচল হয়ে গেছে। জানি না নিচে ডালিয়া স্নিগ্ধাদের কেউ কোনো ওষুধ দিয়েছে কি না। ওয়ার্ডেই বা ক'জন কতখানি আহত কোনো ওষুধ পেয়েছে কি না তারাও। কবজিটা কেবল কাপড়ের অংশ ছিঁড়ে টাইট করে বেঁধে রেখেছি। একটা পেন্সিলও যদি পেতাম! বুঝতে পারতাম লিখতে পারছি কি না। সপ্তাহখানেক একেবারে চুপচাপ থাকবার পর, দাঁত মাজবার জন্য রোজ সকালে একটুকরো করে কাঠকয়লা পাওয়া গেল আর জানা গেল যে কৃষ্ণা ও নিচের সকলে ভালো আছে। আমি ভালো আছি এই খবরটাও এক ফাঁকে বিজুর ছুটে আসায়, বলে দেওয়া গেল। চুপ করে না থেকে উপায়ই বা কী! সবচেয়ে কাছাকাছির মধ্যে কৃষ্ণা। সেও চারপাঁচটা সেল দূরে। ডিউটি ওয়ার্ডারের ঘাগরার কোনা আর সিঁড়ির মাথার কাঠের রেলিং—এছাড়া আর কোনো দৃশ্যও তো নেই। কয়লা ঘসে ঘসে যে চকচকে কালো রঙ পাওয়া যায়, তাই দিয়ে সেলের দেওয়ালে বড় করে ছবি আঁকি—অনেক মানুষজনের ছবি, ফসল খেতের ছবি। বাচ্চা কাঁধে নেওয়া বাবার ছবি। সেলের ভেতরে স্পষ্ট আলো নেই আর ওয়ার্ডার পারতপক্ষে কাছাকাছি আসে না। সুতরাং এই দেওয়ালের ছবি এখনও কারো নজরে পড়েনি। রাত্রে জ্বালবার জন্য ভেতরে আলোর সুইচ আছে। কিন্তু নিচে স্বাতী-ডালিয়াদের সেলের ভেতরে আলো দেয়নি বলে, আমরাও বাল্ব ফেরত দিলাম। বারান্দায় যে আলো জ্বালা থাকে তাতে ভিতরটা দেখা যায়। আলো নিয়ে করব বা কী? পড়ার মত তো এক টুকরো খবরের কাগজ কি একটা ঠোঙাও নেই।

কিন্তু এ প্রেসিডেন্সি জেল। এখানে কোনো শৃঙ্খলায় কারো অভ্যেস নেই—ভালোও না, খারাপও না। সুতরাং ধীরে ধীরে সিঁড়ির নিচটা খোলা থাকতে আরম্ভ করল। তাতে অবশ্য আমাদের কোনো সুবিধে নেই। লম্বা বন্ধ বারান্দার ভেতরে সারি সারি আটখানা সেলের দরজা; পাঁচটা সেল তফাতে আমাদের দু'জনের গরাদেই তালাবন্ধ। কিন্তু সকালের সেই দশ মিনিট বাড়তে বাড়তে প্রায় আধঘন্টা। কাকস্নান করে এসেই আমি আর কৃষ্ণা

একে অন্যের সেলের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকি। গল্প করি। ওই চুরি করা আধঘন্টা ছাড়া সারাদিনে আর কথা বলা যায় না। বিবিধভারতীর রেডিও প্রোগ্রাম সমস্ত দিন মাইক্রোফোনে বাজিয়ে শোনানো হয়। মহানগরী। কাজেই চেঁচিয়ে কথা বলার জন্যও আমাদের অপেক্ষা করতে হয় রাত্রি ন'টা পর্যন্ত।

স্নান করবার জন্য নিচে গেলে, পাছে আমরা অন্য মেয়েদের সঙ্গে কথা বলি, তাই আমাদের স্নানের জল ওপরে এনে দিতে হয়। ভাতটা নিচের উঠোন থেকে নিয়ে, পৌঁছে দিতে হয় সেলের দরজায়। কিন্তু সেটা করবে কে? এখানে প্রায় সবাই হাজতী। তাদের দিয়ে নিয়মিত কোন কাজ করানো যাবে না। শিখা কিংবা তার পেটোয়ারা আমাদের জন্য কোনো কাজ করে দেবে না। প্রায় রোজই ডিউটির ওয়ার্ডার একে-ওকে ধরে সেগুলো করায়। আমরা সেলে থাকায়, ওয়ার্ডাররা এক হিসেবে খুশি। এখানে ডিউটি দেবার জন্য, প্রতিদিন তিনজন করে বেশি লোক দরকার হচ্ছে। এরা পার্মানেন্ট নয়। ডেলি পেমেন্টে কাজ করে। কাজেই কর্তৃপক্ষকে, মানে মূলত মেট্রনকে আর শিখাকে না চটিয়ে, যতটুকু পারে আমাদের অসুবিধা কম করার চেষ্টা করে। নানারকম তির্যক মন্তব্য করে আমরা তাদের সরকারি চাকুরে-সম্মান বোধেও ঘা দিয়েছি খানিকটা। তারা আমাদের জিনিসপত্র বয়ে আনবে না। সুতরাং আমরা যা চেয়েছিলাম সেটাই হল। মাসখানেক পর থেকে একটি পনেরো-ষোল বছরের কিশোরী এল, এসব ব্যাপারে ওয়ার্ডারকে সাহায্য করতে। তার নাম মায়া। পরের একটা বছর মায়া আমাদের খুব কাছাকাছি, আমাদের বন্ধু, বোন—আমাদের অনেক সুখ-দুঃখের উজ্জ্বল সঙ্গী। মায়া হাবড়া অশোকনগরের উদ্বাস্তু কলোনির মেয়ে। কাঠ বাঙাল ভাষায় ফুলঝুরির মত কথা বলে। একটু বোঁচা বোঁচা মিষ্টি চেহারা। ব্যবহারে অদ্ভুত সপ্রতিভতা আর সহজ আত্মমর্যাদাবোধ আছে। একা একা সেলে বসে, ওই অপরূপ ভাত গেলা যেত না বলে খাওয়াটা অনিয়মিত হয়ে উঠেছিল। কৃষ্ণার জন্য যে খাবার নিয়ে যাওয়া হত, তাতে দেখতাম থালাভর্তি কেবল পেঁপেসেদ্ধ আর একটুখানি ডাল। ভাবি ও নিশ্চয়ই ডাক্তারের নিয়মেই এরকম খায়। অনেক পরে শুনেছিলাম ওর দর্শন তত্ত্ব। পেঁপে খেতে নাকি ওর খুব খারাপ লাগে। এই অনুচিত বিলাসিতার অপরাধে, ওর এই স্বনির্ধারিত শাস্তি। আমার ডায়েট আলুসেদ্ধ, পেঁপেসেদ্ধ, ভাত। আজকাল মায়া নিজের ভাতের থালাটা নিয়ে চলে আসে, খাওয়ার জন্য জেদ করে, গল্প করে। হাসতে হাসতে বলে, কেমন ওয়ার্ডাররা আর শিখা, সরযূ ওকে বলে দিয়েছে আমাদের দরজার বেশি কাছে না আসতে। আমরা নাকি হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে

গলা টিপে দেব। এখন আরও বুঝতে পারি, ওয়ার্ডাররা কেন আমাদের সমঝিয়ে চলে, চটাতে চায় না। তাদের তো এখানে ডিউটি করতেই হবে। অবশ্য সব ওয়ার্ডার সমান নন। এক মহিলা আসেন, সত্যিই স্নেহপ্রবণ। চেহারায় এত সরল ভালোমানুষের ছাপ যে, তাঁকে এই পরিবেশে মোটেই মানায় না। তাঁর সুরক্ষার কারণে আমরা কখনই তাঁর নাম উল্লেখ করি না। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায়ও তাঁকে বড়দি বলি।

মায়া নিপুণ গৃহিণীপনায় এই সেলের সংসারও একটু একটু করে গোছাচ্ছে। আমাদের পোশাকের মোটামুটি একটু ব্যবস্থা করেছে। নিচে কৃষ্ণার পুরনো আবাস, যেখানে এখন স্বাতী স্নিগ্ধা আছে, সেখান থেকে কৃষ্ণার গোটা দুই-তিন বই ও এনে দিয়েছে। ডাক্তারকে বলে আমাদের চা পাতা, চিনি পাবার বন্দোবস্ত করেছে। সকালে ভাঁটিঘরের উনুন থেকে বাটিতে করে চা করে নিয়ে আসে। আমি আর কৃষ্ণা আজকাল মুখ ধুতে বেরিয়ে প্রায় ন'টা পর্যন্ত বাইরে থাকি। ওয়ার্ডার বিশেষ কিছু বলে না। কেবল একটা বোঝাপড়া আছে যে, অন্য কেউ যেন এটা জানতে না পারে। ফলে সকালের চা এবং খিচুড়ি, মুড়ি বা ছোলাসেদ্ধ, যাই জলখাবার হোক—সেটা একসঙ্গে বসে খাওয়া যায়। এর চেয়ে বড় বিলাসিতা এখন আমাদের কাছে অভাবিত। আমার সেল থেকে বেরিয়ে এলে, অন্য সেলগুলোর সামনে যে টানা বারান্দা, সেটা আগেই বলেছি, সম্পূর্ণ ঢাকা। মাঝে মাঝে আট ইঞ্চি চওড়া, এক ফুট লম্বা করে খোপ কাটা আছে। তাই দিয়ে ওদিক থেকে যৎসামান্য আলো-বাতাস আসে। আর এদিক থেকে আমরা একতলার উঠোনের ছোট ছোট অংশ দেখতে পাই। যে ক'টা অংশ দেখা যায়, তার একটা হল হাসপাতালের দরজা সুদ্ধু ফিমেল ওয়ার্ডে ঢোকার বড় গেট। ফলে প্রত্যেকের আসা-যাওয়া এবং জিনিসপত্র ভেতরে আসা আমাদের গোচর হয়।

রাত্রের ওয়ার্ডার সকালের ওয়ার্ডারকে গুনতি বুঝিয়ে দেয়। একে একে সারা জেলের সব ওয়ার্ডে গুনতি মিলে গেলে, মেইন গেটে ঢং ঢং করে তিনঘন্টি বাজে। তখন সাধারণ ওয়ার্ডগুলি খুলে দেওয়া হয়। সারারাত্রি অপরিচ্ছন্ন ঘুমের পর, নোংরা কাপড় জড়ানো ঘর্মাক্ত বা শীতার্ত শরীরগুলি, মায়েদের গায়ে ঝুলে থাকা বাচ্চারা, বাইরের নিরানন্দ অপরিস্কার উঠোনটায় এসে, এদিক-ওদিক বসে, জটলা পাকায়, ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে মাথা চুলকায়, হাঁটুর ওপর পর্যন্ত কাপড় তুলে, এমনিই চুপ করে বসে থাকে, যতক্ষণ না দরজা খুলে সকালের খাবারের বালতি ঢোকে। এখানে সকালের খাবারটাও অপেক্ষাকৃত নাগরিক। মেদিনীপুর বহরমপুরের মত রোজ ভুট্টার খিচুড়ি নয়।

একদিন করে চিঁড়ে-মুড়ি-ছোলাসেদ্ধ। এমনকি সপ্তাহে এক দিন পাঁউরুটি। সবই পরিমাণে অত্যল্প। অবশ্য তার কতটা হিসেবের বরাদ্দ আর কতটা চৌকা, পাহারা, সেপাই, হাসপাতাল ইত্যাদি ছাঁকনিতে ছাঁকা হতে হতে এসে পৌঁছয়, তার হিসেব আলাদা। সকালের খাবার আসে তিনবার। সাধারণ বন্দীদের বরাদ্দ উপরোক্ত ব্যাপারটা, কাগজ-কলমে হাসপাতালে ভর্তি আছে যে পেশেন্টরা, তাদের ডাক্তার নির্ধারিত ডায়েট আর ওয়ার্ডের পাগলদের জন্য অবিশ্বাস্য পরিমাণে হরিণঘাটার সবচেয়ে বড় দু'টি কনটেনার ভর্তি দুধ, লোহার একটা বিশাল ট্রেতে আশিজনের প্রত্যেকের নামে কোয়ার্টার সাইজের পাঁউরুটি, দেড়-দু'কিলো চিনি, একথালা ভর্তি চা পাতা, ডিমসেদ্ধ, আপেল, লেবু, মাখন। এই শেষ দু'ভাগের খাবার গেট দিয়ে ঢুকে হাসপাতালে চলে যায়। অন্তত বেলা দশটার আগে তার আর কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। ছোট বালতির এক বালতি খিচুড়ি বা ছোলাসেদ্ধ বা চিঁড়ে, গোটা কুড়ি টুকরো পাঁউরুটি আর একটা বড় বালতি ভর্তি টলটলে পাতলা চা পাগল ওয়ার্ডের দিকে চলে যায়। সে ওয়ার্ডের চলতি নাম পাগলবাড়ি। হাসপাতাল ডায়েট প্রাপকদের দু'চারজনের কাছ পর্যন্ত আসে। দৈনিক চা, চিনি আমরা ঠিক পেয়ে যাই। বাকি যাদের নাম হাসপাতালের অসুস্থ লিস্টে এনট্রি করা আছে, তারা তা জানেও না। আর জানলেই বা কী করতে পারে! হাসপাতালের ডায়েট আসলে সর্বজনজানিতভাবেই প্রিভিলেজড বন্দীদের আলাদা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। কিন্তু সত্যি তো অতো খাবার শিখা, লালমোতি, সরযূ, তাদের তাঁবেদার আট-দশজন মেয়ে আর প্রতি ডিউটির দু'জন করে মোট আঠেরজন ওয়ার্ডারের পক্ষে খেয়ে ফেলা সম্ভব নয়! তা তারা খায়ও না। পুরোটা থেকে বেছে কেবল সবচেয়ে ভালো অংশটুকুই খায়। তাহলে কী হয় এই অবিশ্বাস্য পরিমাণ খাবার! অধিকাংশ জিনিসই ওয়ার্ডারদের ঘাঘরার নিচে সেলাই হয়ে, কোমরের কাপড়ে আড়াল হয়ে বাইরে চলে যায়—চিনি, তেল, দুধজমানো খোয়া, ফল, ডিম আর টাকা হয়ে ফিরে আসে। প্রেসিডেন্সিতে বন্দীদের অবস্থা যাই হোক, কোনো জিনিসের কার্পণ্য নেই। প্রথম দিন হাসপাতালে আমি যে গজ কাপড়ের মশারি ও মোটা মোটা পাশবালিশ দেখেছিলাম, সেই গজ কাপড়ের থান ও বোরিক তুলোর বাণ্ডিল আসে মেয়েদের শারীরিক প্রয়োজনে। খাবার ব্যতীত এই সব কিছুই—বিছানার চাদর, কেরোসিন তেল, সর্ষের ও নারকোলের তেল, ফিনাইল, ঝাঁটার কাঠি এমনকি জেলের থালাবাটি পর্যন্ত এই ভাবে বাইরে যায়। বলা বাহুল্য যে, ওপরে ঘাঘরা-চাদর চাপা দেওয়া থাকলেও ব্যাপারটা

আসলে খোলাখুলি এবং এটা কোনমতেই শুধু মেয়েদের ওয়ার্ডের ব্যাপার নয়। প্রেসিডেন্সি জেলে সামান্য চিটিংকেস বা এ ধরনের কেসে পাঁচসাত বছর ধরে আছে এমন নজির প্রচুর না হলেও অমিল নয়। জেলে বসে উপার্জিত টাকা থেকে তারা কোর্টের কলকব্জায় তেল দেয়, যাতে তাদের কেস কোর্টে না ওঠে, ফাইল নিচে চলে যায়। বাইরে এই আয়াসে এই টাকা উপার্জন করার কথা তো চিন্তাই করা যায় না। যে মনুষ্যনাম প্রাণীরা এইভাবে সর্ববোধ শূন্য হয়ে টাকা কামানোর মানসিক এলেম রাখে তাদের কাছে ঘর-পরিবারের টান বলে কিছু থাকে না। তারা এই সমাজের শিকড়হীন, কুশ্রী, লোভ আর স্বার্থপরতার নিচুতলার চেহারা। জেলের চাকা চালু রাখার প্রয়োজনীয় নাটবল্টুও এরাই।

দোতলায় আরেকজন আছেন। ফিমেল ওয়ার্ডের ওয়েলফেয়ার অফিসার। আসলে দোতলার একটা সেলে ওঁর অফিস বরাবরই ছিল। মাঝে এইসব গোলমালে সেটা ব্যবহৃত হচ্ছিল না। এই ওয়ার্ডের 'ওয়েলফেয়ার' করার কেউ আছেন ভেবে এবং ঝলমলে পোশাকসজ্জিত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা দেখে, ওঁর সম্পর্কে আমাদের মনে প্রাথমিকভাবে বিরূপতারই সৃষ্টি হয়েছিল। তা ছাড়া ওঁর অফিসঘরটা আমার আর কৃষ্ণার সেলের মাঝপথে। সকালটা মায়ার সঙ্গে কেটে যায়, কিন্তু দুপুরগুলো লম্বা আর একঘেয়ে। কোনো দিন যদি আমাদের চেঁচিয়ে একটু কথা বলতে ইচ্ছে করে, তখন অফিসটা একটা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেন না কৃষ্ণার সেল থেকে বোঝা যায় না ওয়েলফেয়ার অফিসার এসেছেন কি না। কৃষ্ণা কখনো কখনো ওর সেল থেকে চেঁচিয়ে বলে, ওয়ালটার ডি লা মেয়ারের 'লিসনার্স' কবিতাটার প্রথম লাইনটা মনে আছে তোর? যদি মহিলা অফিসে থাকেন, আমি কেবল 'আছে' বলে চুপ করে যাই। Is there anybody there—এই ছিল কবিতাটার প্রথম লাইন। পরে আলাপ হবার পর মনে হল উনি হয়ত ব্যাপারটা উপভোগই করেছেন। ওঁর সঙ্গে প্রাথমিক আলাপটাও আমাদের মনে থাকবে।

একতলার অন্ধকার সেলের স্যাঁতসেতে মেঝেতে থেকে স্বাতী আর স্নিগ্ধা দু'জনেরই ব্রংকাইটিস হয়েছে। ডাক্তার ওষুধ আর ডায়েট লিখে দিয়ে কাজ শেষ করেছেন। মেট্রনের সঙ্গে তর্কাতর্কি হল ওদের ওপরে এনে দেবার জন্য। ওপরের সেলগুলো অন্তত ড্যাম্প নয়। আর ওদের যখন হসপিট্যালাইজড করা হবে না, তখন, আমরা যাতে নার্সিং করতে পারি, তার ব্যবস্থা করতে হবে। একলা ডলিয়ার পক্ষে ঐখানে ওভাবে দুজন রুগীকে সামলানো সম্ভব নয়। ওয়েলফেয়ার অফিসার আমাদের কথা শুনলেন এবং

জানালেন যে, তিনি আমাদের বক্তব্য জেলারকে জানাবেন। বোঝা মুশকিল কী করে জেলারের অনুমতি পাওয়া গেল। ওঁরা উপস্থিত আবার সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতে চাইছেন। ওয়েলফেয়ার অফিসার এই সময়েই আমার সেলটা পালটে কৃষ্ণার পাশাপাশি করে দেবার ব্যবস্থা করলেন। এটার জন্য আমরা ওঁকে কোনো অনুরোধ জানাইনি। কিন্তু এখন আমিও দুপুরে বা সন্ধেয় বারান্দার ফাঁক দিয়ে নিচের উঠোন দেখতে পাই। শব্দ শুনে আন্দাজ করার পৃথিবী থেকে, দেখতে পাবার পৃথিবীতে এসে পড়লাম। কৃষ্ণা বলছে ডাব নাকি ব্রংকাইটিসের রোগীর পক্ষে উপকারী, কফ তুলে দেয়। ডাক্তারকে বলে অন্য সব ডায়েট কাটিয়ে রোজ একটা করে ডাব আর লেবু পাওয়া গেল। লেবুতে ভিটামিন সি আছে। কিন্তু প্রথমদিন হাসপাতাল থেকে ওয়ার্ডারের নিয়ে আসা আস্ত ডাব আর লেবু হাতে নিয়ে আমরা কিছুটা হতভম্ব হয়ে থাকি। বুঝতে পারি এটা ইচ্ছাকৃত। আমাদের দিয়ে কেটে দেবার অনুরোধ করানোর জন্য। তারপর উপায় আবিষ্কৃত হয়। জেল থেকে যেসব ছেলেমেয়েরা ফিরে এসেছে, তাদের ব্রেনের উদ্ভাবনী ক্ষমতার তুলনা মেলা ভার। সেপটিপিন দিয়ে যে লেবু কাটা যায় এবং ডাবের সেই দুর্জয় ঢাকনিটি খুলে ফেলা যায় গরাদের গায়ে ঠিক কায়দামত ঠুকতে পারলে, এটা আবিষ্কার করা তো কিছুই নয়। দমদম জেলে ছেলেরা শুনলাম ঢ্যাঁড়শ চিবিয়ে বা চিবোতে না পেরে তার ছিবড়ে শুকিয়ে জ্বালানী করে চা বানাচ্ছে।

স্বাতী যখন ধরা পড়ে, তখন তিনমাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। পুলিস কাস্টডিতে ওর সেই সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া ও হাইব্লাডপ্রেশার ও রিউম্যাটিজমের রুগী ! স্নিগ্ধার জ্বর মাঝে মাঝে এত বাড়ছে যে, সত্যিই গায়ে হাত ঠেকানো যাচ্ছে না। বেশিক্ষণ ওর নিঃশ্বাস গায়ে লাগলে সেই জায়গাটা জ্বালা করছে। সাধারণত জ্বর বাড়ছে রাত্রে। অথচ রাত্রে আমাকে বা কৃষ্ণাকে কিছুতেই ওদের সঙ্গে থাকবার অনুমতি দেওয়া হল না। ওরা যা আছে আমরা তার চেয়ে বেশি আর কিছু ওদের কোনমতেই শেখাতে পারব না, এই যুক্তিও কর্তৃপক্ষকে আশ্বাস দিতে অসমর্থ হল। রাত্রে জ্বর বাড়লে, সেলের বাইরে থেকে জল এনে ওদের মাথা ধুয়ে দেবারও কোনো উপায় নেই। সেলের মধ্যে জল রাখবার জন্য একটা পাত্র চেয়ে পাঠাতে, হাসপাতাল থেকে একটা ছোট গামলা এল, পানের পিকের দাগে ভর্তি।

কী করে যে স্বাতী-স্নিগ্ধা সেরে উঠল বলা মুশকিল। নিচের ওয়ার্ডের ওদের বারে বারে উদ্বিগ্ন প্রশ্নের জবাবে, একদিন অবশেষে আমরা বলতে পারলাম যে, জ্বর ছেড়ে গেছে। দুজনেই, যাকে বলে ইঁদুরের মত দুর্বল।

দুপুরের খাবারটা এখন স্বাতী-স্নিগ্ধা-ডালিয়া-কৃষ্ণা-মায়া আমরা সবাই একসঙ্গে খাই। আমি যেমন মাঝে মাঝে চুপিচুপি আমার মাঈ এর কথা ভাবি, ওরাও কি ভাবে ? আমাকে সবাই মিলে কমিউন মাদার বানিয়েছে। সকলের খাবার একসঙ্গে করে, ভাত মেখে সবার হাতে হাতে ধরিয়ে দিই। স্বাতী, স্নিগ্ধাকে এই ঝোল এখনই দেবার সাহস হচ্ছে না বলে, আলুসেদ্ধ আর ভাত দিতে দিতে মাঝে মাঝে বলছি, 'নাও এই কপিভাজাটা খেয়ে নাও' কিংবা 'মাছের ঝোলটা ঝাল হয়নি তো' ?

এইসব প্রভৃত হাসাহাসির মধ্যে দিয়ে খাওয়া শেষ হয়। এইসব করে সকলেরই খাওয়ায় একটু একটু আগ্রহ ফিরে এসেছে। তারপর আমরা 'পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা' ও 'যথাসাধ্য দৈহিক পরিশ্রমের' কাজ করার কারণ, নিজেদের সেল বারান্দা সব মুছি। থালাগুলো অনেকক্ষণ ধরে মেজে মেজে চকচকে করা হয়। মায়া মজার মজার গল্প বলে। তাছাড়া নিচের ওয়ার্ডের সঙ্গীদের সাথে আমাদের যোগসূত্রও তো মায়াই। ছোট একটা চিরকুট কাগজ কেন যে এত গোপনীয়তার সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া করতে হবে, সে কথা ও প্রথম প্রথম বুঝতে পারত না। অথচ ব্যাপারটা যে আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটা বুঝতো। তাই কোথাও যে কোনো কাগজের টুকরো কুড়িয়ে পেলেই, ছুটে এসে ফিসফিস করে শুধোতো, দিদিরে এইটা নিচের দিদিদের দিয়া আসুম ?

জেলে ব্যবহৃত থালা-গ্লাসগুলো দমদম জেলে, বন্দীরাই তৈরি করেন। বন্দী ব্যবহারকারীদের কাছে, থালাগুলোর স্পষ্ট জীবন্ত চরিত্র আছে। যেসব থালা কোনও সময়ে সাঁওতাল বন্দীদের কাছে ছিল, সেগুলোর গায়ে অদ্ভুত সুন্দর নকশাকাটা। একটা পেরেক বা একটুকরো ভাঙা লোহার পাত দিয়ে সন্তর্পণে ঠুকে ঠুকে তৈরি। এই নকশা মানুষের সৌন্দর্য সৃষ্টির সেই অপরাজেয় রহস্যময় আবেগকে প্রকাশ করেছে। জেলের অমানুষিকতা, অপরিচ্ছন্নতা, কুৎসিত প্রতিপার্শ্বের মাঝখানে হঠাৎ সৃষ্টিশীলতার, জীবনমুখীতার এই মানবিক চিহ্ন যেন কি অদ্ভুত বার্তা নিয়ে আসত। অন্যদিকে আছে টি বি রুগীদের ব্যবহৃত থালা-বাটি। এই থালাবাটি গুলোর কিনারে পেরেক দিয়ে ফুটো করা থাকে। জেলেরই নিয়মানুযায়ী এই চিহ্নিত বাসনগুলো আবার দমদমে ফিরে যাবার কথা। সেখানে এগুলো গালিয়ে ফেলে আবার নতুন করে তৈরি হবে। বাস্তবে এসব কিছুই হয় না। ফুটো করা বাসন কারো ভাগে পড়লে, হয়ত তার একটু ভয় হয়। কিংবা কার ছিল এই থালা। এই নির্বান্ধব যত্নহীন প্রাচীরের মধ্যে বসে, এই থালাটায় করে ভাত খেতে খেতে, কী ভাবত সে একা-

একা এ-সব মনে করে, সেই না দেখা, না জানা মানুষটির জন্য বিষণ্ণতাও আসে।

স্বাতী স্নিগ্ধার অসুখে আমাদের একটা পরম উপকার এই হল যে দুপুরে ঘন্টাদুয়েক ছাড়া আর প্রায় সমস্ত দিনই সেলের দরজা খোলা থাকে। তালা দেওয়া থাকে নিচের সিঁড়ির দরজায়। রাত্রে অবশ্য আলাদা আলাদা সেলেই থাকতে হয়। কিন্তু সারাদিন আমরা একসঙ্গেই থাকি। এই খোলামেলা ব্যবস্থাটা যে কোনো দিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এটা আমরা জানি। তাই এই সময়টা খুব পরিকল্পিতভাবে কাটানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। বইপত্র পাওয়া সমস্যা। শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও সত্যি যে বাজারে বিক্রি হয় এরকম বহু বইও আমাদের কাছে অ-মিল। বার্ট্রান্ড রাসেলের 'War Crimes in Vietnam' কি 'রুশজার্মান যুদ্ধের ইতিহাস' কিংবা গোর্কির 'মা' ভেতরে নিয়ে আসবার জন্য বহু কৌশল করতে হয়েছিল। এগুলো তো প্রকাশ্যে বিক্রিত বই, রাজনীতির সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই—এসব যুক্তির কোনো মানে নেই কর্তৃপক্ষের কাছে। ছাপা-জিনিস মাত্রই চিরকাল এদের কাছে এক ভীতিপদ রহস্যময়তা। একটা ঘটনা মনে পড়ে--বহরমপুরে বৃদ্ধ অনন্তদা সেই উনিশশ' বেয়াল্লিশ সাল থেকে জেলে আসছেন। যখন স্কুলে পড়তেন তখন 'স্বাধীনতা' বিক্রি করা দিয়ে শুরু। আর দেখেছি, যখন আমরা সবাই প্রায় হতাশ বা ক্লান্ত হয়ে পড়ছি, অনন্তদা সকলকে কী ভাবে শুশ্রূষা করতেন। তো সেই অনন্তদার কাছে শোনা—ওঁরা বক্সা ক্যাম্প থেকে চালান হয়ে এসেছেন প্রেসিডেন্সিতে। জেল গেটের ভেতরে ঢুকতেই তল্লাশির হুকুম হয়েছে, আর ওঁরা বেঁকে বসেছেন। বসেছেন মানে, আক্ষরিক অর্থেই বসেই পড়েছেন গেট চত্বর জুড়ে। জেল থেকে জেলে আসছি সার্চ কিসের? ওখান থেকে তো সার্চ করেই পাঠিয়েছে। কর্তৃপক্ষও নাছোড়। শেষে হল সার্চ, কিন্তু এই শর্তে যে কিছু আটকানো চলবে না! সে জেদও বজায় থাকে না। সকলের মিলিয়ে বইয়ের সংখ্যা অনেক। গোয়েন্দা দপ্তরের দেওয়া ফর্দ মিলিয়ে মিলিয়ে 'পাস' করা হচ্ছে সেগুলো। ঠেকে গেল 'তবলা তরঙ্গিনী'তে এসে। এ বইয়ের নাম নেই লিস্টে, এটা দেওয়া যাবে না।

সেকি মশাই! এটা তো বই নয়! এতো তবলার বই—

তা জানি না, মোটকথা এ বই আপনাদের দেবার কথা নেই। বন্দীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বসে রইলেন। টেলিফোন চালাচালি হল অফিসে-রাইটার্সে। বিকেলবেলা ফরমান এল—তবলা সঙ্গে নিয়ে যাবার পারমিশান আছে। 'তবলা অ্যালাউড—তরঙ্গিনী নট'।

আর একথা বোধহয় সত্য, যে পরাধীন আমলে অন্তত রাজনৈতিক বন্দীরা, স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক কারণে বন্দীদের থেকে অনেক বেশি নিরাপত্তা পেয়েছেন। আন্দামানের সেলুলার জেলকে বাদ দিলে, বৃহত্তর বাংলায় জেলে গুলিতে হত্যার ঘটনা একটি—হিজলী। ১৯১০-এর ডিসেম্বর থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে শুধু পশ্চিমবাংলার জেলে গুলি বেয়নেটে নিরস্ত্র বন্দী কিশোর-তরুণদের হত্যার ঘটনা পনেরোটি। নিহতের সংখ্যা সরকারি হিসেবেই ৬৫। আহত ৩১০ জন। প্রকৃত সংখ্যা এর অনেক অনেক ওপরে।

অবস্থাটা যে একটা খোলাখুলি পরস্পরকে না-ঘাঁটানোর মত, সেটা বোঝা যায়। মায়ার পক্ষে পাঁচজনের স্নানের জল তুলে আনা সম্ভব নয় বলে, আমরা নিচে স্নান করতে যাবার অনুমতি পেয়েছি। এবং 'ভয়ংকর গরম' বলে সকালের পরে বিকেলেও একবার। যদিও দু'বারই খুব তাড়াতাড়ি উঠে আসতে হয়, তবু তো নিচে স্নানের ঘর আছে পাশাপাশি দু'তিনটে। ভেতরে বিশাল চৌবাচ্চা। স্নানঘরগুলোর একটা থেকে অন্যটার মাঝে কাটা দেওয়ালের পার্টিশান। আমরা স্নান করতে ঢুকলে পাশেরটায় অন্য মেয়েরা ঢুকে, চৌবাচ্চার ওপরে উঠে, আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারে। এছাড়া উঠোন পার হয়ে যাওয়া-আসার পথে, আমরা ভাগাভাগি করে দু'তিনজন ওয়ার্ডারকে ব্যস্ত রাখি, বাকি এক-দু'জন সেই ফাঁকে বড় ওয়ার্ডের আমাদের সাথীদের সঙ্গে একটু কথা বলে নিই। প্রায় রোজই দু'-চার জনের কোর্টে কেসের ডেট থাকে। ফলে রোজই বাইরের কিছু-না-কিছু খবর আসে। কৃষ্ণার ট্রাইবুনালের তারিখ থাকলে আলিপুর সেন্ট্রাল, দমদম সেন্ট্রালের সঙ্গীসাথীদেরও খবর পাওয়া যায়। কোর্ট থেকে খাবারও আসে কিছু কিছু। সেটা একটা মজার কাণ্ডই হয়। যাই আসুক না কেন—চিঁড়েগুড়, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, বিস্কুট, ডালমুট—সেটা ঠিক সমান পঁচিশ ভাগে ভাগ হয়। ওয়ার্ডারকে দিয়ে তক্ষুনি ওপরে পাঠিয়ে দেবার পর, চেঁচামেচি করে জেনে নেওয়া হয়, আমরা পেয়েছি কি না। তারপর বাহ্যত দু'দল দু'জায়গায় বসে একসঙ্গে খাওয়া হয়। মাঝে মাঝে মায়েরা মেয়েদের খাওয়াবার জন্য রুটি-আলুভাজা নিয়ে এলেও, সেটা তক্ষুনি প্যাকেট হয়ে যায়।

ছ'সাতটা বাড়ির রুটি একসঙ্গে থাকলেও, শ্বেতাদের বাড়ির রুটি ঠিক আমরা আলাদা করে চিনতে পারি। কাগজের মত পাতলা, ধপধপে সাদা রুটির কোথাও একটা কালো দাগ নেই। একদিন শ্বেতা বলল, ওদের বাড়ির রুটি ওরকম হওয়াটাই নিয়ম। কালোদাগ পড়লে সেই রুটি নাকি ওর বাবা কাকারা ফেলে দেবেন। শুনে থেকে ভালো লাগাটা কমে গেল।

মেয়েরা সকলের জন্য নিয়ে আসে বলে বাড়ি থেকে অনেক সময় বেশি করে খাবার দেওয়া হলে, আমরা বারে বারে বারণ করে পাঠাই। বারণ তো এমনিতেই কত কিছুই। কাপড়কাচা সাবান দেওয়া চলবে, কিন্তু গুঁড়ো সাবান বারণ। টুথপেস্ট দেওয়া চলবে, কিন্তু টুথপাউডার বারণ। ছুঁচ-সুতো-কুরুশ দেওয়া যাবে, কিন্তু উলবোনার কাঁটা নয়। 'নবকল্লোল' কি 'পেরিম্যাসন' পেতে পারে মেয়েরা, কিন্তু অনার্সের নথিভুক্ত ইতিহাস বই? নাঃ! কেন? ঐ যে 'তবলা অ্যালাউড, তরঙ্গিনী নট'। কৃষ্ণার বৃদ্ধা মা, তাঁকে দেখতে সরস্বতীর মত, একদিন নিজের হাতে করে এনেছিলেন রথের মেলার ছোট ছোট কয়েকটি চিনির মঠ। তাঁর সামনেই সেগুলা টুকরো টুকরো করে ভাঙা হল। ভেতরে বোমা লুকোনো আছে কি না, দেখবার জন্য। একটামাত্র চিনির পুতুল, হলুদরঙের একটা ছোট হাঁস, কেবল আস্ত এসেছিল, সেটা আমরা হাজারিবাগ জেলে থাকা মেরির জন্য রেখে দিলাম। যদি কৃষ্ণা আবার কখনও ফিরে যায় কিংবা মেরিকে কেসের জন্য নিয়ে আসে!

ছেলেদের ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে জেল অফিসে বা কোর্টে যাবার সময়ে প্রত্যেকেই আমরা খুব উৎকর্ণ হয়ে যাই। পাশ দিয়ে যেতে যেতে সাধারণ বন্দীরা হালকা স্বরে কোনো খবর বলে দিয়ে যায়। অবশ্য আমার ওয়ার্ডের বাইরে যাওয়া ঘটে ওঠে খুব কম। কৃষ্ণাকে কোনো কারণে যেতে হয়েছিল অফিসে। বেলা এগারোটা নাগাদ। ফিরে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতপায়ে উঠে আসছে। মুখটা লাল। আম উদ্বিগ্ন হয়ে বারান্দা থেকে ওর পেছন পেছন সেলে ঢুকে দেখি ও মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। কান্নায়? কী হয়েছে? ঠেলা দিয়ে অবাক। হাসির দমকে কথা বলতে পারছে না। অনেক কষ্টে যা বোঝা গেল, অফিস যাবার পথে কয়েদীর পোশাকপরা একটি ছেলে পাশ দিয়ে যাবার সময় কী বলেছে—এত অস্পষ্টস্বর যে কৃষ্ণা বুঝে উঠতে পারেনি। ফিরে প্রশ্ন করেছে—কী? অফিসে ঢোকবার মুখে ওয়ার্ডার কৃষ্ণাকে দাঁড় করিয়ে ডেপুটি জেলারের পারমিশান আনতে গিয়েছিল। সেই ফাঁকে ছেলেটি এবার কথাটা কৃষ্ণার উৎকর্ণ আগ্রহকে পরিস্কার শুনিয়ে দিয়েছে, 'তোমার ফিগারটা খুব সুন্দর। ও আর থামতে পারছে না' হাসতে হাসতে, ভাব একবার, আমি কিনা ওকে খুব সিরিয়াসলি জিগেস করলাম—কী বললে?

মিমলু সেনগুপ্ত বলে একটি মেয়ে এল এ সময়ে। তার বাবা ফ্রান্সে বসবাস করতেন। এদেশে ফিরে মিমলুর বন্ধুত্ব হয় কিছু ঝকঝকে ছেলের সঙ্গে। তাদর রাখতে দেওয়া একটি লাইসেন্সবিহীন আগ্নেয়াস্ত্র ও কিছু আপত্তিকর কাগজপত্র পাওয়া যায় ওর বিছানার তলায়।

মিমলু আমাদেরই বয়সী, সুন্দরী, বেপরোয়া। ফ্রেয়ারঅলা প্যান্ট, খোলামেলা দুর্মূল্য গেঞ্জি, কাঁধ পর্যন্ত এলোমেলো চুল, সিগারেট খায়। ও যখন এলো একজন সিপাহি পেছনে এল ওর বিশাল দুটো সুটকেস আর একটা বেডরোল নিয়ে। ডিভিশান না নেবার কোনো প্রশ্নই ওঠেনি। নিচের ওয়ার্ডেই রইল। ওর খুব ইচ্ছে ওপরে এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলার। আমরা স্নান করতে যাবার সময়ে একটু-আধটু কথা হয়। একদিন ওয়েলফেয়ার অফিসারের সঙ্গে কথা বলার ছুতোয় ওপরেও. এল। ওকে ওয়ার্ডাররা কিছু বলে না। কেন না ওর বাবা সপ্তাহে দুদিন ওর সঙ্গে দেখা করতে আসেন, ঘন্টাখানেকেরও বেশি জেলারের অফিসে বসে কফি ও স্ন্যাক্স দিয়ে সকলকে আপ্যায়িত করে প্রচুর আড্ডা দিয়ে যান। মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তাও সেখানেই সেরে যাবার সময় প্রচুর সিগারেট, লাইটার, শুকনো খাবার, কফি, গুঁড়ো-দুধ, সাবান, তোয়ালে ইত্যাদি দিয়ে, তার একসপ্তাহ ব্যবহারে ময়লা হয়ে যাওয়া জামাকাপড়, বেডশিট বাড়ি নিয়ে যান। মিমলুর মা নেই। সে দু'-একদিন গল্পকরার মধ্যেই আমাদের জানায় যে ফ্রান্সে মেয়েরা অন্তর্বাস পরা ছেড়ে দিয়েছে। মাসখানেক পরে মিমলু চলে যায়। প্রভাবশালী বাবাকে দিয়ে, আমাদের কিছু ভালো বই ও জার্নালস পাঠিয়ে দেবে এই আশ্বাস দিয়ে রেখে।

মা এসেছিলেন দেখতে। ছোট মাঈকে নিয়ে। দেখা হবার প্রহসনটা খোলা মনে একমাত্র সেই উপভোগ করল। কথা বলবার সময় চারপাশে লোকজন, সিপাহি, জমাদার, ডেপুটি জেলার ছাড়াও আমার ও মায়ের মাঝে বসে একজন গোয়েন্দা বিভাগের লোক। আমাদের উচ্চারিত প্রতিটা শব্দ সে লিখে নিচ্ছে। মাঈ আম্মার কাছে আসবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল। লোকটি হাত তুলে বাধা দিল। শুধু কথা বলার পারমিশান হয়েছে। মাঈ কচি মুখখানা থমথমে করে জিগেস করে—এতা কে ?

শুনলাম মাকে ওখানকার পুলিস দপ্তর থেকে সার্টিফিকেট এনে জমা দিতে হয়েছে। দু'দিন ধরে অপেক্ষা করার পর আজ পনেরো মিনিটের জন্য দেখবার পারমিশান পেয়েছে। এরকম করে ! তুমি আমার মা, সেকথা সার্টিফাই করবে পুলিস ! আর তার জন্য তোমাকে ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে ! আর এসো না মা।

একজন ওয়ার্ডার একদিন এসে খবর দিল বিমলাভাবী ছাড়া পেয়েছে। অনেক ফলটল নিয়ে এসে নাকি দু'দিন ধরে জেলগেটে ঘোরাঘুরি করেছে,

আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। না পেরে, শেষে পূর্বপরিচিত কোনো ফিমেল ওয়ার্ডারের হাতে কিছু ফল দিয়ে গেছে, আমাকে দেবার জন্য। এত তাড়াতাড়ি এতকিছু ভুলে গেল কী করে ভাবী?

একটি বাচ্চা মেয়ে এসেছে, বোবাকালা। পাগল। বছর আট-নয় বয়স। কাটাকাটা কালো মুখখানা, মাথায় কোঁকড়া চুলে ফিতে বাঁধা, হলুদ নেটের ফ্রক, পায়ে জুতোমোজা। কী করে হারিয়ে গেছে। দেখে দেখে কেবল ভাবি, ওর মা কেমন করে আছে। শিক্ষিত লোকেরাও তো জানে না যে হারানো বাচ্চাদের জন্য ঠিক কোথায় কোথায় খোঁজ করতে হয়। ওকে পাগলবাড়িতে রাখা হয়নি। সারাদিন একটা লম্বা দড়ি দিয়ে কাঁঠালগাছটার গোড়ায় বাঁধা থাকে। বাটিতে করে দুবেলা যে খাবারটুকু দেওয়া হয়, ছুড়ে ছুড়ে কাককে খাওয়ায়। আপন মুনে ঘুরে ঘুরে নাচে। হলুদ জামা ধীরে ধীরে নোংরা তারপর বর্ণহীন তারপর জীর্ণ হয়ে শেষে কখন খুলে পড়ে গেল! এখন আর বিজু সন্ধ্যাদের সঙ্গে ওর চেহারার খুব তফাত নেই। জটপড়া চুল, খালি পা, পরনে বোধহয় একটা ইজেরের মত কিছু। কেবল বিজু, রূপা, সন্ধ্যারা নিজেরা স্নান করতে পারে, আর ওকে স্নান করিয়ে দেবার কেউ নেই। নিজের শরীরের ময়লা ওর শরীরে জমে আছে। রাত্রেও ওয়ার্ডের মধ্যে এক পাশের গরাদে ওই দড়িটায় বাঁধাই থাকে।

ও যখন প্রথম এসেছিল, হলুদ জামায়-রিবনে-কোঁকড়া চুলে পুতুলটির মত। নিজেদের মধ্যে ওর নাম দিয়েছিলাম অম্বালিকা। রোজই আশা করতাম আজ হয়ত কোনো রকমে ওর বাড়ির লোকজন খোঁজ পেয়ে ওকে নিয়ে যাবে।

রোজই অনেকরাত্রি পর্যন্ত কোর্টের গাড়ি আসে। কোর্টে নিয়ে যাওয়া মেয়েরা ফেরে। কেউ বা ছাড়া পেয়ে, কি জামিন পেয়ে চলে যায়, অন্যরা আসে। বনগাঁ, ডায়মন্ডহারবারের কোর্টের গাড়ি ফিরতে রাত্রি এগারোটাও বাজে। আমরা অপেক্ষা করে থাকি, সকালে যারা কোর্টে গিয়েছিল তাদের জন্য। যদি নতুন কেউ আসে সেজন্যও। রাত্রের কম আলোয় গেটের মুখটা স্পষ্ট দেখা যায় না। একদিন বেশ চেঁচামেচি হল। খানিক পরে বড়দি ওপরে আসে। আজ ওর এখানে ডিউটি। চাপাগলায় হাসতে হাসতে বিবরণ দেয়—এক বিদেশী মহিলা এসেছে। কোট আর ট্রাউজার পরা। জমাদারের চেয়েও লম্বা। নিচের ওয়ার্ডের ডিউটি ওয়ার্ডার উপস্থিত সকলের কৌতুক জাগাতে ও বাবা এ মেয়ে নাকি! বলে সার্চের নামে কোনো অসভ্যতা করায়, জমিয়ে একখানি চড় খেয়েছে সে মহিলার হাতে। ক্ষীরোদা ছিল ডিউটিতে।

লোভ আর কুরুচির জন্য পরিচিত। আমরা বিমল আনন্দ পেলাম সুতরাং।

পরদিন সকাল থেকে নিচের উঠোনে সেই বিচিত্র চেহারাটি দেখতে পাচ্ছি। গড়পড়তা বাঙালি ছেলেদের থেকে বেশ লম্বা। ছিপছিপে চেহারায় কালো টাউজার্স ও সাদা স্পোর্টস গেঞ্জি পরা এক স্বর্ণকেশী মহিলা। গলায় একাধিক রঙিন পুঁতি ও পাথরের মালা। কপালে টিপ, তৎসঙ্গে পায়ে ঝুমঝুম শব্দ করা মল।

উঠোনের একপাশে আমাদের জেলের কাছাকাছি একটা আধমরা ছোট নিমগাছ আছে। তার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে থাকা মানুষটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, স্নান করতে যাবার সময়।

—তোমার দেশ কোথায়?

—আপাতত ইন্ডিয়ায়।

—জন্মসূত্রে ফরাসি?

—কী করে বুঝলে? তুমি ফরাসি জানো?

—না। তুমি এগুলো পরেছ কেন? এই চুড়ি, অ্যাংক্লেট?

—ইন্ডিয়ান কস্তুম বেলি গুৎ।

—এগুলো এই পোশাকের সঙ্গে পরে নাকি? ইন্ডিয়ান মেয়েরা তোমার মতো পোশাক পরে না।

—আই নো, আই নো ইন্ডিয়ান সালিস্ বেলি গুৎ—কান্‌ত ম্যানিজ—অল গো আউৎ।

ওরকম চেহারার মুখে এরকম অসহায় হতাশ একসপ্রেশান দেখে হাসি পেয়ে গেল, আর দ্রুত একটা মানসিক সম্পর্কও গড়ে উঠল বিয়েত্রিশে রাসোর সঙ্গে। ইংরেজি জানতো এতো কম যে কাজ চালানোও মুশকিল। ফ্রান্সের জাতীয় ভূগোল পরিষদের সঙ্গে যুক্ত মহিলা। ভিসা ফুরিয়ে যাওয়ার পর পুলিশ স্টেশনে রিপোর্ট না করে ঘোরাঘুরি করছিলেন। পুলিশ তুলে এনেছে। দিন চার-পাঁচের মধ্যেই দূতাবাসের কোনো কর্মচারী আসেন দেখা করতে। চলে যাবার আগে বিয়েত্রিশে একঝুড়ি কাপড়কাচা সাবান কিনে আনিয়ে, নিজের হাতে করে সেগুলো সাধারণ বন্দী মেয়েদের দিয়ে যান।

ওঁকে আলাদা করে মনে আছে, কয়েকটা কারণে। আমাদের কাছ থেকে অম্বালিকার ব্যাপারটা জানার পর, স্থিতিকালের সব চেয়ে বেশি সময়টা মহিলা অম্বালিকার কাছে থাকতেন। ওকে স্নান করিয়ে, খুলে দিয়ে, নিজের সঙ্গে করে রাখতেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে, অপরাধ নির্বিশেষে, ইউরোপীয় বন্দীদের জন্য যে সব আলাদা সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা আছে, সেগুলো প্রত্যাখান করে

সাধারণ খাবারই নিতেন মাদাম রাসোর। কতটুকু খেতেন জানি না, তবে একদিন পেটে হাত দিয়ে সেলের দরজার সামনে সিঁড়িতে বসেছিলেন। আরেকটা অভিনব কাজ—করেছিলেন মহিলা। প্রেসিডেন্সি জেলের তৎকালীন সুপাররিন্টেন্ডেন্ট, চালাকচতুর, খর্বকায় ভদ্রলোক, সাহিত্যিক যশোপ্রার্থী, নাকি দু-একখানা ফিল্মের স্ক্রিপ্টও লিখেছিলেন। উনি ওয়ার্ডে রাউন্ড দিতে এলে, বিয়েত্রিশে কোমর থেকে দু'ভাঁজ হয়ে একটি বাও করে, প্রায় ব্যালে নাচের ভঙ্গিমায় তাঁকে পথ দেখিয়ে মেয়েদের জেনারেল ওয়ার্ডের বড় ঘরটার দিকে নিয়ে যেতে থাকেন। সুপারের বিগলিত হাসি-হাসি মুখ আস্তে আস্তে পরিবর্তিত হতে হতে শেষে একেবারে হতভম্ব হয়ে যায়, যখন বিয়েত্রিশে তাঁকে নিয়ে হাজির করেন, চল্লিশটির বেশি মেয়ের বারোঘন্টার বেশি সময় বন্ধ থাকাকালীন ব্যবহার্য একটিমাত্র পায়খানা নরকের সামনে।

স্বাতীর অসুস্থতা আবার বাড়ছে। মাঝে মাঝেই কাঠের তক্তার মত শুয়ে থাকতে হচ্ছে কম্বলে। রিউম্যাটিজমের প্রতাপে নাড়াচড়া বন্ধ। মুখ টকটকে লাল, প্রেসার বাড়ছে। ডাঃ চ্যাটার্জির দয়ায় আমরা সবাই berin ইঞ্জেকশনের নাম শিখে নিয়েছি। ওটা দেবার আগে বা পরে চিকিৎসার আর কোনো ব্যাপার নেই। অবশ্য এর আগে একবার হঠাৎ স্বাতীর জন্য একশিশি 'শার্কো ফেরল' এসেছিল। সারা বর্ষাকালটা ধরে তরকারি হিসেবে আসছে কেবল ঢ্যাঁড়সসেদ্ধ। স্বাতীর জেদে আমরা দিন কতক 'শার্কোফেরল'টা রাত্রে রুটিতে মাখিয়ে খেলাম।

মায়া যে ছেলেমানুষ সে কথা জীবন ওকে প্রায় ভোলাতে বসেছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ বুঝি ওর মন পোড়ায়। আর তাতে ও নিজে ভারি লজ্জা পায়। দুপুরে সেদিন স্বাতী, ডালিয়া দু'জনেরই কোর্টের ডেট। কৃষ্ণাদেরও ট্রাইবুনালের দিন। স্নিগ্ধাকে নিচের ওয়ার্ডে দেওয়া হয়েছিল। ও সেখান থেকে জামিন নিয়ে চলে গেছে। দোতলার বারান্দায় দুপুরে শুধু আমি আর মায়া। বসে থাকতে থাকতে কোলের ওপর মাথা রেখে হঠাৎ কচি মুখখানা অন্ধকার হয়ে আসে।

দিদিরে আমারও মা নাই, তারও মাইয়াটা কাছে নাই—তুই বেশ আমার মা!

আর হাতটা মাথায় ছুঁইয়েছি কি ছোঁয়াইনি, যেন নিজের কাছেই বেজায় অপ্রস্তুত। লাফ দিয়ে উঠে বসে।

দূর্, দিদি, তুই বেশ জহরলালের বুইড়্যা বাবা—বইয়া থাক, চা লইয়া আসি।

দুদ্দাড় করে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নিচে পালিয়ে যায়।

এরকম অঝোরে বৃষ্টি পড়লে মাঝে মাঝে যখন গ্রামে ছিলাম সেই কথা মনে পড়ে। বিরাট আকাশের নিচে কেমন বিশাল খেত, মাঠ। আলোর কাটামুখ দিয়ে এক খেত থেকে অন্য খেতে ঝরঝর করে জল পড়ার শব্দ। পায়ের নিচ দিয়ে জল বয়ে গেলে, ওরকম ক'রে ছুঁয়ে অনুভব করা গেলে, সমস্ত শিরায় স্নায়ুতে কী যে এক অদ্ভুত আনন্দ হয়। এই বর্ষার গ্রামে কিছু খাবার থাকে না। ধানখেতের জল থেকে কুচোকুচো মাছ ধরেছিল বাচ্চারা। কাঁচা শালপাতায় মুড়ে পোড়ানো হল।

মায়াকে দেখলে অনেক সময় দিলীপের কথা মনে হয়। এরকম বর্ষায় আরও বেশি। কি ভালোবাসা পেয়েছি ওর কাছে!

সত্তর সালের বর্ষাকালে একটা অদ্ভুত সপ্তাহ এসেছিল। জুলাই মাসের সমস্তটা সপ্তাহ ধরে একটানা বৃষ্টি পড়ল। ডাক্তার বলেছিলেন প্লাস্টার করা তো সম্ভব নয়। কোন শক্ত চৌকির ওপর অন্তত ছ'সপ্তাহ একেবারে সটান শুয়ে থাকলে পিঠের হাড়ের চোটটা সারতে পারে খানিক। ফলে শহরের প্রান্তে একটা বাড়িতে ব্যবস্থা হয়েছে শুয়ে থাকা। সে বাড়িতে কেউ বাস করে না সেভাবে। সারাদিন বিড়িশ্রমিকরা সামনের দিকের দুটো ঘরে বসে বিড়ি বাঁধেন। রাত্রে তাঁরাই কয়েকজন পেছনের একটা ঘরে ঘুমোন। বড় ছড়ানো বাড়ির অসমাপ্ত কাঠামো। কাদা দিয়ে গাঁথনি করা ইটের দেওয়াল, চারপাশে উঁচু পাঁচিল। সামনের মুখে একটা গলি। কিন্তু পিছনে বিশাল মাঠ, কনকধুতরো আর পুটুশের জঙ্গল। সেদিকে মাঠে মাঠে কয়েকমাইল হাঁটলে একেবারে অন্য অঞ্চলে গিয়ে ওঠা যায়। সেদিনটা রবিবার। দুপুরবেলা দিলীপ আর অন্য একজন এসেছে খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া করতে আর খানিকটা সাবধানতার জন্যও। বেলা তিনটে নাগাদ পাড়ার একটি ছোটমেয়ে, সে লোকের বাড়ি বাসন মাজে, ব্যস্তভাবে বলে গেল গলির মুখে বড়রাস্তায় পুলিশের বড় গাড়ি আর জিপ দাঁড়িয়েছে। তাকে খবর দিয়ে যেতে বলেছে বড়রা। পাঁচিলের একটা জায়গা মাথাসমান উঁচুর পর ভাঙা, সেটা আগেই দেখা ছিল। নিমেষেই ঠিক হল দিলীপ আর আমি পাঁচিল পার করে চলে গিয়েছি দেখে অন্য কমরেডটি পাড়ায় ঢুকে পড়বে। ভাঙা জায়গাটার পাশে একটা ছোটমত কুলগাছ আছে দেখেছিলাম কিন্তু খেয়াল করিনি। এখন চুল আর শাড়ি সেই কাঁটায় জড়িয়ে যাচ্ছে, ফলে দেওয়াল না ধরে ওঠা যাচ্ছে না। বৃষ্টির জলে কাদার গাঁথনি গলে গেছে। প্রথম যে ইটটা ধরে পাঁচিলে উঠতে গেলাম সেটা আমার হাতে খুলে এল। সময় পালিয়ে যাচ্ছে। দিলীপকে

চেনে না পুলিস। ওকে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া খুব জুরুরি।

—দিদি, ইট পড়ুক, তুমি উইঠে পড়।

তাই করেছিলাম। হাতের ইটটা খসেও গেছিল কিন্তু পিঠে পড়েনি। আমরা যখন সমস্ত মাঠডোবা জলের মধ্যে দুটো কনকধুতরোর লাঠি বাড়িয়ে পুকুর-ডোবা ঠাহর করতে করতে খানিকদূর গিয়েছি তখনও পেছনে কোনো কোলাহল শুনিনি।

চোখে পড়ল দিলীপের জীর্ণ শার্টের পিঠের মাঝখানে রক্ত ফুটে উঠেছে। দিদির ভাঙা শিরদাঁড়ায় আবার চোট লাগলে যদি উঠতে না পারে তাই পাখির মায়ের মত পিঠের ওপর নিজের শরীর আড়াল করে ইটটা নিয়েছে। ওর বাবা বিড়ি-শ্রমিক। যে খবর দেওয়া-নেওয়ার কাজ কাউকে দেওয়া যাচ্ছে না, যে জিনিস রেখে আসবার কাজ করে দেবার মত কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না—দিলীপ একপায়ে খাড়া। এমনি বর্ষার রাত্রে অন্ধকারে মিটিং করে অন্ধকারেই বস্তিতে ফিরছি। গলির মোড় থেকে সাথীরা ফিরে যাচ্ছেন। কুচকুচে অন্ধকারের মধ্যে কার একটা হাত! একেবারে চমকে উঠছি—কী রে! খুব ফিসফিস করে, দিদি আমি—দিলীপ। আর তার সঙ্গে ভারি নরম গলায়— দিদি আমি কতদিন তুমাকে চোখে দেখি নাই! তারপর তো দেখলাম থানার খটখটে আলোর নিচে। মাঝরাতে তুলে এনেছে পুলিশ। গভীর ঘুম থেকে টেনে তুলেই আচমকা মেরেছে, তখনও সদ্য ঘুমভাঙা, কেমন একটা বিস্ময় জড়িয়ে আছে চোখে। যে একটা চোখ খোলা আছে, সেটায়। অন্যটা কপালের রক্তে আর ফোলায় বুজে গিয়েছে।

দিদি আমি কতদিন তুমাকে চোখে দেখি নাই!

আর এখন সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে একেবারে অকম্প স্বরে,

বাবুঘরের দিদিমণি বটে, আমি কী কইর‍্যে চিনব? হামরা তো শহরকে যাই নাই।

সকালে মায়া এসে খবর দিয়েছে।

দিদিরে, কাইল একটা নেপালি পাগলিরে আনছে রে দিদি! কি লম্বা! নিচের সেলের সামনে দূর থেকে ঘুরে যেতে দেখি ওয়ার্ডারদের, লালমোতিকে। স্নান করার সময়ে গেলাম। আমাদের নিচের যে সেলে আগে স্বাতী-স্নিগ্ধা, তারও আগে কৃষ্ণা ছিল, তার সমস্ত দরজাটা জুড়ে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। সম্পূর্ণ অনাবৃত শরীরে দাঁড়িয়ে গালাগালি দিচ্ছে। ওয়ার্ডার ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসে, ও নাকি ভয়ংকর হিংস্র স্বভাবের পাগল। পায়ে বেড়ি দিয়ে আনতে হয়েছে। পায়ে ঘা আছে। লালমোতি ওষুধ নিয়ে গিয়েছিল, থুতু ছিটিয়ে,

কুৎসিত গালি দিয়ে তাকে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। নেপালি ভাষাটা আবার কাজে লাগল। আয়তামাঙ্গীয়ের পর এই আবার। গালাগালির তোড়টা থমকাল। আমি যে ওয়ার্ডার নই, পুরো পোশাক পরা থাকলেও সেলের বন্দী, এটা বোঝবার পর থামল। স্বাভাবিক বুদ্ধি আছে। তাহলে ? কী হয়েছে তোমার ? কী হয়নি ? দার্জিলিং থেকে প্রিজনার্স ভ্যানে কলকাতায় আসা, এই অন্ধকার, দুর্গন্ধ, ভিজে সেল, অনাহার এবং সর্বোপরি এই আপাদমস্তক নগ্নতা। তার সঙ্গে আরও যা, সেটা তখনও দেখিনি। আমাদের সকালের খাওয়া বাকি ছিল। ডালিয়া রুটিগুলো কাগজে জড়িয়ে বারান্দার ফাঁক দিয়ে নিচে ফেলল। কিন্তু কাপড় ?—একটুকরো কাপড় দাও আমাকে। কী করে এই...গুলোর সামনে এরকম হয়ে থাকব ? উঠোনে বাচ্চারা আছে, দেখতে পাচ্ছ না ? কিন্তু কী করে কাপড় দেব আমরা ! দিলেও তো ওয়ার্ডার এক্ষুনি কেড়ে নেবে, আমাদের আর একেবারে আসতে দেবে না তোমার কাছে। আমরা বলব, ডাক্তারকে, জেলারকে। পরনের পোশাক নিজেদের এত লাঞ্ছনা দেয়নি কখনও। এরা মায়ের জঠরে জন্মায়নি, যারা সাফাই খাটনির লোকদের কাজ করাতে নিয়ে এসে, উঠোনে দাঁড়িয়ে খৈনি টিপতে টিপতে টুরার দিকে তাকিয়ে আছে ?

তোমাকে ওষুধ দিয়েছিল, লাগাওনি ?

আবার প্রায় ফেটে পড়ল টুরা !

ওটা ওষুধ ? অমনি করে ওষুধ লাগায় ? জায়গাটা ধুলো না, ডিসইনফেক্ট করল না ! ময়লা তুলোর মধ্যে খানিকটা মার্কুরোক্রোম দিয়ে দিলেই হয়ে গেল ? বেশ কিছু শব্দের বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ শুনে নয়, পুরো বক্তব্যতেই এবার চমকাই আমি। তুমি কী করে জানলে এসব করতে হয় ? কী হয়েছে তোমার ? দ্যাখো কী হয়েছে—গরাদের সামনে আলোয় বাড়িয়ে ধরে ফর্সা ভারী পা। পাগলদের তো বোধশক্তি থাকে না, আর যে বোধ করতেই পারে না, তার আর ব্যথা কিসের—এরকম যুক্তিতেই বোধ হয় প্রমাণ মাপের একটা হাতকড়া, একটু টাইট হলেও পায়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর প্রায় সতেরো আঠারো ঘন্টা চলন্ত গাড়িতে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা। পাগলের শরীরও কিন্তু নিখুঁত শারীরিক নিয়মেই চলেছে—ফুলেছে। পায়ের পাতা কালো আর বেগুনী হয়ে গেছে রক্তজমে। হ্যান্ডকাফের ধার ধরে, নখের পাশ ধরে ধরে ফেটে ফেটে গিয়েছে। সেলে বন্ধ করার সময়ে, বেড়িটা অবশ্য খুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই পায়ের দিকে বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। অন্তত বরফ দিয়ে খানিকটা ঘষলেও হয়ত একটু যন্ত্রণা কমত। টুরা জানবে না

কেন? ও নাকি নার্স ছিল, সিকিমের কোন হাসপাতালে।

স্নান করে ফিরবার সময়ে আজকে ওয়ার্ডের সাথীদের সঙ্গে একটু কথা বলি। ঝুমা ধরা পড়ার সপ্তাহখানেক আগে, মেয়েকে না পেয়ে সপ্তমীর দিন ঝুমার শান্তস্বভাব বাবাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল খাকিরা। একাদশীর দিন মৃতদেহ ফেরত দিয়ে গিয়েছে! খবরটা আমাদের কাছে এল প্রায় দিনকুড়ি পরে। ঝুমা এমনিতেই শান্ত, স্থির স্বভাব। ডালিয়ার কেস সেশান কোর্টে উঠেছে। এ ব্যাপারে ডালিয়া ছাড়া, আমরা আর সবাই একটু-আধটু উদ্বিগ্ন। এখনও আর কোনো মেয়ের কেস সেশানে যায়নি। ডালিয়া এখানে থাকাকালীনই মারা গিয়েছে ওর বাচ্চা ভাই। এই শোকেতাপে অস্থির অবস্থায় দোকানের লাইসেন্স হারিয়ে ফেলেছেন ওর বাবা। ওর মা কাঠের সিঁদুর-কৌটো রং করে সংসার চালাচ্ছেন এবং এসমস্ত খবরের একটাও তিনি ডালিয়াকে বলেননি পাছে ওর মন দুর্বল হয়। বহু বিপর্যয়ের পর লালবাজারের লক-আপে মেয়ের ক্ষত-বিক্ষত মুখ কান গলা দেখেও এই মা প্রথমেই জিগেস করেছিলেন, কাউকে ধরিয়ে দাওনি তো?

টুন্নার কথাটা নিয়ে উত্তেজিতভাবেই গেলাম ওয়েলফেয়ার অফিসারের কাছে। টুন্নার পা, টুন্নার কাপড়। তিনি সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। একটু বিস্ময়ও প্রকাশ করলেন। কেন না উনি এর আগের রিপোর্ট পেয়েছিলেন সরযূদের কাছ থেকে। একদিন বোধহয় টুন্নার পা ধুয়ে ওষুধ লাগানো হল মেট্রনের উপস্থিতিতে। কাপড় দেওয়া গেল না। পাগলদের কাপড় দেওয়া হয় না। যদি জড়িয়ে গলায় দড়ি দেয়, কে দায়ী হবে? তার বদলে এক অভিনব আবরুর ব্যবস্থা হল। অন্ধকার সেলটার সামনের দিকের একমাত্র দরজাটা, আধাআধি পর্যন্ত ঢেকে দেওয়া হল একটা ছেঁড়া চট দিয়ে।

বিকেলের মুখটায় ডালিয়া খুব ব্যাজার মুখ করে দেয়ালে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে আছে, ভালো করে কথার জবাবও দিচ্ছে না। অনেকক্ষণ ওকে বিরক্ত করার পর জানা গেল কোন ওয়ার্ডারের কাছে খবর পেয়েছে, আজ তিনদিন ধরে ওর মা সকাল থেকে এসে জেল গেটে দাঁড়িয়ে থাকছেন ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য। তিনদিন ধরেই সমস্তদিন অপেক্ষা করানোর পর, বিকেলবেলা তাঁকে বলা হচ্ছে আজ দেখা হবে না।

দুপুরে আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস আর অর্থনীতি ছাড়াও, পড়ছি ইলিয়া এরেনবুর্গের 'ঝড়'। ভাবা যায় না এতবড়ো ক্যানভাসে কেউ এরকম দাপটের সঙ্গে কাজ করতে পারেন। ফ্রান্স-রাশিয়া-জার্মানি বিস্তৃত পটভূমি। একটি রুশ গ্রামের অবশিষ্ট সমস্ত নারী ও শিশুর সঙ্গে, লাল ফৌজের এক নারীযোদ্ধার

শিশুকন্যা ও তার ঠাকুরমাকে গুলি করে মেরে ফেলে ফ্যাশিস্তরা। বাচ্চাটির ছোট্ট লাল জুতোজোড়া পড়ে থাকে ফাঁকা গ্রামে। আমি কিছুতেই জোরে পড়ে শোনানোর মত কম্পোজার বজায় রাখতে পারি না। বাড়িতে ছোট্ট মেয়ে আর মা ছাড়া আছে কেবল বোন। এছাড়া, বহু কষ্টে ভেতরে আনা হয়েছে রাসেলের 'War Crimes in Vietnam।' রাত্রে একা বা দু'জন করে থাকবার সময়ে সেটা পড়ে নিচ্ছি। চিলির সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হলেন পাবলো নেরুদা। ...there is children's blood in the street and there is children's blood in the street and there is... কেন ? কাকে বলব ? কার কাছে জবাব চাইব পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যকর্মীর হয়ে ? লোরকা 'রোঁম্যাঁরল্যা-নেরুদা সুব্বারাও পানিগ্রাহী চিলির পদচ্যুত প্রেসিডেন্টের বিধবা স্ত্রী মাদাম আলেন্দে ও তাঁর কন্যা এসেছেন কলকাতায়। ময়দানে তাঁদের সম্মানার্থে ডাকা জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, রাজনীতির মোকাবিলা রাজনীতি দিয়েই হওয়া উচিত। রাজনৈতিক বিরোধীদের হত্যা করা বা বিনাবিচারে বন্দী করে রাখা, গণতন্ত্রের রাস্তা নয়। সেলের বারান্দায় বসে আমরা খবরের কাগজে সেই বিবৃতি পড়ি। আমার বিনাবিচারে প্রায় তিন বছর। কৃষ্ণার আর একটু বেশি—ট্রাইবুনাল চলেছে। স্বাতী-ডালিয়া-বিজু-শ্বেতা-রীতা-ঝুমা-স্মৃতি !

টুরা দেখি সকালের জলখাবারের রুটির ছোট ছোট টুকরো দরজার গরাদগুলোর সামনে সাজিয়ে রেখেছে। আমি গিয়ে দাঁড়াতে খুব স্বাভাবিকভাবে আলাপ করিয়ে দিল, 'ইয়ো মেরো পাপা ছ, ইয়ো মেরো জেঠা দাজু, ইয়ো মাইলা, অরু ইয়ো মামা। সকলকে গুডমর্নিং করে রুটি খেতে দিয়েছে অথচ কেন যে খাচ্ছে না, এই বাবা, বড়দাদা, মেজদাদা এমন কি মামা !

সপ্তাহে একদিন করে পাগলদের জন্য যে ডাক্তার এসে হাসপাতালে বসেন, তিনি কেস হিস্ট্রি দেখে বলেছেন, সিকিমের কোন দাঙ্গায় খুন হয়েছেন ওর সমস্ত আত্মীয়-স্বজন।

মায়া কী করে যেন কোলে করে এনেছে মাখনের দলার মত একটা বাচ্চাকে। ওর মা নাকি পাগল। এসেছে আজ দিন পাঁচেক হল। মুকুলের মতন পাগল নারে দিদি এই বউটার খুব কষ্ট। অর ছয়বছরের মাইয়াটারে অর সোয়ামী জানি কুনখানে বিক্রি কইর‍্যা দিছে, তাইতে কাইন্দা কাইন্দা পাগল হইছে। আর দ্যাখ না, এই বাচ্চাটা হ[illegible]র লাইগা হাসপাতালে ভর্তি কইর‍্যা দিয়ে যে পলাইছে, পাঁচ মাস হইতেও [illegible] আসে নাই। হাসপাতালের সিস্টার দিদিমণিরা বাচ্চাটারে পালছিল, তাও তো অর মায়ে পলাইয়া মাইয়াটারে খুঁইজ্যা খুঁইজ্যা বেড়ায়—পাগল দেইখ্যা পুলিশে আনছে।

বাবা আবার মেয়েকে বিক্রি করে? করে না! মায়ার চেয়ে ভাল কে জানে! বাংলাদেশের যুদ্ধের আগে এদেশে এসেছে ওরা। ওর বাবা দু'শ-টাকায় মায়াকে বিক্রি করেছিল যে লোকটার কাছে তার ছেলেমেয়ে মায়ার চেয়ে বড়। রাত্রে সেই লোক আর দিনে তার অনুপস্থিতিতে তার ছেলে নিয়মিত ব্যবহার করেছে মায়াকে। আমাদের এই চঞ্চল হাসিমুখ কিশোরী মায়াকে। প্রায় এক বছর। তারপর একদিন কোনরকমে ঘরের দরজা খোলা পেয়ে সমস্তদিন প্রাণপণে ছুটে অশোকনগর থেকে মায়া পৌছতে পেরেছিল বালিগঞ্জে। সেখানে একটি কাজকরা মেয়ে ওকে মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখে নিজের ঘরে তুলে আনে। আশ্রয় দেয়, কাজও ঠিক করে দেয়। কাজকরা, মানুষের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক, 'দিদি'র ঘরের আশ্রয়—সেই কটা মাস যেন মায়ার কাছে একটা স্বপ্নের মত। এমনকি, কাজের বাড়ির সেই বাচ্চা দুটো, তাদের হাসি-কথা তাও। কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয়নি সেই সুখ। কাজ সেরে 'দিদির' ঘরে ফেরার পথে, ফাঁকা রাস্তার আধো অন্ধকার মোড়ে, ক'টি ছেলে নানা রকম মন্তব্য করতে করতে ওর পিছু নেয়! ভয়ংকর সমস্ত স্মৃতি মায়াকে এমন আতঙ্কিত করেছিল যে ও চিৎকার করে ছুটে ছিল রাস্তা দিয়ে। বড়রাস্তায় পুলিশের গাড়ি ওকে থামায়। রক্ষাকল্পে তুলে নিয়ে নিরাপদ রাষ্ট্রীয় আশ্রয়ে পৌছে দেয়। মায়া আসামী নয়। ও হল সেফ কাস্টডির মেয়ে! আসামী হলে কেস চলত, সাজা হত, সাজা ফুরোলে ছাড়া পেত। ওকে যতদিন কোনো অভিভাবক এসে কোর্টে পরিচয় দিয়ে ছাড়িয়ে না নিয়ে যাবে, ততদিন ও এখানেই থাকবে। বন্ধ সিন্দুকের মত নিরাপদ আশ্রয়ে।

প্রথম দু-একদিন মায়া বাচ্চাটাকে নিয়ে আসত ওয়ার্ডারকে লুকিয়ে। সেটা কিন্তু আর বেশিদিন লুকোনো গেল না। যাওয়ার কথাও নয়। সুতরাং আমরাও খোলাখুলি হলাম। ওয়ার্ডারদের নিজেদের মধ্যে চুরির জিনিসের বখরার কমবেশি নিয়ে, সময়ে সময়ে ঝগড়া বা আমাদের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করার দরুন, ওদের ভেতরের অনেক কথা আমরা জানি। সিপাহি-ওয়ার্ডার—এদের আবার ব্ল্যাকমেল কী! ওরা আমাদের ভয় দেখাবার সাধ্যমত চেষ্টা করে। সুযোগমত নিজেদের নিঃশ্বাসের বাতাসটুকুর জন্য ওদের একটুখানি পাল্টা ভয়ে রাখা। সুতরাং প্রতিদিনই সকালবেলা দরজা খুললেই মায়ার কোলে করে ও আমাদের এখানে চলে আসে। সমস্তদিন থাকে। বিকেলবেলা মায়ার সঙ্গেই চলে যায়! ওয়ার্ডারের সঙ্গে আমাদের এই অলিখিত চুক্তি হয়েছে যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যাতে এটা জানতে না পারে, সে ব্যাপারে আমরা সাবধান হব। ওদের ধরন-ধারণ সবচেয়ে ভাল বুঝতে পারে কৃষ্ণা।

ওর খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা খুব তীক্ষ্ম। যার ফলে বহুবার অন্যদের ব্যবহারের সামান্য তারতম্য থেকেই, আগাম বিপদের আঁচ পেয়ে আমরা সাবধান হয়ে যেতে পেরেছি। বাচ্চাটা আমাদের কাছে এল ঘাসে ভরা খোলা মাঠের মতন হয়ে। একটা সত্যিকারের বাচ্চা—ঠিক যেরকম বাচ্চারা হয়। এখনও ওর কোনো কিছুই জেলের মত নয়। আমরা ওর নাম রেখেছি ফুচিক। কিন্তু অনেকবার পরস্পরকে সচেতন করে দেওয়া সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত ওটা হয়ে দাঁড়াল বুচকু। আর ঠিক বুচকুর মতই দেখতে। বড়ির মত একটা নাক। ফুলো ফুলো গালের ওপর নীলচে কাচের গুলির মত স্বচ্ছ চোখ। ডান পায়ের ফর্সা উরু জুড়ে মস্ত বড় একটা লাল জড়ুল হঠাৎ দেখতে প্রায় জবাফুলের মতো। ওর মাকে চুপিচুপি ধমকাবার চেষ্টা করে বিশেষ লাভ হয়নি। কেন যে তার নিজেরই উৎসাহ বুচকুকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেবার। খুব রোগা, প্রায় নিঃশব্দ মানুষটির মন কেন কি জানি, সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গাটাতেই ওর বাচ্চার নিরাপত্তা খুঁজে পেয়েছে। আমাদের বন্ধ দিনগুলি এখন বুচকুকে নিয়ে উষ্ণ উত্তেজনায় ভরপুর। এক একদিন ওকে নিয়ে আমাদের দুপুরের পড়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। কোর্ট থেকে বাইরে যাওয়া থেকে আবার এখানে ফিরে আসাটা, মুখে কেউই স্বীকার না করলেও, প্রতিবারই এক কঠিন পরীক্ষা ছিল। কিন্তু এখন বুচকু এক সত্যিকারের মায়া। দুটো ব্লাউজ ছিঁড়ে ফেলে কোনোরকমে ওর জন্য দুটো পরিস্কার জামার মত বানানো গিয়েছে। দুধ পাবার তো প্রশ্ন ওঠে না তাই ছ-সাত মাসের বুচকুকে সাধ্যমতো শিশুখাদ্য বিধি মেনে আমরা পেঁপেসেদ্ধ, আলুসেদ্ধ, চিনির জল খাওয়াই। রাত্রে যখন নিচের ওয়ার্ডে চলে যায়, তখন মায়ার মঙ্গে ওকে নিয়ে থাকে বিজু। বুচকুকে উপলক্ষ করে ওয়েলফেয়ার অফিসারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা একটু সহজ হল। পাশাপাশি সেলে সারাদিন কাটালেও উনি খানিকটা এমনভাবে যাওয়া আসা করতেন, যেন আমরা ওখানে নেই। আমাদের দিকে থেকেও 'Listners'-এর প্রথম লাইনের স্তরটা পেরিয়ে এলেও, ওঁর সম্পর্কে দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়টা স্বাভাবিক এবং সর্বসম্মত। কিন্তু এসব সচেতন বিচক্ষণতায় বুচকুর কী-বা আসে যায়! সে চোখের পলকে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ে ওয়েলফেয়ার অফিসে। মায়া তাকে তুলে আনতে আনতে চাপা তর্জন করলে, সামনের চারখানা দাঁত পুরো দেখিয়ে হাসে। এক একদিন ওয়েলফেয়ার অফিসার অফিসের দরজা পর্যন্ত উঠে এসে ওর ব্যাপারে একটা-দুটো কথা বলেন। বোধহয় বুচকুর ঢুকে পড়াটাকে সহজ করে দেবার জন্যই। একদিন কোন সংস্থা থেকে গোটা

কুড়ি বাচ্চাদের জামা নিয়ে এলেন ভদ্রমহিলা। ওয়ার্ডের সব ছোট বাচ্চাদের জন্য। অত্যন্ত অফিসিয়াল ধরনে আমাদের নয়, বুচকুর মাকে ডেকে দুটো জামা তার হাতে দিলেন।

এ সবের মধ্যে দিয়ে. বোধহয় আমাদের সম্পর্কে ওয়েলফেয়ার অফিসারের কৌতূহল বাড়ছে। মাঝে মাঝে ফাঁকা দুপুরে, অফিস থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের সেলের দরজায় দাঁড়িয়ে, একটু একটু গল্প করেন! প্রথম প্রথম খুব সন্তর্পণে রাজনীতি, পুলিস, কি জেলের অত্যাচার, বাইরের খবর এই সব বিপজ্জনক বিষয় বাদ দিয়ে প্রধানত আমাদের খোঁজ-খবর নেওয়া, বুচকুর হাবভাব ইত্যাদিতেই সীমাবদ্ধ থাকতেন। তারপর অবধারিত ভাবেই ধীরে ধীরে উঠতে লাগল এখানকার অভাবনীয় বিশৃঙখলা, মেয়েদের দুরবস্থা, পাগলদের খাবার থেকে অবিশ্বাস্য চুরি, ওয়ার্ডারদের কার্যকৃতি। আর তাই যদি বলতে না-পারব তাহলে আমরা ওঁর সঙ্গে কথাই বা বলতে. যাব কেন! আরেকটা কথা ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম, ভদ্রমহিলা এখানকার কোনো খাবার খান না। একফোঁটা জলও না, আক্ষরিকভাবেই। সারা দিনের খাবার জল বাড়ি থেকে নিয়ে আসেন। এবং এই ওয়ার্ডের অ্যাডমিনিস্ট্রেশান অর্থাৎ মেট্রন ওয়ার্ডার এবং শিখা সরযূর সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক খারাপ। যদিও চাকরির অঙ্গ হিসেবে সরযূ-লালমোতি দু'জনেরই আপিলে আসামীপক্ষের হয়ে উনিই লড়েছিলেন। লড়েছিলেন অবশ্য সুরভি দত্তের জন্যও। সেকথা অন্যত্র।

তবে ওয়েলফেয়ার অফিসার এই অফিসে নিয়মিত বসবার ফলে আমাদের অন্য একটা ভালো হল। জাজমেন্ট কপি পড়ানো, বাড়িতে চিঠি লেখা, কোনো বিষয়ে অসুবিধা জানানো ইত্যাদি, নিজেদের হাজার রকম সমস্যা নিয়ে সব মেয়েরাই ওপরে আসতে পারে। আর ওই দেড় হাত চওড়া বারান্দায় দাঁড়াতে হলে অন্যান্য সেলগুলোর সামনে ছড়িয়ে না দাঁড়ালে উপায় কী! মাসে মাসে আমরা এমনকি ওদের বাড়িতে চিঠিপত্রও লিখে দিই। প্রায় মাস দুই চলেছিল এই ব্যবস্থাটা। অর্থাৎ যতদিন না জেলারের কাছে কমপ্লেন গেল যে ওয়েলফেয়ার অফিসার অন্যান্য মেয়েদের ডেকে আমাদের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিচ্ছেন এবং বন্দীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার কাজটা নিচেই সমাধা করার নির্দেশ এল।

এর মধ্যে একদিনের একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দুপুরে খাবার আসবার জন্য গেট খোলা হয়েছে। হঠাৎ দেখি বিনা এত্তেলায় গেটের ঘন্টা না বাজিয়েই জন চারেক সিপাই নিয়ে জেলার ভেতরে ঢুকছেন। সোজা চলে আসছেন আমাদের সেলের দিকে। বারান্দায় ছিলাম। আমরা লাফ দিয়ে সেলে ঢুকে

পড়ে ভেতর থেকে দরজা টেনে দিতেই, ওয়ার্ডার তালা দিয়ে দিয়েছে। তার তো চাকরি বাঁচাতে হবে, আবার আমাদের এখানে ডিউটিও করতে হবে। কিন্তু আমরা ঢুকে পড়লে কী হবে ! বুচকু যে রয়েছে ওপরে। আসবার ধরন দেখেই আন্দাজ করা যায় বুচকুর ব্যাপারে রিপোর্ট পেয়েই আসা। কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। সেলের ভেতরে নির্বিকার মুখে বসে আমি খবরের কাগজ হাতে নিয়ে। ওয়েলফেয়ার অফিসারের দরজায় গোড়ায় কাঠের 'গুডমর্নিং'। আমাদের আর কী হবে ! সলিটারি কনফাইনমেন্টের পর আর তো কিছু হবার নেই কিন্তু বুচকুকে নামিয়ে নিয়ে চলে যাবে। আর আসতে দেবে না। আর কোলে করতে পারব না। ছোট ছোট হাত ছোট্ট নাক-নীল চোখ। পাঁচজোড়া বুট, মেট্রনের ঘাঘরা সেলের দরজা পেরিয়ে গেল। এই তো দশবারো হাত লম্বা, দুহাত চওড়া বারান্দার ফোকর। ও মাথা পর্যন্ত গিয়ে, থেমে, ফিরে যাচ্ছে শব্দগুলো। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। হাসপাতালের দরজাতেও না থেমে সটান বেরিয়ে গেলেন সপারিষদ প্রভু। একটু পরে ওয়ার্ডার এসে তালা খুলে দেয়। সেও অবাক। বুচকু তো নেই ! কারো সঙ্গেই সেলে ঢোকেনি। মায়াও খাবার নেবার জন্য নিচে ছিল। তবে ! ব্যস্ত হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি আমরা। আর আমাদের হতভম্ব চোখের সামনে—শেষ সেলের দরজাটার গোড়ায় বুচকুর ফোকলা হাসি। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসছে। শেষ সেলটার দরজা দিনের বেলা খোলাই থাকে। আমাদের কিছু কম্বল, কিছু খবরের কাগজ ইত্যাদি জড়ো করা আছে ওর মধ্যে। তার নিচে গিয়ে ঢুকেছিল। ওর আটমাসের মাথা কী করে বুঝল বুটের শব্দ থেকে লুকোনোর কথা ! গায়ে কম্বলের ধুলো, মাথায় মাকড়সার জাল লেগে আছে।

কাগজ বলছে বাইরে এমার্জেন্সি ঘোষিত হয়েছে। দেশ নাকি হু-হু করে উন্নতির বাতাসে পাল তুলে এগোচ্ছে। শুধু ভেতরের বাতাস নড়ে চড়ে না—অন্ধের কিবা রাত্রি, কিবা দিন। তবু আলমীডা বলে একটি গোয়ানিজ মেয়ে দিনচারেক হল এসেছে। ওয়েলফেয়ার অফিসে এল। তার কাছে কিছু কিছু শুনলাম মানুষজনের অবস্থা। সে এক অফিসের স্টেনো। কিছু আপত্তিজনক কথা বলায় উর্ধ্বতন অফিসারকে এক চড় মেরেছে। বিচারে একমাস জেল। আলমীডা আফসোস করছিল, জেলেই যখন এলাম লোকটাকে ভাল মত মার দিয়ে এলাম না কেন ! ওর কাছেই শুনলাম শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নগুলোর হাল।

সারা দেশে নাকি কড়া র‍্যাশনিং চালু হয়েছে। জেলে খাবারের পরিমাণ

কমতে কমতে ঠিক একহাতা ভাতে এসে ঠেকেছে। মায়েদের সঙ্গে যে বাচ্চারা আসে তাদের ভাত দেওয়া হচ্ছে না। যা খাবার দেওয়া হচ্ছে, তাতে সাধারণ বন্দী-মেয়েদের পেটের এক পাশও ভরে না। সারাদিন পেটের মধ্যে ঘ্যানঘ্যানে খিদে। সবাই আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে। একদিন ফাইলে এসে জেলার ঘোষণা করে গেলেন, ভাত-রুটির ঘাটতি পূরণ করতে, প্রত্যেকের জন্য প্রতিদিন দু'শ গ্রাম করে আলুসেদ্ধ বরাদ্দ হয়েছে। সেই আলুসেদ্ধ আসছে, ছাড়িয়ে তেল-নুন মাখা দলা পাকানো অবস্থায়। ভারি যত্ন ! এক একটা দলা চারবছরের বাচ্চার হাতের মুঠোর সমান। জেলে থাকা বাচ্চার। ডাল, তরকারি, সকালের খাবারের চিঁড়ে ছোলা—তারও কি র‍্যাশন হয়ে গেছে ! বিকেলের রুটি এত ময়লা আর কালো যে বাধ্য হচ্ছি একথালা জলে রুটিগুলোকে ডুবিয়ে ধুয়ে নিতে। বিশেষ কিছু করার মত সুবিধাজনক অবস্থায় উনি নেই জেনেও, একদিন সেই রুটিধোয়া কালো জলটা ওয়েলফেয়ার অফিসারকে দেখানো হল। প্রায় দু'মাস হয়ে গেল, তরকারি হিসেবে আসছে বালতি ভরা-জল আর নুন দিয়ে সেদ্ধ করা ঢ্যাঁড়সের কালো পিছল ঝোল। দুপুরে এবং বিকেলে। এটা প্রায় একটা উদ্বেগ উত্তেজনাপূর্ণ প্রতীক্ষার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, একদিন যদি হঠাৎ ঢ্যাঁড়সের বদলে অন্য কিছু চলে আসে ! বুচকুকে প্রায় শুধু ভাতই খাওয়াতে হচ্ছে, একটু নুন আর আলুসেদ্ধ মেখে। আলুসেদ্ধ জিনিসটা দেখা যাচ্ছে ওর খুব পছন্দ। আমরা পাঁচজন গোল হয়ে খেতে বসি। ও ভারি চতুর বিড়ালের মত সকলের পিছন দিয়ে গুড়িসুড়ি-গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আলুসেদ্ধটা খপ্ করে তুলে নেবে। আমাদের সকলকে আলাদা আলাদা করে চেনে। আজকাল এক নতুন খেলা হয়েছে কোল বেয়ে উঠে কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে নাকটা কামড়ানোর চেষ্টা করা। বুচকু যেন একটা গাছের মত। একটা গাছ, এমনকি তার ক'টামাত্র ডালও যেমন সঙ্গী হয়ে উঠতে পারে, সময়ে সময়ে অনেক কিছু ভুলিয়ে দেওয়া আশ্রয় হতে পারে।

ইতিমধ্যে ডালিয়ার কেসের রায় বেরিয়েছে। সাজা দশ বছর।

শিখা ও তার দলবলকে আজকাল মেট্রন উৎসাহ দিচ্ছে নতুন কায়দায়। কংগ্রেস পার্টির নামে, দিল্লির নেত্রীর নামে 'যুগ যুগ জীও' শ্লোগান হচ্ছে সন্ধেবেলা। আমরা যেমন জেনারোল লক্‌আপের পর খানিকক্ষণ শ্লোগান দেওয়ার শেষে গান গাই, ওদের শুরু হয় খিস্তিখেউড়। মেট্রন হাসপাতালের দরজায় কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সন্তুষ্ট মুখে পর্যবেক্ষণ করেন। ওয়ার্ডাররা খি-খি করে হাসে।

জেলে শুনলাম যুবকংগ্রেসের সংগঠন তৈরি হচ্ছে। শিখা নিশ্চয়ই তার

কনভেনার হবে।

সন্ধেবেলা ডালিয়ার সাজার খবরে ওরা অসভ্য চিৎকারের উল্লাস জানাচ্ছিল। আমরা হঠাৎ গলাতুলে সুর করে ‘ওরে কেন কেবল দশ, বিশবছর কেন হলো না বলে শুরু করেছি।

ওপক্ষ একেবারে চুপ।

স্নান করতে নিচে যাচ্ছিলাম। দেখি আমাদের সেলে ওঠার সিঁড়ির নিচে ঘুপচি অন্ধকারে বিজু পড়ে আছে, জ্বরে বেহুঁশ। ওর চেয়েও যে ছোট, সেই সন্ধ্যা একটা থালা করে জল ভরে নিয়ে আসছিল আস্তে আস্তে, আমাদের দেখে হঠাৎ কেঁদে ফেলেছে। অসহায় নির্বান্ধব শিশুর সেই কান্না। কখন থেকে জ্বর বিজুর ? কাল থেকে। রাত্রে বমি করেছে। কাল দুপুরের পর থেকে কিছু খায়ও নি। সন্ধ্যা আর নিমি সকালে খানিকক্ষণ হাসপাতালের সামনে ঘোরাঘুরি করার সাহস করেছিল। তারপর ‘শিখা-মার ‘এখানে কী চাই র‍্যা ?’ শুনে পালিয়ে এসেছে। বিজু বোধ হয় ভেবেছিল আমাদের কাছে যাবে। তাই কোন ফাঁকে দরজা খোলা পেয়ে এখানে ঢুকেছে। তারপর শরীর আর টানেনি কিংবা সাহসে কুলোয়নি। বিজুই এখন ওদের মধ্যে সবার বড়। গণেশ তো আর নেই ! হঠাৎ যেদিন কর্তাদের খেয়াল হয়েছে যে গণেশের বয়স ছয়ের বেশি, তার একসপ্তাহের মধ্যে গণেশকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে অনাথ ছেলেদের হোমে। পাগল মাকেও আর দেখতে পাবে না ও। দেখতে পাবে না জ্ঞান হওয়া থেকে যাদের সঙ্গে বেড়ে উঠেছে সেই সঙ্গীদেরও। শুধু গণেশের মা পাগল বলেই নয়, অপরাধী সাব্যস্ত কোনো মায়েরই মাতৃস্নেহ সরকারি আইনে স্বীকৃত নয়। ১৮৭৬ সালের জেলকোড অনুযায়ী কোনো মেয়ে কয়েদীর দু’বছরের চেয়ে কম বয়সের সন্তান থাকলে এবং আদালত যদি মনে করে যে অপর কোনো আত্মীয় এই শিশুর ভার নিতে অনিচ্ছুক, সে ক্ষেত্রে শিশুটিকে মায়ের সঙ্গে হাজতে থাকতে দেওয়া হবে। কিন্তু দু’বছর পূর্ণ হয়ে গেলে আর কোনো মতেই থাকতে দেওয়া হবে না। কুমারী মেরি কার্পেন্টার সেই উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এসেছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলে। সেখানে দেখা কয়েকটি শিশু সম্পর্কে নিজের চিন্তা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন এরকম, One small creature was lying in its mother's lap streching its tiny, well formed limbs in the sun with evident delight...what a glorious spirit may be enshrined in the form that hold this young 'immortal'—I thought as I kissed the tiny face. What is to be the future of this little child? Whose duty is it to shape its destiny? State has deprived it of its natural guardian, who is to take her

place ? আর এই ১৯১৩ সালে পর্যন্ত পরিবর্তন শুধু দু'য়ের জায়গায় ছ'বছর। তারপর ? মায়ের কাছ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে কোথায় পাঠাবে তাকে ? সেই ছ'বছরের ছেলে বা মেয়েকে ? কেন সরকারি উদ্ধার আশ্রমে ! লিলুয়ায় !

বিজুর জন্য আমরা কাউকে কিছু বলতে গেলে যে ওর বিপদ হবে তার প্রমাণ টুরা। টুরা আর মুকুল। সুতরাং ওয়েলফেয়ার অফিসারকে বলে ওষুধ দেবার ব্যবস্থাটুকুই শুধু করা হল। আর সন্ধ্যার হাত থেকে থালাটা নিয়ে বিজুর আগুন-ছোটা মাথাটা ধুয়ে দেওয়া। ওদের সাতটা বাচ্চার তিনটে থালা। তারও একটায় জল ভরে রাখলে ভাত খাবে কিসে ? বাটি নেই বলে ভাত, ডাল, তরকারি একসঙ্গেই নিয়ে নেয়। ওরা জানে না ভাত বেড়ে খেতে দেবার মানে কী। ওরা জানে কালো কুচ্ছিৎ লোহার ড্রামে করে আসা ভাত আর ডাল। না-মাজা কালো বালতিতে কালো ঘাঁটা পিচ্ছিল তরকারি। ওরা জানে গ্লাস চাইতে নেই। ভাত খেতে বসে কোনদিন বিষম লেগে গেলে কাশতে কাশতে ছুটে স্নানের ঘরে যেতে হয়। মগে করে চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে খেতে হয়। তবে কি বাসন কম ? বন্দী পিছু একটা করে থালা-বাটি-গ্লাস নেই ? আছে। কোনো বন্দী জেলে পৌঁছবার পরদিন অফিসে নিয়ে 'কেস টেবিল' করিয়ে আনবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা করে থালা, বাটি, গ্লাস, দু'খানা করে কম্বল প্রত্যেককে দিয়ে দেবার কথা। কিন্তু সকলকে এক একটা করে দিয়ে দিলে হাসপাতালে আর কিই বা থাকবে ? তবে কোথায় রাখা হবে সকলের দু'বেলার ভাত ? যাদের দিয়ে নিজেদের ও ওয়ার্ডারদের কাপড় কাচানো, বাসন মাজানো, চুল তোলানো, হাজতী ঠ্যাঙানো হয় সেই পেটোয়াদের জন্য বেশি ভাত, ওয়ার্ডারদের খাবার ? পাগলবাড়ির কোটা থেকে তোলা চিনি, মাখন, হাসপাতালের রুগীদের নামে আসা মাছ, মাংস বা বিস্কুট রাখা হবে কিসে ? দুটো-তিনটে থালাকে ঠুকে ঠুকে কড়ায়ের মত না বানালে, বড় কিচেন থেকে সিপাই ওয়ার্ডারদের দিয়ে আনানো মাছ, তরকারি ভাঁটিঘরের উনুনে রাঁধা হবে কিসে করে ? তাহলে, কী করে চলবে সকলের ভাগে ভাগে থালাবাটি কম্বল দেওয়া ? তাছাড়া থালাবাটি ঠুকে ঠুকে চ্যাপটা করে ছোট ভাঁজ করে ঘাঘরার নিচে, চাদরের ভাঁজে করে বাইরে নিয়ে যেতে হবে না ? গড়ন গঠন যেমনই হোক বাসনগুলোর ধাতুটার দাম আছে বৈকি !

আমাদের অনেক দিন পর্যন্ত এই ভুল ধারণাটা ছিল যে খাবার চুরি, বাসন চুরি ইত্যাদির ব্যাপার সম্পর্কে জেলের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ভাল করে জানেন না। পাগলদের বা অন্য বন্দীদের খাবার থেকে বেছে বেছে অনেকখানি

অংশ তুলে নেওয়া সম্পর্কে জেলারকে দু-একবার বলেছি, তিনি অবিশ্বাসের ভাব দেখিয়েছেন। সরযূ আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আকাশপ্রমাণ অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। আমরা ঠিক করলাম হাতে হাতে ব্যাপারটার প্রমাণ দেব। সেদিন শুক্রবার ছিল, ওয়ার্ডে বিকেলবেলা মাংস এসেছে। সপ্তাহে একদিন একশ গ্রাম করে মাংস সমস্ত বন্দীর পাবার কথা! মাংস কোনোদিন খাবারের সঙ্গে আসে না। মেয়েরা খেয়ে থালা মেজে সেই থালায় রাতের খাবার জল ভরে নিয়ে ওয়ার্ডে ঢুকে যাবার পর, ওয়ার্ড বন্ধ হয়ে গেলে আসে এবং যথানিয়মে ঢুকে যায় হাসপাতালে। অনেকক্ষণ পর একটা লোহার ট্রেতে করে ওয়ার্ডের জানালার কাছে নিয়ে দেওয়া হয়—কাউকে একটু চর্বির টুকরো, কাউকে একটা হাড়ের কুচি। বন্দীদের কাছে সপ্তাহের এই একদিনের মাংস খাওয়াটা একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সুখাদ্য হিসেবে ওটার দাম তত নয়, যতটা একঘেয়ে বিস্বাদ রুটিনের ব্যতিক্রম হিসেবে। এখানে বাতাস এত ভারী আর এত স্থির, বিশাল পচা জলাশয়ের মতো যে সামান্যতম কোন তরঙ্গও এখানে মানুষকে তার টিকে থাকার লড়াইয়ে একটুখানি সাহায্য করে। আশা, প্রতীক্ষা এইসব মানবিক আবেগগুলোকে জাগিয়ে তোলে।

ক'দিন ধরেই এরকম হচ্ছে যে, দুপুরের খাওয়া হবার আগে, মানে আমরা যখন বারন্দায় থাকি, তখনও ওয়ার্ডার নিচের দরজায় তালা না-দিয়ে, ওখানে দাঁড়িয়ে ভাঁটিঘরে যে থাকে তার সঙ্গে গল্প করে বা এপাশে যায়। সেই শনিবার সকালে দশটা এগারোটার সময় যখন আগের রাত্রে খাবার পরও বেঁচে যাওয়া এক থালা ভর্তি রান্না মাংস তেল, মশলা ইত্যাদি দিয়ে রেঁধে স্বাদুতর করবার জন্য ভাঁটিঘরে নিয়ে আসা হচ্ছে, আমরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছি। ওয়ার্ডার দৌড়ে আসবার আগেই কৃষ্ণা শিখার রাঁধুনির হাত থেকে থালাটা কেড়ে নিয়ে ওপরে। ওয়ার্ডার ছুটে আসতে তাকে বলে দেওয়া হল জেলার না আসা পর্যন্ত এটা আমরা দেব না। দু'মিনিটের মধ্যে মেট্রন, তার পেছনে শিখা, লালমোতি আর তাদের পেটোয়া মারকুটে ক'জন ছুটে এসেছে। আমরা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে খুব জোরে বলেছি, যে প্রথম ওপরে উঠবে সেটাকে উড়িয়ে দেব। এই কথাটায় খুব কাজ হল। খানিকটা নোংরা গালাগাল, খানিকটা কি ফিসফিস ফন্দি আঁটবার পর প্রস্থান। ওয়ার্ডার তক্ষুনি এসে আমাদের বন্ধ করে দিয়েছে। রবি সোম ওরকমই কাটল। বেশিরভাগ সময়টাই বন্ধ। পচা মাংসের দুর্গন্ধ সমেত। মঙ্গলবার জেলারের ফাইল। যে জেলার বিশ্বাসই করতেন না যে বন্দীদের জন্য আসা খাবারের সমস্ত ভাল অংশটুকু বেছে তুলে নেওয়া হয়, তাঁকে তখন সরাসরি প্রমাণ দেখানো

হল, তিনি হঠাৎ সবচেয়ে বেশি চিন্তিত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন আমাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে।

করেছেন কী। তিনদিন ধরে এই মাংস ঘরের মধ্যে রেখে দিয়েছেন! সাংঘাতিক কোনো ভাইরাস ইনফেকশান হতে পারত আপনাদের! ছি ছি! যান ওটা বার করে ফেলে দিন শিগগির।

শেষটা ওয়ার্ডারকে। তারপর খুব ক্যাজুয়ালি,

আচ্ছা আপনারা নিচে নেমে ওটা আনলেন কী করে? দরজা বন্ধ থাকে না?

—আমরা স্নান করতে নেমেছিলাম। আপনি বলুন এবার তো সামনে দেখলেন চুরি হয় কি না—কী ব্যবস্থা নেবেন বলুন?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা আমি দেখছি।

নেমে যাওয়া।

'দেখা' মানে এ পর্ব শেষ। তবে অন্যদিকে ঘটনাটার জের আর একটু গড়িয়েছিল। দু'-তিন সপ্তাহ মেয়েদের খাবার দেবার সময় মেট্রন দাঁড়িয়ে ভাগ করালো। হয়ত ভাগটা একটু বাড়লও। কিন্তু মেট্রন সেদিনের ভয় পাওয়া ও সামনাসামনি ধরা পড়ার অপমানটা ভোলেনি। এর দিন পনেরোর মধ্যে আই জি প্রিজন্স-এর সেক্রেটারি এলেন জেল পরিদর্শনে। আমাদের বন্ধ সেলের সামনে এসে আমাদের কোনো সমস্যা বা বক্তব্য আছে কি না জিজ্ঞেস করেছেন। আমরা কিছু বলব কি না ঠিক করে ওঠার আগেই মেট্রন প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, স্যার এরা ভীষণ হিংস্র টাইপের মেয়ে স্যার। স্নান করবার জন্য নিচে যাবার পারমিশান দিয়েছিলেন জেলার সাহেব। এরা অন্য মেয়েদের সঙ্গে মারামারি বাধিয়ে দিয়েছিল স্যার। আমি থামাতে গেলে, আমাকে অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেছিল। তাই এদের এখন সারাদিন বন্ধ রাখা হয় স্যার।

—অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেছিল! সে কী! কে?

—এই যে এ স্যার।

ভারি উৎসাহিত হয়ে কৃষ্ণাকে দেখিয়েছে মেট্রন।

—কী অস্ত্র নিয়ে?

এটা বোধহয় আগে থেকে ঠিক ভাবা যায়নি। বোমা-ছুরি বললে নিজের ফাঁদে আটকা পড়বে নিজেই। সুতরাং একটু থতমত মেট্রন, প্রথম যে জিনিসটা চোখে পড়ে সেটাই দেখিয়ে দেয়। বারান্দায় জলের ছাঁট-আসা আটকানোর

জন্য ক্যানভাসের পর্দা লাগানো আছে, আমরা সেগুলোকে কোনো দিন খোলা হতে দেখিনি। হাত ছয়েক লম্বা মোটা শালবল্লার মধ্যে রোল করে সে পর্দা ওপরে তুলে বাঁধাই থাকে। সেই শালবল্লাটা দেখিয়ে দিয়েছে মেট্রন। সেক্রেটারি একবার সেটা দেখেন, তারপর কৃষ্ণার সাড়ে তিনবছর বন্ধ থাকা চার ফুট আট ইঞ্চি চেহারাটা। আবার কাঠটা। তারপর মেট্রনকে বলেন—

আপনি বরং অন্য কোনো অস্ত্রের কথা বলুন।

বুচকুর মা গেল কোর্টে। আমরা বুচকুকে ওর সেই দুটো ভালজামার একটা পরিয়ে, চুল আঁচড়ে মায়ার কোলে দিয়ে দিলাম। দূর গেটের সামনে মায়ের কোল থেকে হাত নেড়ে আমাদের ডাকছে, 'আয় আয়'। সন্ধেবেলা শিয়ালদা কোর্ট ব্যাঙ্কশাল কোর্টের গাড়ি ফিরে এল। আমরা উৎকর্ণ হয়ে রইলাম রাত্রি এগারোটার শেষ দলটা ফেরা পর্যন্ত। গেটের কাছের আধো অন্ধকার থেকে কোনো কচি গলার কাকলি, হাততালির শব্দ দোতলার সেলগুলিকে লক্ষ্য করে উড়ে এল না। অনেক ডাকাডাকি করেও ওয়ার্ডারকে পাওয়া গেল না। পরদিন সকালে বদলি ডিউটির ওয়ার্ডারের মুখে শুনলাম, চালান হয়ে গেছে লিলুয়া। যাবার সময় নাকি কাঁদছিল। লিলুয়া তো এক নরক। শুনি সরকারি উদ্ধারাশ্রম আর লিলুয়া থেকে আসা মেয়েদের সবার থেকে আলাদা করে চেনা যায় সর্বাঙ্গে ঘা দেখে। একটা মাত্র জলাশয়। তার জল পচে সবুজ হয়ে গেছে। সেখানেই স্নান করে আর কাপড় কাচে ওরা। একবার সেই উদ্ধারাশ্রমের গুদামে বোঝাই হয়ে গেলে আর বেরোনো যায় না। চারমাস কি ছ'মাস জেলে থাকবার পরও যেসব হারিয়ে যাওয়া বা ধর্ষিতা মেয়েদের কেউ নিতে আসে না, তাদের জমা করে দেবার জায়গা লিলুয়া হোম। যেমন পচে পচে সবুজ হয়ে ঘা ছড়ায় বদ্ধ জলা—মানুষ তো তার চেয়েও বেশি! কত বীভৎস অত্যাচার আর বিকৃতি যে শিকার করতে পারে ক্রমাগত বন্ধ-থাকা মানুষের মনকে, তার কিছুটা মাত্র আন্দাজ করেছিলাম আনোয়ারাকে দেখে। দোতলার সিঁড়ির মাথা থেকে লাথি মেরে নিচে ফেলে দেওয়া, দেওয়ালে হাত বেঁধে বারোঘন্টা দাঁড় করিয়ে রাখা, খেতে না দেওয়া এসব নিত্যনৈমিত্তিক চর্যার কথা শুনেছি আগেও। কিন্তু রক্তহীন ফর্সা চেহারার কিশোরী আনোয়ারা বেগম লিলুয়া হোম থেকে প্রেসিডেন্সিতে এসেছে খুনের দায়ে। এ কেমন অদ্ভুত! লিলুয়াতে আবার কাকে খুন করা যায়!

—সত্যি খুন করেছ?

—হ্যাঁ।

সে খুব নির্বিকার নিশ্চিন্ততায় উত্তর দেয়।

—কাকে খুন করেছ? ওয়ার্ডারকে?

—নাঃ।

—তবে?

—আমার স্বামীকে।

—দূর লিলুয়ায় কারুর স্বামী থাকে নাকি!

—ওসব তোমরা বুঝবে না।

প্রথমে সত্যিই বুঝতে পারিনি। সবচেয়ে বেশি বুঝতে পারিনি কিশোরী মেয়েটির চেহারা। এমন শান্ত নির্বিকার ধরন-ধারণ যেন পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে ও যুক্তই নয়। যেন ও বুঝতেই পারছে না, ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা মাফিক খুন করার মানে কী। আর কি বীভৎস পরিকল্পনা! তিনবছর চারবছর কি সাতবছর বয়স থেকে যে শিশুরা কিংবা কিশোরী-তরুণীরা বন্ধ হয়ে আছে সর্ব অর্থে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে, পরিবার-পরিজন-সমাজ-সামাজিক শ্রম—সমস্ত রকম বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের মধ্যে মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা প্রবৃত্তি স্বভাবও কত-যে বিকৃত হয়ে উঠতে পারে তা দেখতে বোধহয় লিলুয়ায় যাওয়া যায়। নাঃ—যাওয়া যায় না। কেন না লিলুয়ায় বাইরের জনপ্রাণী খবর-বাতাস-সম্বন্ধাদির প্রবেশের নিয়ম নেই। সমকামিতা ওখানে বাচ্চা থেকে প্রৌঢ়ার সবচেয়ে স্বাভাবিক (?) আউটলেট। আনোয়ারার সেই সঙ্গিনী অন্য নতুন-আসা মেয়ের সঙ্গে মিশছিল বলে ও তাকে মেরেছে। বিকেল থেকে ওয়ার্ডে এনে লুকিয়ে রাখা আধলা ইট দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ছেঁচেছে মাথাটা। তারপর মুখের ওপর বালিশ ঠেসে উঠে বসেছিলো। নড়লে যদি কেবল জখম হয়, না মরে!

আমার চিকিৎসা উপলক্ষ করে প্রায় সোজাসুজি একটা ঝগড়া হয়ে গেল সিনিয়র ডাক্তারের সাথে। বিকেলের দিকে বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, কয়েকদিন একটানা বমি করার পর। বার বার খবর পাঠানো সত্ত্বেও, ডঃ চ্যাটার্জি এলেন সন্ধ্যার পর। কৃষ্ণা রাগে ফেটে পড়েছে। ভদ্রলোক প্রাগ করলেন হতাশভাবে।

আপনারা শিক্ষিত সুন্দর সব কমবয়েসী মেয়ে, সব সময়ে এত রেগে রেগে থাকেন কেন বলুন তো? একটু মিষ্টি করে কথা বলতে পারেন না? আমি একটা লাইট মুডে এলাম হাতে একটু সময় নিয়ে।

'বুঝতে পারছি লাইট মুডটা। টের পাচ্ছি গন্ধেই। কৃষ্ণার মেজাজ এমনিতেই

ফসফরাসের মত। ব্যাপারটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে যা হবার তাই হল। ডাক্তার তার লাইট মুড নিয়ে প্রায় ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে বলছেন—

কিছু করতে পারব না, আপনাদের জন্য কিচ্ছু করব না, —থাকুক যেমন পড়ে আছে—মরলে খবর দেবেন।

বহরমপুরের বৃদ্ধ ডাক্তারবাবুকে মনে পড়ে এক একবার।

প্রেসিডেন্সিতে অনেক ডাক্তার। স্নান করতে যাবার পথে শুনলাম হাসপাতালে ডাঃ দত্ত এসেছেন, ডাকছেন। ঢুকে চক্ষুস্থির ! ছোটখাট চেহারার খিটখিটে স্বভাবের অপেক্ষাকৃত কমবয়সী ডাক্তারটি অতি বিরক্ত মুখে টেবিলে বসে আছেন। সামনে শিখার মুখে কান-এঁটো হাসির নোংরা আর বেডের ওপরে বসে আছে একটি বিচিত্র মার্বেলমূর্তি। গোল গোল সোনালী আঙুর থোপার মত চুলের নীচে স্বচ্ছ নীল চোখ, টুসটুসে ঠোঁট, পরনে একটি রক্ত লাল হটপ্যান্ট এবং একটি স্যান্ডো গেঞ্জি। ডাক্তারের বক্তব্য—ওকে বলুন এখানে আফিং টাফিং পাওয়া যায় না। আর বলুন কিছু একটা পরতে। মারিয়া খাট ছেড়ে উঠে এল আর সত্যি মুগ্ধ হয়ে গেছি। মাইকেল এঞ্জেলোর কোনো কিশোর মূর্তি বুঝি পা বের করে প্যানেল থেকে নেমে এসেছে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করি, চামড়ায় অদ্ভুত একটা সবজেটে ভাব, দুই হাতে অজস্র সবুজ বেগুনী ছোপ, নাক দিয়ে সর্দি গড়াচ্ছে। কোকেন ইনজেকশানের নেশার শিকার। পঞ্চাশ গ্রামেরও বেশি কোকেন সুদ্ধু ধরেছে পুলিশ, ইতালিয়ান মেয়ে মারিয়া আর তার ফরাসি বন্ধুকে, নেপালের প্লেন ধরতে যাওয়ার পথে। কাল দুপুরে কোর্টে হাজির হওয়া থেকে এখন পর্যন্ত একটাও 'শট্' না পেয়ে এখন কেমন হিস্টিরিয়া রুগীর মতো করছে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আমাদের সঙ্গে উঠোনে এল। কিন্তু তাকে কিছুতেই বিশ্বাস করানো যায় না যে আমরা চার-পাঁচজন মেয়ে অথচ একটাও বিড়ি-সিগারেট নেই আমাদের কাছে।

—কোথা থেকে এসেছ ?

—বার্সিলোনা থেকে।

—কতদিন আগে বাড়ি ছেড়েছ ?

—ছ'মাস হবে।

—তুমি যে এ রকম নেশা করে ঘুরে বেড়াচ্ছ, তোমার মা চিন্তা করছেন না ?

—*শি হ্যাজ হার ওন লাইফ টু লিভ—হোয়াই শি'ড বদার অ্যাবাউট মি ?*

—তা বটে !

আমরা যারা সকলের জন্য 'বদার' করে থাকতেই ভালবাসি, আমাদের কাছে এমন নিরাবলম্ব ভাবনা কেমন অদ্ভুত ঠেকে। এই অবস্থাটা কোনো সমাজেরই সাধারণ স্বাভাবিক চেহারা হতে পারে না। এটা ভুল চেহারা। এত সুন্দর দেখতে অথচ কিচ্ছু নেই মাথার ভেতর। কোনো ভাবনা, কোনো লক্ষ্য, কোনো জীবনবোধ ! কিচ্ছুই না। এমন কত মানুষ ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে এক সামগ্রিক ধসের দিকে ?

মনে পড়ে যায় বহরমপুরের সমবেদনার কাঙাল জলমণির কথা।

জলমণি সিস্টারের চেয়ে বেশ খানিকটা বড়। লাইফার হয়ে এসেছিল শিলিগুড়ি থেকে। দরিদ্র সংসার চালাতে যে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হত, তা ওর চেহারার লাবণ্য অনেকটা মুছে নিয়েছে। স্বামীর কাছ থেকে সহযোগিতা কি সমবেদনার বদলে পেয়েছে নির্দয় প্রহার, একটি সন্তান ও অসম্মান।—তোর কাছে থাকবে কে ? ওই তো শ্মশানের পেত্নীর মত চেহারা এই কথা বলে নিত্য সে চলে যেত অন্য মেয়েদের কাছে। কখনও বা বাড়িতেও নিয়ে আসত তাদের। জলমণিকে বলত গেলাস দিয়ে যেতে, পেঁয়াজি ভেজে দিতে। তাহলে দোকানে কাঠ নিতে আসা তরুণ ক্রেতাটি যদি ওকে ভালবাসার কথা বলে, নরম গলায় সহানুভূতি জানায়, তাকে কি বিশ্বাস করবে না জলমণি ? সাড়া দেবে না তার ডাকে ? সে বিপদে পড়েছে জানলে নিজের হাড় গুঁড়ো করে ফেলা খাটুনির পয়সা কি তুলে দেবে না তার হাতে ? কিংবা কানের বড় সোনার চাক্তি ? তার মূল্য কি বেশি ওই কোমল সমবেদনায় মাথায় হাত বুলিয়ে দেবার চেয়ে ? কৃতজ্ঞ দৃষ্টির চেয়ে ? জলমণি তো ছত্রিশ বছরের জীবনজোড়া পরিশ্রমের মুখোমুখি কোনো কৃতজ্ঞতার চোখ-ঠোঁট দেখেনি কখনও। জলমণি তো আরও কতকিছুই দেখেনি ! জানেনি ! যে লোকটি তাকে মানুষের স্বীকৃতি দিচ্ছে, তার নারীত্বকে আদর দিচ্ছে—যা তার সব কষ্ট সহজ করে দিয়েছে, সে যে জলমণির পয়সা খরচ করছে কোনো সুকুমারী তরুণীর মাথায় বাঁধার রুমাল, উদ্ধত বুক-ঢাকার উলেন জ্যাকেট কিনে দিতে তা কি জলমণি জেনেছিল, যতদিন না দশেরার মেলায় কাঠ বেচতে এসে তাদের দুজনকে নাগরদোলার হাস্যোচ্ছল উড়ালে দেখতে পায় ? জলমণি তো জানত না তার শিরায় এত ক্রোধ আছে। নাগরদোলা থেকে চঞ্চল পায়ে নেমে আসা, নিজের যুবকের কণ্ঠলগ্ন তরুণীটিকে সে কাঠ কাটবার কুড়ুল দিয়ে একবারে দু'খানা করে ফেলতে পারে ! যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নিয়ে এসে এই আক্ষেপ সে অনেকবার করেছে, ভুল হয়ে গেল। ছোরীটার কী দোষ ! ও হয়ত কিছু জানত না। লোকটাকেই মারতে হত। কিন্তু কি জানো

বইনি, ওকে মারতে হাতটা উঠল না।

আর এখন? এখন তো সবই শেষ। স্বামীর ঘরের প্রশ্নই ওঠে না, আর সেই বলদেবও তো সাক্ষীর বাক্সে দাঁড়িয়ে স্থিরভাবে জলমণিকে অভিযুক্ত করে গেছে যে জলমণি তাদের কাছে কাঠ বিক্রি করত। জলমণির টাকা? এরচেয়ে হাস্যকর কি কথা হয়! সে নিজে কি সিনেমা হলে গেটকিপারের চাকরি করে না! প্রেম—! ওই বুড়ি পেত্নী জলমণির সঙ্গে! জজসায়েবেরও তো চোখ আর বিবেচনা আছে!

কিন্তু তবু তখনও সব শেষ হয়নি। তখনও জলমণির খড়কুটো ছিল। বিজয়, যাকে আমরা সবাই সমতলীয় অভ্যাসে প্রথমদিকে বলতাম কাঞ্ছা। হয়ত বছর নয়েক বয়স, দেখায় ছয় সাতের মত। খুব সামান্য যে দু'চারটে কথা লাঞ্ছিতা মেয়েটি বলে তা প্রায় সবটাই বিজয়কে নিয়ে। হাইকোর্টের আপিলে যদি ছাড়া পায়—চলে যাবে দার্জিলিং। ছোটবেলায় যে স্কুলে পড়েছে, সেই সিস্টারের পায়ে ধরে একটু জায়গা যোগাড় করে নেবে। আবার কাঠ কাটতে যাবে জঙ্গলে। আহা, সেই জঙ্গলও যে কত ভালো—স্যাঁতসেতে ঠাণ্ডা মস্ জমে থাকা পাহাড়ের গা বেয়ে মেঘের জল গড়িয়ে পড়ে। সে তো এই প্রাণহীন বর্ণহীন ধুলো আর পাঁচিল আর অসহ্য গরম নয়। তারপর বিজয় ইস্কুলে পড়বে এইট-নাইন-টেন। বিজয়কে সে পড়াবেই। টেন পাস করলে বিজয় চাকরি করবে। তখন সে আর কাঠ কুড়োবে না। রান্না করবে, সেলাই করবে, বাড়িতে থাকবে। হাইকোর্টের আপিলে যদি ছাড়া পায়, মেয়েটাকে মেরে যে পাপ হয়েছে, মহাকালের মন্দিরে নিজের রক্ত দিয়ে পুজো করে আসবে। হাইকোর্টের আপিলে যদি—!

হাইকোর্টের আপিলে শাস্তি বহাল থাকে। আর রায়ের কপি দিতে এসে বিজয়ের বয়স বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন জেলার। জলমণি ভাত খায় না। কোনোদিন ইচ্ছে হলে একটুকরো রুটি খায়, কিংবা ডালটা খায় চুমুক দিয়ে—আর চা। এক একদিন সারাদিন রয়ে যায় ঐ চা খেয়েই। জানি না কিসের বিনিময়ে ওয়ার্ডারকে দিয়ে আনানো দু'চিমটি চা-পাতা নিয়ে ভাবীর জানলার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবী বকতে বকতে চা করে দেয়। ফুলমালা কি সিস্টার নিজেদের ভাগের প্রায় সমস্ত চা-টাই দিয়ে দেয় ওকে।

চিরকুট কাগজটা পড়ে শোনাতে মেট্রনও ঢোঁক গেলে একবার। কিন্তু জলমণির মাথায় তার বিন্দুবিসর্গও ঢোকে না। বড় হয়ে গেছে বিজয়? তা তো যাবেই, বিচার চলেছে তিনবছর ধরে, বড় হবে না? এখানে থাকবে না! কোথায় থাকবে তবে? আর কে আছে বিজয়ের? অনাথ আশ্রমে যাবে?

সরকারি অনাথ আশ্রমে? কেন? ও কি অনাথ? ওর যে মা আছে—যে ওকে রক্তমাংস দিয়ে তৈরি করেছে শুধু নয়, মুখে আজ পর্যন্ত প্রতিটি ভাতের গ্রাস তো ওর মা-ই জুগিয়েছে। দশ বছরের জীবনে যে কাউকে চেনে না বিজয়! কোথায় নিয়ে যাবে তাকে তোমরা, একা একা মায়ের কাছ থেকে ছিঁড়ে? এক্ষুনি যেতে হবে—এখনও যে সকালের খাবারও খায়নি। বাগানে ঘুরছিল, এর মধ্যে থালায় করে একদলা ভাত এনে দিয়ে বলছে, এক্ষুনি খেয়ে তৈরি হও ট্রানসফার! ফুলমালা কাঁদছে, শাপ দিচ্ছে। কমলামাসি-সিস্টার-আনন্দ। খুকুমণিকে কোলে চেপে ধরে পাথর হয়ে বসে আছে খুকুমণির মা।

ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল বিজয়কে। শিশুটিকে গিলে ফেলে চোয়াল বন্ধ করে দিল ওয়ার্ডের গেট। ওকি মাথা ঠুকলে খোলে? মাথা ঠোকার জন্যই তো তৈরি করা হয়েছে ওকে!

প্রায় আটমাস পর সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এবার ছাড়া পায় জলমণি। কিন্তু কোথায় সেই সরকার? কেমন করে গিয়ে তাকে শুধোতে হয় তার সেই অনাথ আশ্রমের ঠিকানা, যেখানে মায়ের কোলের বাচ্চারা অনাথ হয়ে থাকে! কিছুই জানা সম্ভব হয় না জলমণির। এদিকে জেলের সদর প্রহরা পথ চিনিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসে দিশাহারা একা জলমণিকে, শিলিগুড়ি থেকে একটু ওপরে তার বস্তিতে। আর তারও মাস দুই পরে লিলুয়া থেকে একদিন বিজয়ের পোস্টকার্ড আসে, বিমলাভাবীর নামে—'তোমরা আমার মাকে দেখিবে, তাকে বুঝিয়া বলিবে, আমি আঠারো বছর হলে ছাড়া পাব। মাসী মাকে বলিবে আর মোটে আট-বছর বাকি।' আর সবশেষে খুব ছোট ছোট করে—'আমি মাঝে মাঝে চা দিয়ে ভাত মেখে খাই।'

আবহাওয়াটা ক্রমশ মুখোমুখি টানটান হয়ে উঠছে। বৃত্তটা চেপে আসছে। মায়াকে বেছে যখন ওপরে পাঠিয়েছিল মেট্রন আর তার পারিষদরা, ভেবেছিল, এক শিশি টিপ, একটা মাছভাজা, দু'বার একটু বেশি চা দিয়ে ওকে কিনে রেখে, আমাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করাবে। বাস্তবে ঘটল তার উল্টোটাই। হাত থেকে ফস্‌কে যাওয়ায় মায়ার ওপর ওদের আক্রোশটা বেশি। বিশেষত আমরা যখন সরাসরি নাগালের বাইরে স্নান করতে আসা-যাওয়ার পথে দু-চারটে নোংরা মন্তব্য করা ছাড়া আর তেমন কিছু যখন করা যাচ্ছে না। কদিন থেকে প্রায় রোজই সন্ধেয় নিচের ওয়ার্ড বন্ধ হয়ে গেলে, ওদের দিকের দু'চারজন ছুতোনাতা করে মায়ার সঙ্গে ঝগড়া বাধাচ্ছে। বাকি মেয়েরা কেউ ভয়ে, কেউ উদাসীনতায় চুপ করে থাকে। তারপর একদিন আমাদের

সেল বন্ধ হয়ে গেছে। নিচটা আর দেখতেও পাচ্ছি না। নিচের ওয়ার্ডের দরজায় তালা পড়েনি, খিলটা শুধু বাইরে থেকে টেনে দেওয়া। হঠাৎ উঠোনের ঝাপসা অন্ধকার থেকে অবিরাম আঘাতের শব্দ আর মায়া, আমাদের ছোট্ট মায়ার গলা-ছেঁড়া আর্তনাদ, —দিদি-দিদি দিদিরে আমারে মাইর‍্যা মাইর‍্যা ফালাইল—ক্ষীণ হতে হতে এক সময় গলার শব্দ থেমে গেল। আজ ওরা আর কোনো ছুতো খুঁজছে না, কোনো আড়াল নেবার চেষ্ট করছে না। মস্ত উঁচু গলার কুৎসিত গালাগালির সঙ্গে মাঝে মাঝে প্রধানমন্ত্রীর নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি আমরা স্পষ্টই শুনতে পাচ্ছি। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে বারান্দার অন্ধকারে পাশের দরজার আলোর মধ্যে কৃষ্ণার দাঁড়িয়ে থাকার ছায়াও দেখতে পাচ্ছি। নিচের ওয়ার্ডের সঙ্গীরা চেঁচিয়ে ওয়ার্ডারকে ডাকছে।

সকাল হল। তেতো বন্ধ বাতাসের সকাল। আমাদের সেলের দরজা খুলতে কেউ আসেনি। প্রায় আটটায় মেট্রন-সিপাহি-জমাদার নিয়ে জেলার। সার্চ। তারপর দরজা খোলা হল। মেট্রন দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে নিচে থেকে দুটি মেয়েকে নিয়ে লালমোতি খাবার পৌঁছে দিয়ে গেল। স্নানের জলও। আমার ও কৃষ্ণার নিচে স্নান করতে যাওয়াও বন্ধ। স্বাতীকে নামিয়ে নেওয়া হল নিচের সেলে। ডালিয়ার সাজা হয়ে গেছে, তাকে আর সলিটারি সেলে রাখা হবে না—তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ওয়ার্ডে। কাউকে জিজ্ঞেস করতে পারছি না, মায়া কেমন আছে, কোথায় আছে। আজ শনিবার। ওয়েলফেয়ার অফিসারও আসবেন না সোমবারের আগে। ওরা এ হিসেবটা আগেই করে নিয়েছে। সোমবার কোর্টের ডেট পড়ল মায়ার। সকাল ন'টায় চলে গেল। সেখান থেকে লিলুয়া। আর দেখতে পাব না মায়াকে। মনে ভাববার চেষ্টা করি—তাহলে তো মায়া বুচকুকে দেখতে পাবে। ওর কাছে থাকবে।

বাপীদি বেশ্যা। এক-দু'মাস অন্তরই ঘুরে ঘুরে আসে। জেলের ভাষায় ওরা হল পেটিকেসের আসামী। দু'তিন দিনের সাজা নিয়ে আসে যায়। ওর মুখ দেখে মনে হয় বলিরেখাঙ্কিত বৃদ্ধার মুখ, বাকি শরীর যেন কোনো অপুষ্ট কিশোরীর। বিচিত্র ছাপছাপ চাইনিজ শার্টপ্যান্ট পরে আসে। শুনেছি ওর বয়স সাতাশ।

ওরা এলে নিচের দরজা খোলা পেলেই ওপরে চলে আসে। ওদের কেউ ঘাঁটায় না। না ফিমেল ওয়ার্ডাররা, না সিপাই জমাদার!

বাপীদিদের বাড়ি ছিল শহরতলির কোন ঘিঞ্জিতে। বাবার অনেক ছেলেমেয়ের মধ্যে বাপীদি একজন। ছোটবেলা থেকে চারদিকের অভাব, নোংরা অশান্তির মধ্যে বিনোদন বলতে একমাত্র হিন্দি সিনেমা। আহা—রেখা-

অমিতাভ-ধর্মেন্দ্রর কী কাছাকাছি বসে রঙিন ঝলমলে তিন ঘন্টার এক স্বপ্নে ঢুকে যাওয়া। আর কতোবারই তো ঘুটেকুড়ুনী, কি টাঙাওয়ালী, কি ছেঁড়া কাপড় পরা জীর্ণ ঘরের মেয়েকে গলির মোড়ে হঠাৎ দেখতে পায় মার্সিডিজ গাড়িচড়া নায়ক, কিংবা ক'জোড়া নায়ক-নায়িকা রাস্তায় রাস্তায় নেচে, গান গেয়ে কামিয়ে ফেলে প্রচুর পয়সা—হঠাৎ দেখা যায় গলায় কোনো অদ্ভুত চিহ্নঅলা লকেট। আর সব কিছুরই আগে হয়ে যায় মোহাব্বৎ! তো পড়শির বাড়িতে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসা যুবক আত্মীয় যদি সেই সিনেমাই দেখাতে নিয়ে যায়, দোকানে খাওয়ানোর ফাঁকে এক আধটু ছুঁয়েটুয়ে দেখে, ভালোবাসার কথা বলে, সতেরো-আঠারো বছরের মেয়েটি তো আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখতেই পারে। সে ছেলে আবার হোমগার্ডের চাকরি করে, বেকার নয়। সুতরাং একদিন লোকাল ট্রেন ধরে ভালবাসার জনেরই কিনে দেওয়া শাড়ি পরে কালিঘাটে গিয়ে মালা বদল। কতো কতো বার তো এরকম করে নায়ক-নায়িকারা। আর দেবতার অমোঘ সাক্ষ্যের জোরে জীবনের সব দুঃখদুর্দশা পার করে গালের রুজটি পর্যন্ত ফিকে না করে লাস্ট সিনে ছুটে এসে পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন হয়। যাহোক প্রথম মাসখানেক ভারি সুখস্বপ্নে কাটাবার পর সেই হোমগার্ড নায়ক একদিন তরুণী স্ত্রীকে একেবারে বিহ্বল করে দেয় এই খবর দিয়ে যে সত্যিকারের ফিল্মের মতই আরও দুই বন্ধু ও তাদের স্ত্রীরা সকলে মিলে এক বন্ধুর গাড়ি করে পিকনিক করতে যাবে ডায়মন্ডহারবার। সারাদিন গান খাওয়াদাওয়া হৈচৈ করে একেবারে রাতে ফিরবে। যথাসাধ্য সাজগোজ করা বউকে ট্যাক্সি করে নিয়ে গিয়ে এক বিরাট বাড়িতে বসায়। সে ঘরের মেঝেতে কার্পেটের ওপর সোফা পাতা, জানালায় লম্বা লম্বা পর্দা। এই বন্ধুর বাড়ি। এরই গাড়ি। সেখানে বউকে বসিয়ে বন্ধুর খোঁজে পাড়ার মোড়ে পাঁচ মিনিটের জন্য যায় বর। এক ঘন্টা, দু ঘন্টা, তিন ঘন্টা—সে ফিরে আসে না। যে আসে সে এক মধ্যবয়সী মহিলা—বিকেল তিনটের সময়। সে মেয়েটিকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিতে বলে—ভয়ে-দুশ্চিন্তায়-কান্নায় তার মুখের চেহারা নাকি পাতে দেবার মত নেই আর। তৈরি হয়ে নেবে? কিন্তু কোথায় তার প্রেমিক স্বামী? কখন আসবে সে? এইসব প্রশ্নের উত্তরে সে স্পষ্ট সরাসরি জবাব পায়—সে আবার আসবে কি লো ছুঁড়ি! সে না তোকে আড়াইশ টাকায় বিক্রি করে গেল। নগদ গুনে দিয়েছি টাকা, হ্যাঁ।

তারপর! তারপর তো এই। আঠারো থেকে সাতাশ! কত বছর? একশো? দুশো? এক হাজার? অন্ধকার মরণান্তিক ক্লান্তির দিন আর

রাক্ষসের দাঁতের মত বীভৎস আলো ঝলমল রাত। কত ? কতজন ? ক্লেদাক্ত শিকারীর নখ দাঁত ? বাপীদি এখন সুড়ঙ্গের মাঝামাঝি। কিংবা হয়তো প্রায় শেষ দিকে। সাতাশেই !

ওয়েলফেয়ার অফিসার ঘৃণা না করেই বললেন, বাপীদির সঙ্গে যেন বেশি না মিশি, ওর সিফিলিস আছে।

ওদের ভালো করা যায় না জানেন ? এই বাপীকে হোমে ভর্তি করে দিয়েছিলাম চিকিৎসার জন্য। পালিয়ে এসেছে।

বাপীদি সিঁড়ির পাশে পিচ কেটে থুতু ফেলে হাসে। কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে গিলে নিল, তাই অপ্রস্তুত।

—হোমে তো ইনজেকশান দেবে দিদি। তারপর বলবে বাকি ওষুধ কিনে নাও। কিনব কি আমার...না দূর—তোমার সামনে কথা বলা যায় না, হ্যাবিট খারাপ হয়ে গেছে। তারপর হোমের ডাক্তার বলবে কাজ কোরো না তাহলে আবার বাড়বে। তো কাজ না করলে খাব কী ? যদি বাড়বেই তবে আর ওখানে বসে বিজনেস লস্ করা কেন দিদি ! আর জান—তোমরা তো জানই, মদের নেশা হয়ে গেছে—রাত হলেই—।

—কিন্তু বড় কষ্ট পাও যে বাপীদি—।

—কী হবে দিদি। আমরা তো ফুটপাতে পড়েই মরি গো শেষকালটা। পেটের খিদে তো আর খদ্দের বুঝে লাগে না। আমাদের ধর, শরীর নেই তো উপোস। ঘরের ভাড়া দিতে না পারলে তাড়িয়ে দেবে, নতুন মেয়ে বসাবে। তবু তো দিদি আমার একটা পেট, একলা অসুখ—ছাবরার মত তো পেটে একটা নিয়ে মরিনি।

চড়ারঙের ছাপা চাইনিজ শার্ট আর পায়জামা পরা, চুলে চাইনিজ ছাঁট দেওয়া বাপীদি কারও মেয়ে ছিল ? কারো দিদি ? কারো পিঠে চড়ে পুকুরঘাটে গিয়েছে কোনদিন ? নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে ভাইবোনদের বিছানায় ? বেড়ে উঠেছে অভাবে-অশিক্ষায়-কাদায়-প্রলোভনে !

কারা তৈরি করে স্বাভাবিক সাধ আহ্লাদের সুযোগ নিয়ে এইসব বিকৃত অভাববোধ ? এইসব রঙিন লোভ দেখানো স্বপ্ন ? কেন করে ? যাতে বাজারে সহজলভ্য হয় বাপীদিরা ? বাপীদির ভাইয়েরা ?

এ এক বিরাট সামাজিক নেটওয়ার্ক। যারা জালে তোলে এই মেয়েদের, তাদেরও দেখি এখানে আসতে-যেতে। অন্তত একজনকে তো প্রায় নিয়মিতই দেখি। আপাদমস্তক সাদা দামী পোশাক পরে তিন-চার মাস অন্তর যখনই আসে, হাসপাতালে থাকে। দৃশ্যমান খাতির-যত্ন পায়। ওয়ার্ডারদেরও দু'চার

জনকে 'তুই' করে কথা বলে। কাঁচামাংসের ব্যবসার বিরাট মালকিন। সম্ভ্রান্ত চেহারা। সাপের মত মসৃণ চলাফেরা। কুমিরের চোখের মত নিস্পৃহ আচার ব্যবহার। অন্তত আমাদের দূরের গরাদ দিয়ে যা দেখতে পাই একতলার উঠোনে। পলক ফেলা বা পলকে গিলে ফেলাটা চোখে দেখিনি, কিন্তু পদ্ধতিটা জানি।

প্রথমবার নূরজাহানকে দেখেছিলাম ওর আশপাশে। তারপর থেকে আস্তে আস্তে জেনেছি। IPC-316 ধারার সাক্ষী, ধর্ষিত মেয়ে, যারা পড়ে থাকে জেলে, নূরজাহান তাদেরই একজন। জানি না খবরের কাগজে ব্যাপারটাকে পাশবিক অত্যাচার বলে কেন। এরকম ঘৃণ্য কুৎসিত বিকৃত কাজ পশুরা করে বলে কখনও শুনিনি। নূরজাহান ঘুঁটে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল বাবুদের বাড়ি ! বিকেল তিনটেয়। গৃহিণী বাচ্চাকে স্কুল থেকে আনতে গিয়েছিলেন ! নমিতা বাচ্চা রাখার কাজ সেরে, মুদি দোকানের জিনিস নিয়ে বাড়ি ফিরতে দেরি করেছিল। পোড়োবাড়ির পিছনে। সন্ধে সাতটায়। অনিতা ছোট সাবান কোম্পানির ম্যাটমেটে সেলসগার্ল। ট্রেনের ফাঁকা কামরায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। বেলা দেড়টায়। বীণা বাড়ির সারা দিনরাত্রের ঝি। রাত্রি দুটোয়। সরলা। প্রীতি। নীরমায়া। টুসি...

দুপুর দুটো। রাত দশটা। সন্ধে সাতটা।

এরা শিকার। অন্যরা আসামী। জামিনযোগ্য অপরাধ। এরা ফরিয়াদী নয়। ফরিয়াদী সরকার। এরা শুধু সাক্ষী। মিথ্যে সাক্ষী দিচ্ছে না সেকথা প্রমাণের দায়ও এদেরই। সরকারের নিজস্ব উকিল। আসামীরও নিজস্ব উকিল। ভারতের গণতন্ত্ররক্ষাকারী সাংবিধানিক বিচারব্যবস্থায় অভিযুক্তকে নির্দোষ বলে ধরে নেওয়াই রীতি। সাক্ষী যে মিথ্যে বলছে না তার প্রমাণ দিক।

সুতরাং

—তুমি আসামীকে আগে চিনতে ?

—না হুজুর।

—আগে তার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছ ?

—আমি একে চিনি না।

—তুমি নিজের ইচ্ছেয় এর কাছে এসেছিলে।

সুতরাং..

—তোমার ইচ্ছা ছিল যে আসামী তোমার সঙ্গে শারীরিক সংসর্গ করুক।

—না না ও জোর করে—

—ওরা আমার মুখ চেপে রেখেছিল।

—ধর্মাবতার, সাক্ষীর মুখে বা গলায় যে সব দাগ আছে সেগুলি মুখ চেপে ধরার নয়।

সুতরাং....

—তুমি বলছ তোমাকে এই লোকটি জোর করে।

—হ্যাঁ হুজুর।

—তুমি বাধা দাওনি কেন?

—চেষ্টা করেছিলাম,—ওর গায়ে জোর বেশি।

—তুমি সেলাই করতে জানো?

— ?

—ছুঁচে সুতো পারতে জান?

—হ্যাঁ।

—ছুঁচটা যদি কেউ ক্রমাগত নাড়ায় সুতো পরানো যায়?

এবং এর চেয়েও আরও অনেক কুৎসিত বীভৎস বুদ্ধির প্যাঁচ। রসালো। ভর্তি কোর্টঘরে মাটিতে মিশিয়ে যাওয়া মুখের নিচে যে শরীর, তা তো সত্যি মাটিতে মিশে যায় না। অনেক চোখের সামনে মেলা থাকে। বিচারের ধরনটা এরকম—আসামী নিরপরাধ, লাঞ্ছিত অবমানিত মেয়েটির যা হয়েছে তাই যথেষ্ট নয়, আরও অনেক ঠাণ্ডামাথার লাঞ্ছনা অপমান সহ্য করে সে প্রমাণ করুক যে সে সত্যি কথা বলছে। টাকা বা অন্য কোনো কারণে নিজের কপালে নিজের হাতে এই কলঙ্কচিহ্ন আঁকতে আসেনি। আর সেইসব কিছু পর আসামী খালাস পায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পায়—কেন না মেয়েটি ছাড়া এসব ঘটনার আর কোনো সাক্ষী থাকে না। কিংবা সে সাত বছরের সাজার বিরুদ্ধে জামিনে বাইরে থেকে হাইকোর্টে আপিলও করতে পারে। কিন্তু মেয়েটির বরাদ্দ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জেল। বেশিরভাগ এইজন্য যে, খুব কম মেয়েরই অভিভাবক এ সব কেস লড়েন, বা সেই মেয়েটিকে বাড়ি নিয়ে যান। মেয়েটির বিরুদ্ধে কোনো কেস নেই। কাজেই তার সাজা হবার, বা সাজা শেষ হবার কোনো প্রশ্ন নেই। এই মেয়েরা জেলে থাকে, সরকারি রক্ষণাধীনে সেটাই তাদের নিরাপদ আশ্রয় বলে। সেফ কাস্টডি! তার ছাড়া পাবার কোনো উপায় নেই, যতক্ষণ না তার অভিভাবক কোর্টে এসে নিজের পরিচয়ের প্রমাণ দিয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে যায়। আর এইখান দিয়েই দুর্ঘটনাক্রমে একবার লাঞ্ছিত সেফ কাস্টডির মেয়ের জীবনে ঢুকে পড়ে সেই 'সাদা পোশাক'। সমস্ত আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়েও বন্দীত্ব মানুষ চায় না। আর জেল কিংবা সরকারি উদ্ধারাশ্রমের স্বাচ্ছন্দ্য! যা কিনা আত্মহত্যা বা

উন্মাদাবস্থার সঙ্গেও বিনিময়ে করা যায়। সাদা পোশাকের বাড়িতে গিয়ে উঠতে প্রায় কেউই আপত্তি করে না। না—সাধারণত মিথ্যে কথা বলে বা ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় না ওদের।

নূরজাহানকে আটকানোর চেষ্টা খানিকটা করেছিলাম। কিন্তু যার সামনে কিছু নেই—দেয়াল, পেছনে রাস্তা নেই, দেয়াল, তাকে যদি কোনো উপায় না দেখাতে পারি, আমি কী দিয়ে তাকে ফেরাব?

—তুই জানিস ওরা মেয়েদের কেন নিয়ে যায়?

একেবারে ভেঙে পড়া গলায় বলে—দিদি, এখান থেকে যে লিলুয়ায় পাঠিয়ে দেবে!

—তোর বাড়ির লোক আসতেও তো পারে!

—বাড়ির লোক কি জানে হারালে জেলখানায় খুঁজতে হয়? যদি বা আসত কোর্ট-কাছারি পুলিস দেখলে ভয়েই মরে যেত। আর এখন আমাকে কে ঘরে নেবে বলো দিদি?

—তোর বাড়ির লোক এলে তোকে ছাড়াতে পারবে না—ও পারবে কী করে?

—আমার দোষ নিও না দিদিগো! ওদের লোক এসে হাকিমের কাছে দরখাস্ত দেবে আমার বাবা বলে, হাকিম আমাকে শুধোলে আমি 'হ্যাঁ' বলব।

আমি জানি। এও জানি যে এদের নেটওয়ার্ক ভাল। একই দু-পাঁচজন লোক বিভিন্ন কোর্টে বিভিন্ন মেয়ের বাবা, কাকা, স্বামী, মা, দিদি, হয়ে মেয়েদের নিয়ে যায়। তারা সব ঘাঁতঘোঁত জানে। কোথায় কোন চাকায় তেল দিলে কে চোখ বন্ধ রাখবে—সব।

সেবার কোর্টে হাজিরা দিতে গেল নূরজাহান। ফিরল না। ওয়ার্ডার বলল ওর বাবা এসে নিয়ে গেছে।

তারপরে অনেকবার এসেছে নূরজাহান। সাবেরা, ফুলিয়া, বেদানাদের সঙ্গে দল বেঁধে। মুখের শস্তা বাসি পাউডারের ভিতর দিয়ে গলায় গালে কালশিটে, কানের ঝকমকে ঝোলানো দুর পাশে চোখের কালি। তিনদিনের সাজা নিয়ে আসে, চলে যায়। লাইসেন্স হয়ে গেছে।

বহরমপুরের মত খাতির কাউকে দেখায় না প্রেসিডেন্সি। দেখাবার মত সাংগঠনিক অবস্থাই বা কোথায়। এখানে সফিস্টিকেটেড নাগরিক খাতির যত্ন যা হয়, সেটা ওয়ার্ডের বাইরের ব্যাপার। তবু সকাল থেকে ঝাঁটপাট হয়েছে যথেষ্ট। একতলার মুকুল, টুরাদের সেলের দরজায় নতুন চটের পর্দা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের প্রত্যেক খাটে বিছানা পাতা,সাদা

চাদর ঢাকা। কারামন্ত্রী আসছেন জেল পরিদর্শনে। এলেন। সঙ্গে লোক লস্কর, পাত্রমিত্র। জনাদুই চিত্রবিচিত্র সমাজসেবিকা ! নিশ্চয়ই অতি উচ্চপর্যায়ের সেবা করেন এঁরা, এই অভাগা সমাজের। আমাদের সব সেল সকাল সাড়ে সাতটা থেকে টাইট বন্ধ। ওপরে উঠেছেন ওঁরা। আমাদের সেলের সামনের বারান্দা অন্ধকার ক'রে ওপ্রান্ত পর্যন্ত গেলেন। ফিরছেন। আমরা ওঁদের অস্তিত্বের কোনো স্বীকৃতি না দিয়ে, যে যার মত আছি। কৃষ্ণার সেলের সামনে দাঁড়িয়ে এক সমাজসেবিকার বিস্মিত প্রশ্ন— জেলের ভেতরে এদের কাগজ দেওয়া হয় কেন ? নেমে গেলেন। গেট দিয়ে দুপুরের খাবার ঢুকছে। মন্ত্রী কথা বলেন কম। খাবার পরীক্ষা করে দেখবার সময় মেয়েরা কেউ সাহস করে বলেছে পরিমাণ ও অবস্থার কথা। তাতে কেবল বলেছেন জেলের ভেতর তরকারি দেওয়া হচ্ছে এটাই কি যথেষ্ট বেশি নয় ! নিশ্চয় বেশি ! কালো রুটি আর জল দেওয়াই তো উচিত ছিল। অবশ্য মন্ত্রী নতুন কোনো কথা বলেননি। দেখছি ১৮২৫-৫৫ সালে I.G. (Prisons) এফ জে মোটয়ের রিপোর্টের অংশ—'হুগলী মেয়ে হাজতের অবস্থা ভালোই, মেয়ে কয়েদীদের স্বাস্থ্যও ভালো, কয়েকজন মেয়ে কয়েদী কাজের পরিমাণ কমাবার আবেদন করেছে এবং অন্য একজনের অভিযোগ, জেলে তাকে পর্যাপ্ত আহার দেওয়া হয় না। দ্বিতীয় অভিযোগকারিণীর শারীরিক অবস্থা দেখে তার কথা বিশ্বাস হয় না। আর প্রথমদের ইচ্ছাপূরণে আমার সায় নেই। এরা ভাল খেতে পাচ্ছে, ব্যবহারও ভাল পাচ্ছে। হালকাধরনের কাজ এদের দেওয়া হয়।

বাঁকুড়া জেলের মেয়ে বিভাগে কয়েদি মেয়েরা যে পরিমাণে সুতো কাটে তা বাইরের একজন শ্রমিকের চেয়ে অনেক কম মনে হল। এ বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেট অনুসন্ধান করে দেখবেন এবং একথা সত্যি হলে আরও বেশি কাজ আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। শাস্তির মাধ্যমে সংশোধনের যোগ্য মেয়েদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব সমস্ত জেলগুলিতে বর্তমান। মনে হয় এদের যাঁতাপেষা প্রভৃতি আরও ভারী কাজ দেওয়া উচিত।'

আজ কিন্তু আলুর তরকারি ! সরকারি ইনসপেকশানের জয় হোক !

হাসপাতালের সবগুলো খাটে তাহলে বিছানা পাতা যায় ! অন্তত একদিনও গিয়েছিল। এক সপ্তাহও হয়নি, ওই নিচের উঠোনে মাটিতে গড়াগড়ি করে কাঁদছিল শান্তিবাঈ —মোর লাগি জেহেল খাটে রে দিদি—ফুল জৈসী বাচোয়া মর গেলেই গে—সদ্য বাচ্চা মরে যাওয়া প্রসব-ক্লান্ত শ্যামবাঈয়ের কাঁদবারও বিশেষ শক্তি ছিল না। ফর্সা লম্বা চেহারায় ক্লান্তির কালো ছাপ মাখা। একপাশে বসে গুনগুন করে কাঁদছিল আর একবার শান্তিবাঈকে বলছিল, চুপ যা, চুপ

যা। ওরা দু'জনে বোন নয়। পাশাপাশি কোঠায় থাকা সাথী, বান্ধবী। দুজনেই ওস্তাদ গাইয়ে। শান্তিবাঈ শুনেছি নাকি নাচতেও পারে। দুজনে দুই আমীর আদমির রক্ষিতা। শান্তিবাঈয়ের বাবু হঠাৎ মারা যেতে, তার ঘরওয়ালি আর ছেলেরা পুলিশ এনে শান্তিবাঈয়ের ঘর সার্চ করে 'বাবু'র দেওয়া এবং না-দেওয়া সমস্ত গয়না টাকা জিনিসপত্র বার করে নিয়ে, চুরির কেসে আটক করিয়েছে তাকে। শ্যামবাঈ বন্ধুর কেস দেখাশুনোর জন্য উকিল দিয়েছিল। প্রতিদিন কোর্টে গিয়ে খোঁজখবর নিত। দরকারি জিনিসপত্র দিয়ে যেত। শান্তিবাঈয়ের মৃত 'মালিকে'র প্রভাবশালী পরিজনকুল ইগো পরিতৃপ্ত করার জন্য দুটি অসহায় মেয়ের মত সহজ লক্ষ্যবস্তু আর কোথায় পেতে পারতেন ! চোরাই জিনিস গচ্ছিত রাখা ও চুরির প্রমাণ লোপের সন্দেহে যখন গ্রেপ্তার হয়ে এসেছে শ্যামবাঈ তখন সে চার-পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। কেস কোর্টে উঠবে, গড়াবে, বিচারে দোষী-নির্দোষ প্রমাণ হবে, সে তো বহুদিনের, ব্যাপার। এ কেস ত্বরান্বিত করার দায়ই বা কার ! আপাতত আন্ডার ট্রায়াল থাকুক। শ্যামবাঈয়ের 'মালিক' কোঠীর মালকিনকে কিছু টাকা দিয়ে দিয়েছেন শ্যামবাঈয়ের খোঁজখবর নেওয়া, উকিল লাগানোর জন্য, এই কি যথেষ্ট নয়। ছোটখাট, শ্যামলা চেহারার শান্তিবাঈ আর আর দপদপে আগুনের মত ফর্সা লম্বা চেহারার শ্যামবাঈ। একজন বিষণ্ণ হলে, অন্যজন দেখি তাকে ভোলায়। আবার কখনও বা দুজনেই বিষণ্ণ উদাস হয়ে বসে থাকে। হয়ত ভাবে এখানে বেশিদিন থাকতে হলে ফিরে গিয়ে খাবে কী ? তবু দুজনের মধ্যে শ্যামবাঈ-ই হাসিখুসি, মাঝে মাঝে গানও গায়। ক্রমশ ভারী হয়ে আসা শরীরের কষ্ট নিয়েও।

আর এই গত সপ্তাহে প্রসবযন্ত্রণায় কাতর শ্যামবাঈকে রাত্রে লক আপের সময়, শিখা লালমোতির বিরক্তি সত্ত্বেও, রাখতেই হয়েছিল হাসপাতালে। অনেক রাত পর্যন্ত হাসপাতাল থেকে শ্যামবাঈয়ের আর্তচিৎকার—গেটের সামনে বসে ওয়ার্ডারের সঙ্গে তাস খেলতে খেলতে গল্পকরা শিখা সরযূর কুৎসিত গালাগালি আর জেনারেল ওয়ার্ডের জানলা ধরে দাঁড়িয়ে শান্তিবাঈয়ের কান্না আর ওয়ার্ডারে উদ্দেশে কাকুতি-মিনতি করা শুনতে পাচ্ছিলাম। তারপর অনেক রাত্রে কখন সব চুপ হয়েছে, কী হয়েছে হাসপাতালে, আমরা আর জানতে পারিনি। সকালের লকআপ খুলল শান্তিবাঈয়ের আছাড়িপিছাড়ি কান্নায়। মরে গিয়েছে শ্যামবাঈয়ের বাচ্চা। বিছানাপত্র নষ্ট করতে রাজি হয়নি সরযূ। তাই খাটের লোহার ওপরেই শোয়ার জায়গা দেওয়া হয়েছিল শ্যামবাঈকে। খাটটার মাঝখানে অনেকখানি জায়গা ভাঙা। শিখার বক্তব্য

মরা বাচ্চাই জন্ম দিয়েছিল শ্যামবাঈ। শ্যামবাঈ ক্লান্ত কান্নাভাঙা গলায় ওয়েলফেয়ার অফিসারকে বলছে, বাচ্চা জন্মে কেঁদেছিল। তারপর শ্যামবাঈ একা একা নিজেই কোনরকমে বাড়ি থেকে আনানো বাঁশের চাঁচ দিয়ে নাড়ি কাটতে তার হাত পিছলে ভাঙা জায়গাটা দিয়ে বাচ্চা নিচে পড়ে মরে গেছে। দশটায় ডাক্তার এসে স্টিলবর্ন বাচ্চার সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে শ্যামবাঈকে ডিসচার্জ করে দিলেন হাসপাতাল থেকে।

দিন পনেরো পরে জামিনে ছাড়া পেয়ে চলে যাবার আগে পর্যন্ত প্রায় সর্বদাই দেখতাম নোংরা উঠোনটার কোনো একটা কোনায় বসে সাধ্যমত শ্যামবাঈয়ের পরিচর্যা করছে শান্তিবাঈ। আর নাহলে দুজনে গায়ে গায়ে বসে কাঁদছে গুনগুন করে। দুই বোন, দুই সাথী, মাংস হিসেবে বিক্রি হতে বাজারে আসা দুটি নারী।

তবু শ্যামবাঈকে ম্লান করে দেবার মত স্মৃতি এখনও ভয়ংকর জীবন্ত, এই সন্তান প্রসবকে ঘিরেই। অনেক সময় অনেকেই জিগেস করেন, জেলে খুব কষ্ট দিত? অত্যাচার করত? সাধারণত হেসে এড়িয়ে যাই—জেলে কি আর লোককে আদর-যত্ন করার জন্য নিয়ে যায়? অত্যাচার, কষ্ট—এসব শব্দের মানে কি, ভালো করে জানি আমরা? সমাজ সংসারের নিরাপদ ঘেরাটোপে পালিত মানুষরা!

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বহু মেয়েরই মানসিক সামান্য কিছু অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। সে সময়ে তাদের প্রয়োজন শুধু মনোযোগ, দরদ। যে ভয়ানক শারীরিক ও আবেগজনিত অবস্থার মধ্য দিয়ে সে পার হচ্ছে তার প্রতি সমবেদনা। কিন্তু বারান্দার ফোকর দিয়ে নিচের উঠোনের একপাশে পা মেলে বসে থাকা যে ছেঁড়াকাপড় পরা মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছি, সে স্পষ্টতই এসব কোনকিছুরই নাম শোনার বিলাসিতা থেকে বঞ্চিত। রাস্তায় ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল বলে পুলিস তাকে ধরে এনে 'সেফ কাস্টডি' তে রেখেছে। এই শব্দটি যিনিই 'কয়েন' করে থাকুন তাঁর তিক্ত রসবোধের সামনে টুপি খুলতেই হয়। যেমন নাজি ডেথ চেম্বারগুলির ওপরে লেখা থাকত 'শ্রম মুক্তি'। এরকম ব্ল্যাক হিউমারের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নিপীড়করা সবাই উদ্ভাবক। তো সেই সেফ কাস্টডির উঠোনে বিকেলের খাবার দেওয়া হয়ে গেছে। বাইরের আকাশ থেকে আলোর শেষ আভাস এখনও মিলিয়ে যায়নি। অফিসযাত্রীরা বাড়ির দিকে চলেছে, উজ্জ্বল সন্ধ্যার জন্য তৈরি হচ্ছে পঞ্চাশফুট দূরের শহর। মেয়েরা বাটিতে করে খাবারজল ভরে নিয়ে অন্ধকার, দুর্গন্ধ ঘরটার পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে—বন্ধ হবার জন্য। পাগল মেয়েটি এসেছে মাত্র দিন দুই। খাবারের

থালা পাশেই ধরা রয়েছে। মাটির দিকে ঝুলে পড়া পেটের দু'পাশে দুই পা ছড়িয়ে, মাথা বুকের ওপর ঝুঁকিয়ে কী খেয়ালে সে বসে আছে। আসন্নপ্রসবা। ওধার থেকে ওয়ার্ডার দু-তিনবার তাকে ডাকল। সে নড়লও না, মাথাও তুলল না। এমনকি হয়তো বুঝতেই পারল না যে ডাকা হচ্ছে তাকেই। শিখাকে দেখছি এগিয়ে আসছে। সেই আসন্ন মায়ের পাশে এসে দাঁড়াল। কোমরে দুহাত রেখে পা তুলে লাথি মারল। মাটিতে গড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। লালমোতি তার চুলের মুঠি ধরে মাটিতে হেঁচড়ে নিয়ে চলেছে, টানতে টানতে। উঠোনের মাঝামাঝি এসে মেয়েটি লালমোতিকে ঠেলে দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করে। এবার শিখা আর শিখার পেটোয়া সোন্ধি ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। হিঁচড়ে ওয়ার্ডের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। চলে গেল আমাদের চোখের আড়ালে। এরা সবাই ধারণ করেছে সন্তান। জেনেছে সেই ভয়ংকর যন্ত্রণার কথা। কিন্তু জেলে সবকিছুই এত কুৎসিত হয়ে উঠতে পারে কেন? এজন্যই কি যে, যে হীন সেই গুরুত্ব পায় সুন্দরের ওপর? ভীতুর হাতে অধিকার থাকে সাহসীকে শাস্তি দেবার? অযোগ্যতমের হাতে থাকে মর্যাদাসম্পন্নকে শাসন করার ক্ষমতা? খুঁজে খুঁজে মানবতার কণামাত্র বোধহীন লোকদেরই এনে রাখা হয়, অসহায় মানুষদের নিপীড়ন করার ক্ষমতার অধিকারী করে?

বদ্ধ জল পচে যায়। বদ্ধ মানুষ পচে যায় আরো অনেক বেশি।

রাত্রে অনেকক্ষণ আমি আর কৃষ্ণা নিজের নিজের সেলে বসে বিকেলের মেয়েটির কথা, এই সব কিছুর কথা আর এই সমস্ত কিছু অক্ষম দেখে যাওয়ার যন্ত্রণার কথা বলি। কথাও যেন ভারী হয়ে যায়। শেষে চুপ করে বসে থাকি। বারান্দায় পড়া আলোর ফ্রেমে দেখতে পাই কৃষ্ণাও দরজার পাশে বসে আছে। অন্যদিন ও ছোট্ট খুপরিটার মধ্যেই পায়চারি করে হাত-পা সচল রাখার জন্য, গান গায়।

রাত্রি দশটার ঘন্টা পড়ে। কখন যেন পিছনের দেয়ালের কাছে সিপাইবদলের কথাবার্তার টুকরো শব্দ পাই। আর আচমকা রাত্রির প্রায় নিস্তব্ধতাকে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ফেলে বীভৎস জান্তব আর্তনাদ। একবার—দু'বার—তারপর চলতেই থাকে। প্রথমে আতঙ্কে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, একটু পরে বুঝতে পারি। দাঁড়িয়েই থাকি। বড়দির ডিউটি আমাদের সেলে। নিচে ওয়ার্ডের দরজায় বসে অন্যদের সঙ্গে গল্প করছিল। আমাদের ডাকাডাকিতে উঠে আসে। মুখটা কালো করে প্রায় মাথা নিচু করে থাকে। না, শুধু প্রসবযন্ত্রণা নয়। ওকে বিকেলে মারামারি করার অপরাধে পায়ে বেড়ি দিতে হুকুম দিয়ে গিয়েছে মেট্রন। মাটিতে ফেলে বেড়ি লাগানো পাটা

মাটি থেকে ফুটখানেক উঁচুতে গরাদের গায়ে বাঁধা আছে। বাইরে আসতে পারছে না ওর শিশু। রাত্রির স্তব্ধতাই শুধু ভাঙে মায়ের মৃত্যু আর্তনাদে। আকাশ ভেঙে পড়ে না মানুষকে খাঁচায় ভরে রাখা এই গারদের মাথায়। ফেটে যায় না মাটি। গ্রাস করে নেয় না যারা—সে সমস্ত সন্তান প্রসূতিরা দশহাত দূরে বসে হাসপাতালের রুগীদের নামে আসা মাংসের ঝোল দিয়ে ভাত মেখে খেতে খেতে লুডো খেলছে—তাদের। শুধু গরাদ মুঠো করে ধরে থাকতে থাকতে, রক্তহীন অবশ হয়ে যায় আমাদের হাতের তালু। কী হয় তাতে। অনেক পরে ককিয়ে ককিয়ে থেমে যায় চিৎকার। অনেক পরে সকাল হয়।

তারও অনেক অনেক পরে ডাক্তার এসে ঘুরে চলে গেলে, স্ট্রেচার বার করে নিয়ে যায়, শান্ত হয়ে যাওয়া বেড়ি খোলা মৃতদেহ। ঢাকা চাদরের তলা দিয়ে ঝুলে পড়া গোছা পাকানো চুল।

লোকে শুধোয়—অত্যাচার করেছিল?

ওয়েলফেয়ার অফিসার কিছুদিন ধরে চেষ্টা করেছেন বিজু, সন্ধ্যা, মান্না, নিমি ওদের সরকারি অনাথ আশ্রমে না পাঠিয়ে যদি কোনো সমাজসেবী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া যায়। তাতে ওরা অন্তত বাইরের পৃথিবীতে যাবে। মান্নার বয়েস পাঁচ, উজ্জ্বল চোখদুটো ভর্তি নানারকম কৌতূহল—পাঁচিলের ওপারে যে-সব শব্দ শোনা যায় ওগুলো কী? বাস! বাস কী? কেমন দেখতে? রাস্তা কেমন? লকআপ হয় না? রাত্তিরেও খোলা? তবে কখন লকআপ হয়? ওরা বেড়াল চেনে, ইঁদুর-আরশোলাও চেনে, কিন্তু কুকুর দেখেনি। বিজু দেখেছে। গোটা কুমড়ো, আস্ত বেগুন? নাঃ, দেখেনি! বিজু দেখেছে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে বিজু সেই সব আশ্চর্য জিনিসের গল্প বলে। খেতে বসার পিঁড়ি, অ্যালুমিনার নয় রে—সাদা কলাইয়ের থালা। ওরা আট জন। তার মধ্যে বিজু হয়ত যেতে পারবে না, ওর তো কেস আছে, ও তো চোর। তরতরে নাক, ঝকমকে চোখ, পাতলা ছিপছিপে আমাদের বিজু।

নভেম্বরের ঠাণ্ডা।—বিজু তুই জামা গায়ে দিসনি কেন রে? শীত করছে না? বিজু চুপ। চলে যায়। আবার ঘুরে ফিরে নিচের উঠোনে এসে দাঁড়ায়। অনেকক্ষণ পর—মাসি দ্যাখো এখানে কত রোদ! শুধু এইটুকু বলতে পারে ও। আমাদের সেলে রোদ আসে না, আমাদের বুঝি শীত করে—সেই শীত ও নিজের খোলা গা দিয়ে ভাগ করে নিতে চায়। ওয়েলফেয়ার অফিসার এখন মাত্র সপ্তাহে একদিনই ওপরের অফিসে বসেন। অন্য হাজতীরা আসতে

পারে না। গত সপ্তাহে বলেছিলেন, দুটি মিশনারি প্রতিষ্ঠান সব বাচ্চাদের নিতে রাজি হয়েছে। এক বাস্কেট রঙিন জামা এনেছিলেন, বাচ্চারা যাবার সময়ে পরে যাবে। রাইটার্সে ছুটোছুটি কাগজপত্র তৈরির পালাও শেষ। আর এ সপ্তাহে যখন এলেন মুখখানা হতাশায় সাদা হয়ে গেছে। হিন্দুধর্মের কোনো রক্ষাকর্তারা রাইটার্সে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর ঘরে এসে বিক্ষোভ জানিয়েছেন হিন্দু বাচ্চাদের ক্রিশ্চান মিশনারিদের হাতে তুলে দিয়ে ধর্মান্তরিত করার ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে। সুতরাং ফাইল যখন একবার নড়েছে তা থামল একেবারে একটা ব্যবস্থা পাকা করে।

নিজের নিজের ধর্ম ও উকুন মাথায় নিয়ে বাচ্চারা চলে গেল অনাথ আশ্রমে—লিলুয়ায় আর বহরমপুর বোর্স্টাল জেলে। মায়া আগেই গিয়েছে, উঠোন ফাঁকা করে দিয়ে চলে গেল আমাদের বাচ্চারা।

চারদিকে যাই হোক, আমরা নিজেদের হাসিখুশি রুটিন শৃংখলা টিকিয়ে রেখেছি এতদিন। এখন দিনগুলি ক্রমশ যেন কেমন অন্ধকার হয়ে উঠছে। হাসিহীন। স্বাতী চলে গিয়েছে ডিভিশান নিয়ে। অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে লড়েছিল, কিন্তু ওর স্বামী অ্যারেস্ট হয়ে আসবার পর ওকে বলা হল, একমাত্র ডিভিশান প্রিজনাররাই অন্য বন্দীর সঙ্গে দেখা করতে পারবে। ডালিয়ার দশ বছরের সাজা আগেই হয়ে গিয়েছিল, ওকে সেল থেকে নিয়েও যাওয়া হয়েছিল—এবার ডালিয়া চলে গেল বারাকপুর জেলে। আমার শারীরিক অসুস্থতা বাড়ছেই। মাঝে মাঝে সমস্ত দিনই মাটি থেকে মাথা তোলা যাচ্ছে না।

ঠিক এমনি সময়েই একদিন পেয়েছি বোধহয় আমার এই জীবনের সবচেয়ে মূল্যময় উপহার।

বাপীদি ছাবরাদি-রা আসে সাধারণত মাসের শেষদিকে একবার। পুলিসদের নাকি কেসের কোটা পুরো না হলে ওদের দল ধরে তুলে আনে। দু'দিন পরে চলে যায়। সেবার বাপীদি এল, আরও কালি হয়ে গেছে মুখচোখ। অসুখ বেড়েছে আরও।

আমি একেবারেই মাথা তুলতে পারছি না, বমির সঙ্গে রক্ত উঠে আসছে। ডাক্তার নিচ থেকেই ডজন ধরে ক্রোমোস্টাট ট্যাবলেট পাঠিয়ে দিয়েছে। এরপর পাছে গলায় ভরে রাখার প্লাগ পাঠিয়ে দেন, তাই আমরা নিজেরাই চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করছি। সেলের দরজা না খুলে দিলে কৃষ্ণা ভেতরে আসতে পারে না। এছাড়া আমার কাছে এখন দরজা খোলা না-খোলার বিশেষ তফাত নেই। কতবার যে কৃষ্ণার হাতে বমি করছি, তার ঠিক নেই।

বাপীদি দরজার কাছটায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিক। তারপর বসে আস্তে আস্তে মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ছোট ছোট খসখসে হাত দুটো দিয়ে মমতা চুঁয়ে চুঁয়ে আমার ভিতরে চলে যাচ্ছে, শুকনো খরার পরে ঝরা শিশিরের জল যেমন মাটির ভিতর চলে যায়। কতোদিন এই হাতগুলো দিদির হাত মায়ের হাত হয়নি।

আর ঠিক দু'দিন পরের সন্ধেবেলা কোর্টের গাড়ি ফিরেছে, ওয়ার্ডের গেট খুলতেই গুনতি হবারও আগে কে যেন আবছা অন্ধকার দিয়ে একটু পা টেনে টেনে দৌড়ে আসছে দোতলার দিকে। পেছন পেছন ওয়ার্ডার আসছে চেঁচাতে চেঁচাতে। আমার সেলের দরজায় একটা ঠোঙা নামিয়ে দিল বাপীদি। খানিকটা আঙুর আর একগোছা লাল কাচের চুড়ি।

—তুমি যে কিচ্ছু খেতে পারছ না। কাল দুটো খদ্দের বেশি পেলাম। কোর্টে ওই রাক্ষুসীদের হাতে দিলে তো তোমায় দেবে না, তাই আজ অ্যারেস্ট হয়ে গেলাম—।

নেমে গেল। দেখতে পাচ্ছি পা টেনে টেনে উঠোন পেরোচ্ছে। দুটো খদ্দের বেশি পেয়েছিল যে!

ফুলিয়া বলে একটা মেয়ে আসে, বয়েস হয়ত হবে সতের। খুব কমই আসে। ওর মা কোঠায় বসত। এখন সে বুড়ি আর জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। ফুলিয়া ঘর চালায়। ওর ছোটভাই মেয়েদের জন্য লোক ধরে আনে। দিদির জন্যও। চড়া ধারালো গলায় গান করা শুনলে বুঝতে পারি ফুলিয়া এসেছে। ওকে দেখতে খুব সুন্দর। খুব শখ ছিল পড়াশুনো শিখবে। ফোর অবধি পড়েছিল। নতুন ইস্কুলে ফাইভে ভর্তি হতে গেল! হেডমাস্টারমশাই ওকে চিনে নিলেন। তিনি ওর মায়ের 'বাহক'। ভর্তি হওয়া হল না। ইস্কুলে ভাল বাচ্চারা পড়ে যে! ফুলিয়া তেরো বছরের হলে সেই মাস্টারমশাই ওর নথ খুলিয়েছিলেন।

প্রথম যেদিন অন্য কার সঙ্গে যেন ভয়ে ভয়ে ওপরে এসেছিল ফুলিয়া, দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল সংকুচিত হয়ে। অনেক ডাকতেও ভেতরে আসছিল না। শেষে হাত ধরে টেনে এনে শুয়ে থাকা কম্বলটার ওপর বসিয়েছি। অতো হৈচৈ হাসি-গানের মেয়ের চোখ কেমন জলে ভরে এল।

—দিদি তোমরা কাউকে ঘেন্না করো না— না দিদি?

—ঘেন্না করি না! তোর সামনে দাঁড়িয়েও যদি কাউকে ঘেন্না না করি—!

মায়ার জায়গায় যে নিভা এসেছে, মায়ার কথা মনে করে ওর সঙ্গে ব্যবহারে আমরা সব সময় সতর্ক হয়ে থাকি। নিভা মায়ার মত চটপটে

চৌকস মেয়ে নয়। শান্ত, একটু বা ভীতু। কুচকুচে কালোপাথরের প্রতিমার মত মুখ ঘিরে থুপি থুপি কোঁকড়া চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে। তার মাঝখানে টকটকে সিঁদুর পরা সিঁথি। ও পাগল ছিল। নিজেই বলল। তাই ওর চুল ছোট। পাগলবাড়িতে সকলকে ন্যাড়া করে রাখে। অনেকটা নারকেল তেল বাঁচে। বহরমপুরেও রাখত। আমার সেলের পাশের বারান্দায় গ্রীষ্মের দুপুরে সেই কান্না এখনও কান ভরে আছে 'ওমা তোমাদের পায়ে পড়ি আমি পাগল নই। ওগো আমি সধবা মানুষ ছেলেপুলের মা—আমার চুল ফেলে দিও না'—পুষ্প নেইয়ার কাঁচি, লাঠি আর মুখ একসঙ্গে চলছিল। পরে জানা গেল সরকারি কর্মচারী স্বামী নিজের মেয়েকে ধর্ষণ করেছিল। মা দা নিয়ে ছুটে রাস্তা পর্যন্ত এসেছিলেন তাকে তাড়া করে। সেখান থেকে তাকে পাগল বলে লোকজন ডেকে রিকশায় তুলে স্বামী দিয়ে গেছে কোর্টে। মা বলতে চাননি কেন অমন করে ছুটেছিলেন। কে চায় ! আর মানুষের অভ্যেস কাউকে 'পাগল' শুনলেই তার সব কিছুতে পাগলামি দেখা। আজও বহরমপুরের সেই ফিমেল ওয়ার্ডারের কাছে কৃতজ্ঞ, যিনি গোপনে সমস্ত খোঁজ নিয়ে সব কথা সত্যি জেনে, পরিচিত পুলিসদের দিয়ে ভদ্রমহিলাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পর্যন্ত পৌঁছনোর ব্যবস্থা করে দেন।

প্রথম প্রথম নিভা থাকতও একটু ভয়ে ভয়ে। আস্তে আস্তে সহজ হয়ে এল। অনেকবার সময়-অসময়ে চা খেতে চাইলে ভাঁটি ঘর থেকে করেও এনে দেয়। কিন্তু বকতেও শিখল। কবে যেন নিজেই কাজ বানিয়ে নিয়েছে, রোজ সকালে ডিভিশান ওয়ার্ডের একফালি বাগান থেকে বেছে বেছে একমুঠো দুর্বাঘাস তুলে আনা। দুর্বার রসে নাকি রক্ত পড়া বন্ধ করে। এখানে কিসে থেঁতো করবে ! ওর অসহায় হতাশ মুখখানা দেখে খেতে হল চিবিয়ে। হাম্বা করে ডাকব কি না জিগেস করলে আবার রেগে যায়। নিভার বাড়ি তারকেশ্বরের কাছে। বারো বছরে বিয়ে হয়ে তেরো বছরে জননী। স্বামী কামার। অনেক বড় ওর চেয়ে আর ভীষণ রাগী। আর লোক বলতে এক রাগী শাশুড়ি। বুঝতে পারি ওকে দেখেই যে, ভয়ে কিরকম আধমরা হয়ে থাকত। ঘরে কেরোসিন নেই, সে কথা বলারও সাহস নেই। সারাদিন পর ঘরে ফিরলে, অন্ধকার দাওয়ায় খেতে দিয়েছিল। দাওয়া থেকে লাথি মেরে সটান ফেলে দিয়েছে প্রথমে ভাতের থালা—তারপর নিভাকে। আর এইসব কিছুর পরে, খিদে পেটে রাত্রে স্বামীর চাহিদা মেটাতে যন্ত্রণায় আতঙ্কে যেন মরে যেত নিভা। মাথায় ভয়ংকর যন্ত্রণা হতে শুরু করল। শুরু হল ফিট হয়ে যাওয়া, মা কালীর 'ভর হওয়া'। তারপরে অংশটা নিভার স্মৃতিতে

এখনও ঝাপসা। রাস্তা থেকে ধরে কেউ থানায় জমা দিয়ে গিয়েছিল, নাকি বাড়িরই কেউ—সে সব ওর মনে নেই। কেবল ছেলের কথা মনে হয় বড্ড বেশি করে। তবু নিভা গল্প করে, আমাদের ভালোবাসে, শাসন করে—আর ক'দিনেই দেখা গেল, ভয়ের ঢাকাটা খুলে গিয়ে যে নিভা বেরিয়ে এসেছে সে ভারি হাসিখুশি এক ছোট মেয়ে। সবচেয়ে আমাদের অবাক করেছে ওর মুখস্থ গ্রাম্যছড়ার সম্ভার। প্রত্যেক কথার জবাবে একটি করে ছড়া তৈরি আছে ঠোঁটে।

—ও নিভা চুল আঁচড়াসনি, টিপ পরিসনি, এমনি কেন আজ ? নিভা তখুনি গলা জড়িয়ে ধরে ঝরঝরিয়ে বলে দেবে—

অতি ভালো কাপড় কালো পাকা পেয়ারা।
তোমার জন্য ভেবে ভেবে মোর এই চেয়ারা।
কিংবা—কোথায় গেছলি নিভা, অনেকক্ষণ দেখতে পাইনি তো।
কচি কচি পেয়ারা পাতা ও ঠাকুরমা যাচ্ছ কোথা—
আমি যাচ্ছি কোলকাতা এনে দিব কাজললতা।
এমনি অফুরন্ত, সারাক্ষণ।

আবার কোনোদিন মুখখানি ম্লান। দিদি, একটা চিঠি লিখে দেবে আমার বাড়িতে। যদি একবার খোকাটাকে দেখিয়ে নে' যেত !

—দেব তো। ঠিকানা বলতে পারবি ? পোস্ট অফিস ?

—সে যে জানি নি গো ! ঘর থিকে যে বেরাই নাই কখুনো। খুব সন্তর্পণে বড়দিকে দিয়ে একটু একটু করে খোঁজ নেওয়াই নিভার কেস টিকেট, পুলিস রিপোর্ট—কোথাও কি ওর ঠিকানা নেই ? পাওয়া গিয়েছিল নিভার ঠিকানা। ওয়েলফেয়ার অফিসারের চেষ্টায় ডাক্তারের 'ফিট' সার্টিফিকেট সুদ্ধ ওকে পৌঁছে দেবার অর্ডারও দিয়েছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট। তার প্রায় এক মাস পর খুব আঁকাবাকা অক্ষরে কাউকে দিয়ে লেখানো নিভার চিঠি—'দিদি গো, তাহারা আবার বিয়া করিয়াছে। আমি তো পাগল বলিয়া গোয়ালে শুতে দেয়। খোকা রোগা আর কালো হয়েছে। আমাকে চেনে না। 'মা' বলে না, বলে পাগলি। কোলে নিতে তাহারা বারণ করেছে। তোমাদেরও আর দেখতে পাব না।

আমার কেউ কোথাও নাই।'

আর এত যে মানুষ চারপাশে তবু কেন এমন 'কেউ কোথাও নাই'।

ওয়েলফেয়ার অফিসার বলেন, যারা একবার পাগল হয়ে যায় তারা

আর ভালো হতে পারে না, জানেন। কেউ তাদের ভালো হতে দেয় না। 'পাগল ছিল' 'পাগল ছিল' এই অবিশ্বাস সহ্য করতে করতে আবার পাগল হয়ে যায়। আসলে পাগলদের চিকিৎসা তো হবে, কিন্তু ভালো হয়ে লাভ কী? তারপর সে যাবে কোথায়?

আর পাগলদের কথা উঠলে কিছুতেই মনে করতে চাই না যার কথা—সেই লাবণ্যর কথা কেন না বলেই পারা যায়-না? কী লাভ একথা বলে যে, লাবণ্যর কুড়ি-বাইশ বছর বয়স ছিল। উন্মাদ হয়ে আসত, পাগলবাড়িতে থাকত, আস্তে আস্তে খানিকটা ভালো হয়ে গেলেই অস্থির হয়ে উঠত বাড়ি যাবার জন্য। জেল পাগলদের আটক রাখার জায়গা। ভালো হয়ে উঠে যারা বাড়ির ঠিকানা বলতে পারে, তেমন পাগলদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার উপায়ও আছে। ছোট ছাঁটা চুলে সিঁদুর পরে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভারি হাসিমুখে চলে যেত ফর্সা পাতলা চেহারার লাবণ্যপ্রভা। আর একমাস বাদেই ফিরে আসতো আবার উন্মাদ হয়ে, আর ওর দুই উরু লোহার ছ্যাঁকায় নয়ত অ্যাসিডে পোড়া। অন্তত পাঁচ বার ফিরে গিয়েছিল। তারপর আর-ফিরে আসেনি। কিংবা নাম না-জানা সেই বয়স্ক পাগল মেয়েটির কথা। মাসের পর মাস বেড়িতে বাঁধা থেকে থেকে যার পায়ের চামড়া ফেটে ফেটে ঘা হয়ে গিয়েছিল আর সেই ঘা দেখিয়ে অদ্ভুত শান্ত হাসি-হাসি মুখে সে আমায় বলেছিল, জান আমি তো আমাদের বাড়ির একটাই মেয়ে ছিলাম। ছোটোকালে যখন পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলা করতাম তখন আমার দাদু পাশে বসে হাত পেতে রাখতেন—ছুঁড়ে ছুঁড়ে পা মাটিতে লাগলে পাছে যদি ব্যথা পাই! আমি স্নান করতে যাচ্ছিলাম, আর তার নড়াচড়া করার শক্তি নেই বলে উঠোনের রোদে পড়ে নিজের গায়ের ময়লা খুঁটছিল। মুকুল ক্রিমিনাল লুনাটিক হলেও আমরা দেখেছি তাকে খুব নিরীহ চুপচাপ। কতদিন ধরে যে আছে ওই অন্ধকূপ সেলে, তাও জানি না। আপন মনে মাঝে মাঝে অদ্ভুত কী সব গান গায়। বিনোদার মত চড়া গলা নয়। কেমন যেন ভীরু আস্তে আস্তে গলা। কোনো সামর্থ্য নেই সেই গলায় আর বুক ভরে নিঃশ্বাস টানার, যে শ্বাস ছাড়বার সঙ্গে জোরে বেরুবে গানের কলি। আমরা এতদিনে অনেক কথার মধ্যে শুধু একটি লাইন বুঝতে পেরেছি, 'রাজপুত্তুররে কাইট্যা কুইট্যা শোয়াইলাম'। একটা ভাঙা তোবড়ানো নোংরা থালায় একমুঠো ভাত একহাতা ডাল তিন-চার হাত দূর থেকে মুকুলের সেলের সামনে গরাদের বাইরে ঠেলে দেওয়া হয়। কোনোদিন সেটা রয়ে যায় ওর নাগালের বাইরেই। কোনোদিন বা নাগালের মধ্যে গেলেও ও তক্ষুনি খায় না, বেড়ালে খেয়ে যায়।

পাগলবাড়ির ভেতরের অবস্থা বর্ণনা করার মত কলম আমার নেই। চিড়িয়াখানার বাঘ সিংহ রাখবার মত বড় খাঁচা। একটা কি দুটোর ওপরে পাকা ছাদ। মাঝখানে একটার ছাদ টিনের। ভেতরে ভাল করে কিছু দেখা যায় না। তারই মধ্যে কেউ কেউ দেয়ালে গাঁথা কড়ার সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা। অনেকেই বাঁধা নয়। মাঝখানের টিনের ছাদঅলা খাঁচাটার দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে ভাত তরকারি থালা করে নয়—হ্যাঁ, ছুড়ে দেওয়া হয় মাটিতে। কাড়াকাড়ি করে খায় মানুষেরা। যাদের গায়ে আর শক্তি নেই তারা দূরে থাকে, আরো বেশি দিন না খেয়ে থাকে! থালায় ভাত দিলে যদি থালা দিয়ে মারামারি করে নিজেদের মধ্যে! হাড়সার, ময়লা চামড়া ঢাকা নগ্ন সব শরীর। কাপড় দিলে যদি তা দিয়ে গলায় দড়ি দেয়! শীতের দিনে কম্বল দিলেও যদি— ? দু'চারটে কম্বল দিয়ে তো দেখা গিয়েছে—সবাই মিলে টানাটানি করে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে। আর তাছাড়া পাগলদের কি আর শীত লাগে! চারদিক হা-হা করছে খোলা। মাথার ওপরের টিনের ছাদ থেকে পৌষমাসের রাতে জল ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পড়ে—না-খাওয়া আচ্ছাদনহীন শরীরগুলি মরে যায়। হয়ত বা শীত লাগে না ওদের বুদ্ধিতে। প্রতিবছর শীতে প্রেসিডেন্সির ফিমেল ওয়ার্ডে বার চোদ্দ জন পাগলের 'natural death' হয়।

সেটা বোধহয় শেষ ফাল্গুন, কিংবা চৈত্রই হবে। রাত্রি প্রায় ন'টা। মুকুল মিহি একঘেয়ে সুরে জল চাইছে। উঠোনের ওপারে হাসপাতালের দরজায় বসে আছে বিজয়া। এখানকার সবচেয়ে জাঁদরেল ওয়ার্ডার। সেলে ডিউটি পারুলের। তারা শাশুড়ি-বৌ দু'জনেই এখানে চাকরি করে। পারুলের বয়স কম। ডগমগে চেহারা। সিপাহিরা 'দরবেশ বউদি' বলে ডাকে। সেও শিখার সঙ্গে কোনো রসপূর্ণ গল্প করছে। হেসে গড়িয়ে পড়ছে দরজার সামনে। হাসির শব্দের ফাঁকে ফাঁকে মুকুলের একটানা সরু গলায় ঘ্যান ঘ্যান শোনা যাচ্ছে, ওগো জল দাও না গো, জল দাও না গো। আমরা পারুলকে ডেকে ডেকে গলা চিরে ফেললাম। কেউ কিছু শুনতে পাচ্ছে না। মুকুল আর ডাকছে না। ঠাস ঠাস করে মাথা ঠুকছে গরাদে। হাসির হর্‌রা উঠছে হাসপাতাল থেকে। মুকুল মাথা ঠুকছেই। আমরা দাঁড়িয়ে আছি দরজা ধরে। ওয়ার্ডারদের খাওয়া শেষ হল। বড় বাটি ভর্তি দু'বাটি জল নিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত ধুচ্ছে। মুকুল মাথা ঠুকছে। পারুল হাসপাতাল থেকে বিছানাপত্র নিয়ে ওপরে এল। আমাদের এদিকে নয়, ওপাশে ফাঁসি সেলের সামনে বিছানা পাতছে। মুকুল আর শব্দ করছে না।

পারুল আমাদের দরজার সামনে এসে বিরক্ত মুখে বলে, তোমরা কেন চেঁচামেচি করছ? ওখানে তো আর আমার ডিউটি নয়, ও তো বিজয়া মাসির ডিউটি—আমি কী করব।

আজও কি এক উদভ্রান্ত অসহায়তায় আমার দম আটকে আসে, যখন দেখি, আমাদের অপার নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ঘেরা, এমনকি বেশ শালীন সংস্কৃতি-মার্জিত পরিবেশেও, পাগলমাত্রেই হল হাসি ও বিদ্রূপের খোরাক নয়ত—বিতৃষ্ণার।

মেট্রনের সঙ্গে খোলাখুলি রাগারাগি বাড়ছিল। সবকিছু নিয়েই। আমার ওষুধ, সাধারণ হাজতীদের খাবার চুরি, পাগলদের মারধর করা। ওয়ার্ডারদের জিনিস চুরি করা। আমাদের একতলার সেলে, কৃষ্ণার পুরনো সেলের পাশে, থাকত ক্ষীরোদা। ক্রিমিন্যাল লুনাটিক—মানে উন্মাদ অবস্থায় হয়ত খুন করেছে কাউকে কিংবা এরকম কিছু। পাগলদের শাস্তি হয় না। তাদের স্বাধীনতা আছে 'না খেয়ে পচে মরা' নিজেদের ইচ্ছেমত ত্বরান্বিত বা বিলম্বিত করার। টুরার চিকিৎসার ব্যাপারে আর ওকে কাপড় দেবার জন্য আমরা চেঁচামেচি করায় মাসখানেক আগে নিচের সেল থেকে বার করে টুরাকে নিয়ে গিয়েছে পাগলবাড়িতে। ক্ষীরোদা গরমে একদিন একটি পাখা চেয়েছিল, স্নান করতে যাবার সময়ে দিয়ে এসেছিলাম। মেট্রনকে সঙ্গে নিয়ে শিখা এসে পাখাটা বার করে নিয়ে ভেঙে ফেলে দিল। পাখার ডাঁট থেকে সুতো তুলে যদি গলায় দড়ি দেয়, তার দায় কী করে নিতে পারে মেট্রন! টুরার সেলে ঢুকতে ওরা ভয় পেত। মুকুলকে ভয় পাবার মত কিছু নেই আর। মেয়েদের পেলভিসের চওড়া হাড় থেকে উরুর যে ফিমার দুটো নেমে যায়, তাদের দু'টোর মাঝখানে যে আটদশ ইঞ্চি ফাঁক থাকে এ কথা সে জানে না যে প্রেসিডেন্সির ফিমেল ওয়ার্ডের বিবস্ত্র পাগলদের দেখেনি। জানে না, কতো রোগা কত মাংসলেশশূন্য হতে পারে না-খাওয়া মানুষের শরীর। আর তারও পরে তার বেঁচে থাকবার কি অসম্ভব ক্ষমতা!

এই লেখা আমাদের সেই সাথীদের নিয়ে নয় যারা জেনেবুঝে সহ্য করেছে অত্যাচার, থানা, জেল, মৃত্যু। কিন্তু পাপু বলে একজন এসেছিল, যে নিজে জেনেবুঝে আসেনি। হয়ত তার কাছ থেকে কোনো খবর চেয়েছিল পুলিস কিংবা সেই সময়ের যে অন্যতম অপরাধ তারই সে শরিক ছিল—কম বয়সী হওয়া। কসবা থানা থেকে আসা আধমরা পাপুর কথা এজন্য এখানে এল যে, কোন কিছুর সঙ্গে পাপুর যোগ ছিল না। সে সব খোঁজ ওর কাছে চাওয়া হচ্ছিল তার সঙ্গে না—যে অভিযোগ ওর সম্পর্কে করা হচ্ছিল তার

সঙ্গেও না—এমনকি তেমন কোনো মতাদর্শের সঙ্গেও নয়। আর তাই জন্যই যে কোনো সাধারণ ছোট মেয়ের মতো পাপু ভয় পেয়েছিল। আমরা তখনও নিচে যাই স্নান করতে। যেদিন খবর এল পরদিন পাপুকে আবার নিয়ে যাবে পি সি তে—পুলিশের গুহায়, গরাদের ভিতর দিয়ে হাত ধরে ওর অসহায় শুকনো মুখ, সে মুখে তখনও ছ্যাঁকা দেওয়ার দাগ, ঠোঁটে কাটা—দ্যাখো আমার জ্বর হয়েছে। জ্বর হলেও কি পি সি-তে নিয়ে যায় গো? আর এমন তো নয় যে ওর বদলে অন্য কেউ যেতে পারে। তাই গরাদের এপারে শুধু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। আর পনেরোদিন পর সেই ভয় পাওয়া নরম মেয়েটি ফেরত আসে থেঁতো হয়ে যাওয়া একটা মৃতপ্রায় শরীর হয়ে, যাকে জেলার নিতে চাননি মৃতদেহ ভেবে।

ওয়ার্ডে আমাদের সাথীদের মধ্যে এসেছে বিজু। আরও ক'জন। কিন্তু ওদের সঙ্গে আর প্রায় কথাবার্তা বলতেই পারি না আমরা। বর্ধমান থেকে খুব অসুস্থ অবস্থায় এসেছে শিপ্রা।

আর সেলে এসেছে রাজশ্রী আর মীনাক্ষী। রাজশ্রী এখনও খুব অসুস্থ। পি জি-র ডাক্তাররা ওকে প্রায় টেনে বার করে এনেছেন মৃত্যুর চোয়ালের ভেতর থেকে। কিন্তু এখনও ওর মাথায় স্টিচ, দুটো পা ছোটবাচ্চাদের আঁকা পেনসিলের দাগের মত অজস্র নীল-বেগুনী-কালো ক্ষতচিহ্নে ভরা। মীনাক্ষীর অদ্ভুত ক্ষমতা যে কোনো অবস্থাকেই হাসিতে পাল্টে ফেলার। অথচ ওর স্বভাবে অন্তর্লীন আছে জেদ আর দৃঢ়তা। অনেকদিন পর যেন আবার সেলের মধ্যে খানিকটা বাইরের বাতাস এসেছে। অন্তত চেঁচিয়ে গাইবার জন্য গলা পাওয়া গিয়েছে।

কৃষ্ণাদের ট্রাইবুনাল বন্ধ রয়েছে। জজ পাল্টানো হচ্ছে। দুর্দমনীয় উৎসাহও আর ওকে সব সময় খাড়া রাখতে পারছে না। শরীর ভেঙে পড়ছে। মায়া নেই। নিভাও নেই। আমরা আর নিচে স্নান করতে যাই না, পারিও না যেতে। আমি সমস্তক্ষণই প্রায় শুয়ে আছি। এমন নয় যে আমরা গল্প করি না। রাজশ্রী মীনাক্ষীর কাছ থেকে যে কতকিছু শোনবার আছে! আর আছে সবাই মিলে রাজশ্রীকে হাসাবার চেষ্টা। খুব কাছের সঙ্গীকে হারিয়ে এসেছে ও। শিরদাঁড়ায় গুলি লেগে রাস্তায় পড়ে যাওয়া সঙ্গীকে শেষ-তৃষ্ণার জলও দিতে পারেনি, তার আগেই পুলিশ ঘিরে নিয়েছিল।

সূর্য দেখিনি কতদিন হয়ে গেল। স্নান করতে যাবার সময় জেলের ছায়া পড়া এক টুকরো ময়লামতো আকাশ শুধু দেখা যায়। আর বাইরে বলতে

কেবল সেলের জানলার সবচেয়ে উঁচু দিয়ে চেষ্টা করলে ভবানী ভবনের ছাদের গেরুয়া মোরাম—ব্যস্। কোনদিন কি বাইরেটা দেখতে পাব আবার?

শীত পার হয়ে গেল প্রায়। এবছর যেন বড় শীত! সকালবেলা বারান্দার ফোকর দিয়ে হাত বের করে রোদ্দুর ছোঁবার চেষ্টার করি। ছাবরাদি এসেছে। আবার এনেছে একগোছা লাল প্লাস্টিকের চুড়ি আর একশিশি কুমকুম। আর এনেছে ওর মেয়ের ছবি যে হোস্টেলে থেকে পড়ে। ছুটিতে যায় ছাবরাদির দাদার কাছে। ছাবরাদি আরও রোগা আরও শুকনো হয়ে গেছে। মেয়ে উঁচু ক্লাসে উঠছে, তার খরচ বাড়ছে। নিজের খরচ না কমালে, ছাবরা টাকা পাঠাবে কেমন করে? আর না-খেয়ে খরচ কমালে মাংসচর্বি কমে গেলে, খদ্দের টাকা দিয়ে ওর মাংস ভাড়া করবে কেন? আমার মেয়ের ছবিটা হাতে নিয়ে দেখে অনেকক্ষণ। তারপর নেমে যায়। আজকাল আর বেশিক্ষণ থাকতে পারা যায় না ওপরে। ওরাও পারে না। ওয়েলফেয়ার অফিসারের এই অফিস বন্ধ। রাত্রে কিছুক্ষণ পড়ার চেষ্টা করছি স্টেইনবেকের 'গ্রেপস অব রেদ'। মীনাক্ষীর মুখে অনেকদিনের ভুলে যাওয়া কবিতাগুলো আবার শুনতে পাই।

সকালবেলা পাগলবাড়ির দিক থেকে স্ট্রেচারে করে কাকে বার করে এনে সামনের উঠোনে রাখল। নূরজাহান এসেছে ছাবরাদির সঙ্গে। কাছে গিয়ে দেখে ছুটে এল আমাদের কাছাকাছি।

—দিদি ও দিদি—টুরা—তোমাদের সেই নেপালি মেয়েটা গো।

লম্বা কালো তিনচারটে কাঠের খণ্ডের মত পড়ে আছে স্ট্রেচারে।

'কাইল একটা নেপালি পাগলিরে আনছে রে দিদি—কী লম্বা!'

.সেলের গরাদের ফাঁকে পীতাভ ফর্সা ভারী পা।

ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়ে গেলেন। কালকে নতুন মেয়ে এসেছে ষোলজন। তাদের দল করে তাড়িয়ে নিয়ে মেট্রন যাচ্ছে 'কেস টেবিল' করাতে। দরজা খুলেছে। শববাহকরা ঢুকল। টুরাকে তুলে নিয়ে যাবার আগে বড় সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিল ওর সমস্ত শরীর।

এতদিনে।